অমৃত-ধারা

শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বজিৎ ব্রহ্মচারী মহারাজের

পত্রাবলী

শ্রীগুরু আশ্রম

ব্যারাকপুর।

প্রকাশক :—

শ্রীগুরু আশ্রমের পক্ষ হইতে
শ্রীবিশ্বনাথ সরকার, এম-এ,
১৮নং, রিভার সাইড রোড
ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা।

প্রথম সংস্করণ—গুরু পূর্ণিমা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ

দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রীপঞ্চমী, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

প্রণামী—৩৲

প্রতিভা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
খাগড়া হইতে
শ্রীনৃপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

অমৃত-ধারা

(পত্রাবলী)

২য় খণ্ড

পত্র নং—(১) বেলাবাগান

ওঁ

২০।৭।৪২

স্নেহের... ..,

স্নেহময় শ্রীগুরুর স্নেহস্পর্শ অনুভব কর। পত্র পাইয়াছি। শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছে। আমার বাসা— পূর্ব্বে যেখানে ছিলাম—তাহা ছাড়িয়া দিয়া অল্প ভাড়ায়, অন্য একটি বাসা দেখিয়া উঠিয়া আসিয়াছি। ঠিকানা একই থাকিবে অর্থাৎ তোমরা যে ঠিকানায় পত্র দাও সেই ঠিকানাতেই দিবে। বাসা বদলানোর জন্য তোমার পত্রের উত্তর দিতে দুইদিন দেরী হইল। তোমার ইটাচোনার চাকুরীর কি হইল, কোন খবর পাইয়াছ কি ?

বাবা! সংসারের মধ্যে থেকে সাধনজীবন লাভ করতে হলে সকলকেই অনেক কিছু বাধাবিঘ্ন, অনেক কিছু কষ্টই সহ্য করিতে হয়, তার জন্য হতাশ হলে চলবে না বা ভীরু কাপুরুষের মত ইহাকে ত্যাগ করাও চলবে না। এই সংসারের মধ্যে থেকেই, এই শত্রুপুরী মাঝে বাস করেই, তাহাদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে বীরের মত। শত্রু বলতে বুঝ না যেন, তোমার সংসারস্থ কাহাকেও বলছি। শত্রু বাহিরে নয়, ভিতরে-- তোমার অন্তরে। বাধা বিঘ্ন যা কিছু দেখছ উহা বাহিরে কিছু নয়, সমস্তই তোমার অন্তরে। উহাদের নামই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য। ইহারাই বিভিন্ন রূপ ধরে তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই প্রথমে তাহাদের জয় করতে হবে। যদি সত্যই বাপ্ তোমার প্রাণ কেঁদে উঠে তাঁকে পাবার জন্য, তাঁকে দেখার জন্য, তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য, তিনি ছাড়া তোমার জীবন সত্যই মরুভূমি প্রায় হইতে বসিয়াছে, ইহা যদি সত্যই অনুভব কর, সেই স্বভাবের অভাব যদি সত্যই প্রাণে প্রাণে অনুভব হয়, তবে দাও বাবা, তোমার জীবনরথের অশ্বের রজ্জু তোমার হৃদয়স্থ অচ্যুতসারথি ঐ শ্রীগুরুর হাতে ছেড়ে এবং বীরের মত যুদ্ধ ঘোষণা কর ঐ কাম ক্রোধরূপী শত্রুগুলির বিরুদ্ধে—নিক্ষেপ কর উহাদের প্রতি, ঐ শত্রুর প্রতি, তোমার গুরুদত্ত অক্ষয় অস্ত্র (বীজমন্ত্র জপ) দেখবে উহারা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে।

বাধাবিঘ্ন, অশান্তি জ্বালা, ইহারা জীবন লাভের একান্ত সহায়ক এবং পরম বন্ধু ও পরম কারুণিক পরমেশ্বরের একান্ত

কৃপাশীর্ব্বাদ। যাহার জীবনে যত বেশী বাধা, যত বেশী অশান্তি আসিয়াছে, যত বেশী দুঃখ সে পাইয়াছে, সে তত শীঘ্র জীবনের পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ইহারাই সাধককে বা জীবকে যথার্থ পথ দেখায়, সংসারের অসারতা বুঝিয়ে দেয়, মায়া বা মোহ যে অত্যন্ত দুঃখদায়ক, ইহার মধ্যে যে সাময়িক সুখ আছে যাহা পাবার জন্য আমরা অত্যন্ত লালায়িত হই, ইহা যে সুখ নয়, সুখের ভাণ মাত্র তাহা একমাত্র বুঝিয়ে দেয় এই সমস্ত বাধা-বিঘ্ন ব্যর্থতা। যে যত বেশী কৃপার অধিকারী হইয়াছে তার জীবনে সে তত আঘাত পাইয়াছে। বাবা! আঘাত না পেলে কি জীবন তৈরী হয়? একটা ধারালো অস্ত্র তৈরী করতে গেলে, মিস্ত্রীকে সেই লোহাটিকে কত আঘাত করতে হয়। তবে ভয় কি? ভাবনা কিসের? কেন ঐ সমস্ত বাধা, বিঘ্ন, ঘাত, প্রতিঘাতে চঞ্চল হয়ে উঠ? যত বেশীই বাধা বিঘ্ন আসুক না কেন, যত ঘাত প্রতিঘাত আসিয়া তোমাকে ক্ষতবিক্ষত করুক না কেন, যত বড় উত্তাল তরঙ্গ উঠে তোমার জীবন সমুদ্র তোল-পাড় করুক না কেন, তুমি তা দেখে ভীত হবে কেন? তা দেখে ভীত হয় তারা, যারা অমিতবীর্য্যের আস্বাদ পায় নাই— তুমি ত' তা নও, বাবা— তুমি যে তাঁর হাতে, তোমার অচ্যুতসারথি শ্রীগুরুর হাতে তোমার রথের রজ্জু দিয়াছ, তুমি যে তোমার নৌকার হাল জাত-মাঝির হাতে ছেড়ে দিয়াছ, তোমার নৌকা কি ডুবি হতে পারে? উহা ঠিকই কূলে পৌঁছিবে; ভয় কি?

যত বেশী প্রাণ চঞ্চল হবে, ঘাত-প্রতিঘাত যত বেশী মনকে অস্থির করে তুলবে, তুমি তত জোরে নাম করতে থাকবে এবং

ঐ বাধা-বিঘ্ন ঘাত-প্রতিঘাত ইত্যাদিকেই লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করিবে, "ওগো ভগবন্, ওগো প্রিয়তম গুরু আমার! তোমার ঐ ভীষণ মূর্ত্তি যে আর আমি সহ্য করতে পারছি না। দেখাও দেব, কৃপা করে তোমার - সৌম্য, শান্ত, সুন্দর মূর্ত্তি - আমি ধন্য হয়ে যাই। ওগো দেবতা আমার! তুমি কি জান না যে আমি তোমার দুর্ব্বল সন্তান, আমি যে এখনও ইহার প্রখরতা সহ্য করবার উপযুক্ত হতে পারি নাই, তাই ভয় হয় বাবা—যে তোমার এই রুদ্র তেজ যদি সহ্য করতে না পারি, যদি ইহা আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় তবে—তবে ঠাকুর আমার কি হবে?" এইভাবে প্রার্থনা করিবে। দেখিবে সে অশান্ত অবস্থা গুরুকৃপায় শান্ত হইয়া গিয়াছে।

বাবা! গুরুর বিশ্বব্যাপী বর্ত্তমানতা অনুভব করিতে চেষ্টা কর। সর্ব্বজীবের ভিতর, সর্ব্ববস্তুর ভিতর, সকল ভাবের ভিতর, সকল অবস্থার ভিতর যে একই প্রাণশক্তি ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে, ঐ প্রাণশক্তিটিকে ধরিতে, বুঝিতে চেষ্টা কর। উহাকে সেবা করিতে, পূজা করিতে চেষ্টা কর। প্রাণে কখনও কোনও রূপ মন্দভাব অর্থাৎ কাহারও প্রতি দ্বেষ বা হিংসাভাব আসিতে দিও না। সকলকেই ভালবাসিতে চেষ্টা করিবে। জগতে কেহই তোমার শত্রু নাই, সকলেই মিত্র, এই ভাবটী প্রাণে আনিতে চেষ্টা কর। কারণ তোমার চতুর্দ্দিকে যাহা কিছু দেখছ, তুমি যাহা কিছু ভোগ করছ, সমস্তই

তিনি—সেই তোমার প্রিয়তম বন্ধু, তোমার জীবনের একমাত্র সাথী। কাজেই উহা কখনও তোমার শত্রু নয়, হতে পারে না। বলিতে পার—"উহারা যে আমাকে পীড়া দেয়, আমি যে সহ্য করিতে পারি না, আমাকে যে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দেয়—কাজেই তখন কি বলে আমি উহাকে আমার মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করি? উত্তরে তোমাকে একটি উদাহরণদ্বারা বলি—তোমার অঙ্গের যে কোনও স্থানে, মনে কর পায়ে একটি বিষ ফোড়া হয়েছে, যন্ত্রণায় তুমি অস্থির হয়ে উঠেছ, তোমার চলচ্ছক্তি রহিত করিয়া দিয়াছে। এখন কেউ আসিয়া তোমার সেই ফোড়াতে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিল, ফুঁ দিয়ে দিল এবং তোমার যন্ত্রণার সাময়িক লাঘব করিল। কিন্তু একটি ডাক্তার আসিয়া সেই ফোঁড়াটি কাটিয়া, টিপিয়া পুঁজরক্ত বাহির করিল। এখন কে তোমার শত্রু? ঐ ডাক্তার, না যে তোমাকে ফুঁ দিয়া সাময়িক শান্তি দিয়াছিল? —এইরূপ সর্ব্ব অবস্থা। যাক্, তোমার স্ত্রীর জন্য ভেব না। তুমি তোমার সব কিছু—তোমার ভাল, তোমার মন্দ, তোমার সুখ, তোমার দুঃখ, তোমার আনন্দ, তোমার নিরানন্দ, তোমার শোক, তোমার শান্তি, তোমার আশা, তোমার নিরাশা, তোমার প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, তোমার একমাত্র সাথী—সেই শ্রীগুরুর চরণে "নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বর" মন্ত্রে উৎসর্গ করে দাও—প্রাণে শান্তি পাবে, আনন্দ পাবে, জীবন লাভ করে যথার্থ মানুষ হবে। শিবমস্তু।

তোমার উপস্থিত সকল সংবাদসহ শাস্ত্র পত্রোত্তিরে সুখী করিও। শ্রীমান কেমন আছেন; তাঁকে আশীর্ব্বাদ দিও। আনন্দে থাক। ইতি—

দেব

পুনঃ—তোমার যত বড় ইচ্ছা চিঠি দিতে পার বা যে কোনও প্রশ্ন প্রাণে জাগে তাহা লিখিতে পার বা যাহা প্রাণে আসিবে নিঃসংশয়ে জানাইতে পার তাহাতে আমার কোনও কষ্ট হবে না, বরং আনন্দ হবে।

(২)

ওঁ

বৈদ্যনাথধাম

২৪।৭।৪২

পরম স্নেহভাজনেষু,

বাবা—,

স্নেহময় শ্রীগুরুর স্নেহাশীষ অনুভব করুন। দু'খানি পত্রই পাইয়াছি। আপনার কথাতে আমি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট বা বিচলিত হই নাই। আপনার মনের অবস্থা যে আপনি সরল প্রাণে নিঃসংশয়ে ব্যক্ত করিয়াছেন ইহাতে বরং আমি পরম সন্তুষ্টই হইয়াছি। উহাতে কি হইয়াছে? মানুষ কি ভুল বুঝে না? বরং উহা অর্থাৎ ঐ ভাব যদি প্রকাশ না ক'রে হৃদয়ে পোষণ করিতেন, তাহা হইলেই অত্যন্ত অন্যায় হইত এবং আপনার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইত। আমরা অজ্ঞান বালক, আমাদের স্বভাবই হচ্ছে অন্যায় করা, ভুল করা ইত্যাদি, আর তিনি পিতা, পালক, তাঁর স্বভাব হচ্ছে আমাদের সেই ভুল, সেই অন্যায় সংশোধন করা। দেখুন না কেন, আমাদের সেই দোষ, সেই ত্রুটি সংশোধন করিবার জন্য আমাদের জন্ম জন্মান্তরের সংসার-ভ্রান্তি মোচন করিবার জন্য প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে, কত রূপে তিনি আমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছেন। কখনও তিরস্কার, কখনও লাঞ্ছনা, কখনও রোগ-যন্ত্রণা,

কখনও শোক, কখনও নিরাশা ইত্যাদি বস্তুরূপে আমাদের সামনে এসে আমাদের এই দারুণ মোহ, দারুণ ভ্রান্তি ঘোচাতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমরা এমনই অন্ধ যে কিছুতেই তাহা দেখিব না বা বুঝিব না। আমরা কেবল এগুলিকে তাঁর নিগ্রহ বলিয়াই বুঝিব, কিন্তু ইহা যে তাঁহার কত বড় অনুগ্রহ, তাহা যাহারা বুঝিয়াছে মাত্র তাহারাই জানে। তাই বলি, আমাদের স্বভাব হচ্ছে, অন্যায় করা, ভুল করা, অপরাধ করা। আর তাঁর স্বভাব হচ্ছে সেই ভুল, সেই ত্রুটি সংশোধন করে আমাদের সৎপথে আনয়ন করা, তাই তিনি পিতা বা পালক। আমাদের স্বভাব হচ্ছে বৃথা অভিমানে মত্ত হয়ে তাঁকে ভুলে থাকা, তাঁর স্নেহ, তাঁর কৃপা অবজ্ঞা করা, তাঁকে—সেই আত্মাকে উপেক্ষা করা। আর তাঁর স্বভাব হচ্ছে আমাদের শত অনাদর, শত উপেক্ষা হাসিমুখে নিজ মাথায় তুলিয়া লইয়া, আমাদের ঐ স্নেহভরা বিরাট বুকে টানিয়া লওয়া। তাই তিনি আমাদের স্নেহময়ী মা। এইরূপে কখনও আমাদের জানিয়ে, আবার কখনও না জানিয়ে বিন্দু বিন্দু জ্ঞান-সঞ্চার দ্বারা আমাদের সেই বিরাটের দিকে নিয়ে চলেছেন। দেখুন ঐ গুরুদত্ত চক্ষুদ্বারা আপনার সম্মুখে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ-রূপী মাকে দেখুন। দেখুন, ফলে ফুলে মা, চন্দ্রে সূর্য্যে মা, রোগে শোকে মা, সুখে দুঃখে মা, আশায় নিরাশায় মা, আনন্দে নিরানন্দে মা, দেখুন মা, ডাকুন মা, শুনুন মা। জগৎ চিনুক, মাকে মা বলে ডাকতে শিখুক। তাহলে জন্ম সার্থক হবে, জীবন ধন্য হবে। যাক্—

সাধনা করিতে বসিয়া প্রথমে গুরু স্মরণ করিতে হয়। কারণ গুরু হচ্ছেন শক্তির উৎস বা জ্ঞান স্বরূপ। গুরু এবং ইষ্ট আলাদা নয়—একই এবং আপনার ইষ্টই কৃপা করিয়া গুরু-মূর্ত্তি ধরে আপনার সম্মুখে আসিয়া আপনার অজ্ঞানতারূপ মোহ বা অনিষ্ট বিদূরিত করিয়া আপনার যাহা ইষ্ট বা মঙ্গল তাহাই আপনাকে প্রদান করেন। যে মহতী-চিত-শক্তি হইতে এই বৈচিত্র্যময় বিশ্ব ফুটিয়া উঠিতেছে তিনিই মা—তিনিই প্রসবিত্রী। আর, এই বিশ্বপ্রবাহের ধাঁধা দূর করিয়া যিনি পুনরায় আমাদিগকে আত্মস্বরূপে উপনীত করেন তিনিই গুরু। অতএব এই গুরুর অন্তরেই মাতা বা প্রসবশক্তি রহিয়াছে। তাই গুরুই মাতারূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া বিশ্বলীলা ঘটান। আবার বিশ্ব-লীলাময়ী মা-ই আত্মলীলা সমাপ্ত করিয়া নির্ব্বিকল্প সত্তাস্বরূপ গুরু বা জ্ঞানরূপ ধারণ করেন। অতএব গুরুতে কখনও মনুষ্য-বুদ্ধি স্থাপন করিতে নাই—বা গুরুকে মানুষ জ্ঞান করিতে নাই। সেইজন্য ঋষি সেই গুরুকে প্রণাম করিতে গিয়া বলিলেন—

"ধ্যানমূলং গুরোমূর্ত্তিঃ, পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥"

অর্থাৎ, গুরুমূর্ত্তিই একমাত্র ধ্যানের বস্তু। প্রজ্ঞা বা জ্ঞান বা আত্মা বা মা, গুরুর এই স্থূল দেহ ধারণ করিয়াছেন—যিনি এইরূপে গুরুকে ধ্যান করেন তাঁহার ধ্যানই ঠিক হয়। গুরুর পদই পূজার মূলবস্তু অর্থাৎ পদ মানে গতি বা শক্তি। জ্ঞানের

শক্তিরূপে লীলা দর্শন করিলে পূজার যথার্থ অধিকার হয়। গুরুর বাক্যই মন্ত্র এবং গুরুকৃপাই মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়।

ইহা উপস্থিত বুঝিতে বোধ হয় কষ্ট হইবে। সাধনায় একটু অগ্রসর হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে গুরুমন্ত্র এবং ইষ্ট আলাদা নয়, একই বস্তু। অতএব, গুরুতে একনিষ্ঠ হইতে চেষ্টা করুন। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লইয়া সাধন করিতে বসিয়া প্রথমে গুরুমূর্ত্তি মনে মনে স্মরণপূর্ব্বক তাঁহার কাছে কাতর প্রাণে শক্তি ভিক্ষা করিয়া সাধন করিবেন।

শ্রীযুক্ত দেবেন বাবুর যে আমাকে মনে আছে, তাহা জানিয়া সুখী হইলাম। তাঁকে 'তাঁর' স্নেহাশীষ দিবেন এবং তাঁকে বলিবেন তাঁর পত্র পাইলে আমি সুখী হইব।

সর্ব্বশক্তিমান করুণাময় শ্রীগুরুর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তাঁর কৃপায় আপনি শীঘ্র ঋণমুক্ত হউন। ইহা ছাড়া এ ভিক্ষুকের আর কিছু বলিবার নাই। তবে মাত্র এইটুকু বলিতে যদি সাহস দেন ত বলিতে পারি যে, তিনি যাহা আপনাকে বলিয়াছেন তাহা কখনও মিথ্যা হতে পারে না। হয়ত দুদিন দেরী হচ্ছে কিন্তু তাঁর বাক্য কখনও লঙ্ঘন হয় না। অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে দেরী হওয়ার কারণ নিজেদের কর্ম্মফল এবং সেই সিদ্ধপুরুষের বাক্যের উপর সম্পূর্ণ আস্থা না থাকা, ইহা ছাড়া কখনও তাঁহাদের বাক্য মিথ্যা হয় নাই আজ পর্য্যন্ত। তবে নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী দিন আগিয়ে পিছিয়ে যায় মাত্র।

আপনি গুরুগীতাখানি পাঠ করিলেই ইহার তত্ত্বতঃ অর্থ সম্যকরূপে পরিস্ফুট হইবে। পত্রে ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু লেখা সম্ভবপর নহে। পুনরায় সাক্ষাৎকালীন এই সম্বন্ধে বিশদ-ভাবে আলোচনা হইবে। অত্রস্থ মঙ্গল। আপনাদের নিত্য-কুশল কামনা করি।

ইতি—

বিশ্বজিৎ

(৩)

ওঁ

বৈদ্যনাথধাম
৮।৯।৪২

স্নেহাস্পদেষু -

বাবা···, স্নেহময়ী মায়ের স্নেহাশীর্ব্বাদ লও। অনেক দিন পরে তোমার পত্রখানি পাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। তোমার ২৬শে তারিখে লেখা চিঠি আমি ৩রা সেপ্টেম্বর পাইয়াছি; কিন্তু অনেক চিঠি প্রত্যহ লিখতে হয়। পর পর চিঠির জবাব দিতে দিতে তোমার পত্রের উত্তর দিতে একটু দেরী হইল, সেজন্য দুঃখিত হইও না।

বাবা, ভবিষ্যতের চিন্তা না করিয়া বর্ত্তমানকে সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ ভবিষ্যৎ কাহারও কাছেই পরিস্ফুট নয়; ইহা সকলেরই কাছে চিরকাল অন্ধকার। একমাত্র যিনি ত্রিকালজ্ঞ বা বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালেই যিনি সমভাবে বর্ত্তমান থাকেন, সেই বিরাট জ্ঞানসত্তা বা গুরু, তিনিই জানেন বা বলিতে পারেন যে ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে। দেখনা, মানুষ এক রকম বুদ্ধি করে, এক রকম ফলের আশা ক'রে কার্য্য করে, কিন্তু পরে দেখে ফল হইল ঠিক তার বিপরীত, অতএব ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে, বর্ত্তমানকে সম্মুখে রাখিয়া সেই জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময়, কৃপাময় গুরুদেবের

নির্দ্দেশানুযায়ী নিজ জীবনকে তৈরী করিতে বা চালিত করিতে চেষ্টা কর। তাঁর ইচ্ছায় অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥

অতএব, সেই গুরুতে বা গুরুবাক্যে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক একনিষ্ঠভাবে. নির্বিবচারে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে এগিয়ে চল; কোন বাধা, কোনও বিঘ্ন জীবনে আসিবে না। আর যদিও পূর্ব্ব কর্ম্মফেরে কোনও অশান্তি আসে, তবে যে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে, তাঁকে তিনি সর্ব্ব বিপদ থেকে মুক্ত করেন। যত বেশী নিজেকে তাঁর কাছে ছেড়ে দিতে পারবে, যত গুরুতে একনিষ্ঠ হ'তে পারবে, যত তাঁকে ভালবাসতে পারবে, জীবন ততই উন্নত হবে। একটা কথা সর্ব্বদার জন্য মনে রেখ-- যিনি তোমার স্রষ্টা, যিনি তোমার নিয়ন্তা; তাঁর চিন্তা তোমার জন্য তোমাপেক্ষা অনেক বেশী। দেখনা, তুমি জন্মাবার আগে তোমার জন্য তোমার খাদ্য তোমার মায়ের বুকে তৈরী থাকে। এত চিন্তা তোমার জন্য, এত যত্ন তোমার জন্য তাঁর। অতএব, সর্ব্বতোভাবে সেই স্নেহ করুণাময় শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হও। সম্পূর্ণরূপে নিজকর্তৃত্ববোধ তাঁর হাতে ছেড়ে দাও। বল বাবা, অর্জ্জুনের মত কাতর প্রাণে, ভক্তি গদগদ চিত্তে বল--

"কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

অর্থাৎ হে গুরো, হে আমার হৃদয়রথের অচ্যুতসারথি! আজ আমার বুদ্ধি, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে বিচার করিতে অসমর্থ। কারণ আমার চিত্ত মোহগ্রস্ত। অতএব, আমি আজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি দয়া করিয়া আমায় বলিয়া দাও, আমার পক্ষে কি কর্ত্তব্য, আর কি অকর্ত্তব্য। আমি তোমার শরণাগত শিষ্য; প্রভু দয়া ক'রে আমার চিত্তের এই মূঢ়তা, এই বিষয় বিমুগ্ধতা, এই মোহ বিদূরিত করিয়া জ্ঞানালোক দ্বারা আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়ঃ, যাহা ইষ্ট তাহাই দেখাইয়া দাও বা আমার চিত্তকে এই মোহগ্রস্ত অন্ধকার হতে তোমার ঐ জ্যোতি-সত্ত্বায় বা জ্ঞানালোকে আলোকিত কর। এইভাবে গুরুর কাছে নিজের কর্ত্তৃত্ববোধ ছেড়ে দাও, নিজের অহমিকা বা অভিমানকে "নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বর" মন্ত্রে সমর্পণ ক'রে দিয়ে নিশ্চিন্তমনে সেই শান্তিময়ের শান্তিভরা মুখখানির দিকে চেয়ে থাক। জীবনে কোনও অভাব, কোনও অপূর্ণতা থাকবে না। অমৃতময়ের অমৃতপানে ভরপুর হয়ে যাবে; তোমার জন্মজীবন ধন্য হবে, সার্থক হবে, যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারবে। বাবা! শৈশবে মাতৃহীন হয়েছ বলে দুঃখ হচ্ছে? কে বলিল তুমি মাতৃহীন হয়েছ? না তুমি ত' মাতৃহীন হও নাই বরং তুমি মাতৃময় হইয়াছ। কারণ আজ যদি তিনি শরীরে থাকিতেন বা স্থূল দেহে থাকিতেন তাহা হইলে তোমার ঐ মাতৃত্ববোধ মাত্র ঐ সাড়ে তিন হাত ব্যাপী দেহটাতেই আবদ্ধ থাকিত এবং তাহাতেই মুগ্ধ হইতে বা সেই দেহটাকেই ভোগ করিতে এবং তোমার চিত্ত

মোহগ্রস্ত হইত। আর, আজ তোমার ঐ বোধ অর্থাৎ ঐ মাতৃত্ব-বোধ সমগ্র জগতের প্রতি ব্যক্তিতে, প্রতি বস্তুতে ওতপ্রোতভাবে ছড়িয়ে পড়েছে বা ঐ স্নেহ জগতের প্রতি ব্যক্তি বা বস্তু হইতে পাইবার জন্য তোমার চিত্ত আজ ব্যস্ত। আজ যাহাকে জগৎ বলে দেখছ বা জগৎ বলে বুঝছ উহা যে জগৎ, মাত্র একটা নাম বিশেষ, ইহাই বুঝিতে চেষ্টা কর। অর্থাৎ যে শক্তি তোমার অন্তরে থেকে, তোমাকে কর্ম্ম করিবার সামর্থ্য দিতেছে উহাই মা বা গুরু বা আত্মা বা ভগবান। অর্থাৎ তিনিই, সেই মা ই ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন নামে আজ তোমার সম্মুখে বিরাজমানা। তুমি যাহা দেখিতে ভালবাস বা যে দৃশ্য দেখিয়া তুমি তৃপ্ত হও, সেই দৃশ্যাকারে কে তোমার সামনে? উহাই 'মা'—'মা'ই তোমার সামনে ঐ মনোমুগ্ধকর দৃশ্যরূপে বিভিন্ন নামরূপাকারে স্নেহমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মানা। তোমার বুদ্ধি আজ মায়ামোহরূপ আবরণে আবৃত। তাই উহাকে চিনিতে পারিতেছনা বা বুঝিতে পারিতেছনা। বাবা, গুরুদত্ত দিব্যচক্ষু দ্বারা একবার ভালবাসাপূরিত নেত্রে উহার দিকে তাকাও দেখি—দেখিবে উহার অঙ্গ হতে ঐ নামরূপটী খসিয়া পড়িতেছে বা মায়ার 'য়া'টি চলিয়া গিয়া মাত্র 'মা' হইয়া গিয়াছে। এইরূপে প্রতি বস্তুতে, প্রতি ব্যক্তিতে তোমার দর্শনে, শ্রবণে, ঘ্রাণে, মনে, রূপে রসে, শব্দে, স্পর্শে একমাত্র 'মা'ই বিভিন্ন অনুভূতিতে তোমার কাছে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। কর বাবা, এই বিশ্বব্যাপী মাতৃমূর্ত্তির সেবা। কর সেবা, কর পূজা, প্রাণ দিয়ে, মন দিয়ে, জীবন দিয়ে পূজা কর। অভিস্নাত কর তোমার হৃদয়ের

প্রেম দিয়ে এই বিশ্বব্যাপী মাকে। সাজাও বাবা, তোমার অন্তরের ভক্তিকুসুম দিয়ে ঐ স্নেহাতুরা বিশ্বরূপী জননীকে। আর ভক্তি গদগদচিত্তে, অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিজের অহমিকাকে নমিত কর এই বিশ্বরূপী মায়ের চরণে, বল --

"চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্যস্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

দেখ ফলে-ফুলে মা: চন্দ্রেস্যূর্য্যে মা; আকাশে-বাতাসে মা; সুখে-দুঃখে মা; পাপে-পুণ্যে মা; বল মা; ডাক মা; মা-মা বলিতে বলিতে মাতৃময় হয়ে যাও। শিবমস্তু।

ইতি—

বিশ্বজিৎ।

(৪)

ওঁ

বৈদ্যনাথধাম
১৯৪২

স্নেহের দুলাল আমার!

আনন্দঘন বিরাট চৈতন্যের সান্নিধ্য লাভ করিবার যোগ্যতা লাভ হউক। সেই চির উজ্জ্বল দিব্য জ্ঞানালোকে তোমার মনের অন্ধকার দূরীভূত হউক, তোমার অন্তরের সকল ধাঁধা মিটিয়া যাক, সকল প্রশ্নের মীমাংসা হউক। বাবা আমার! তোমার পত্র পাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম। তোমার প্রশ্নটি অতি সুন্দর, অতীব প্রশংসনীয়। তোমার বুকে যে এরূপ প্রশ্ন জাগিয়াছে ইহা অত্যন্ত সুখের। এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্যই স্থূল গুরুর প্রয়োজন। নচেৎ স্থূলের কোনও প্রয়োজনই কোনদিন ছিল না। শোন বাবা! গুরু কোন দিনই মানুষ হন না, মানুষ হবেন না, মানুষ হ'তে পারেন না। গুরু শব্দে মাত্র জ্ঞানকেই বুঝায়। জ্ঞান হচ্ছে আমাদের অন্তরের শুদ্ধ বোধস্বরূপ। ইহার কোনও দিনই কোনও রূপ হতে পারে না। ইহা নিত্য প্রকাশিত একটা সত্তা মাত্র। অতএব তাহার যখন কোনও রূপ নাই তখন তাহার কোন ক্ষয় বা বৃদ্ধিও নাই। জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। ইহা মাত্র একটি বোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। যাহা কিছু দৃশ্যমান বা অনুভবগম্য সমস্তই এই জ্ঞানেতেই লয় প্রাপ্ত হচ্ছে। আচ্ছা,

তাহা হইলে আমরা পাইলাম—গুরু শব্দের অর্থ যখন বিশুদ্ধ শুদ্ধ বোধ বা জ্ঞান, তখন তাঁহাতেই আমার সবকিছু প্রকাশিত হচ্ছে, ধৃত আছে এবং লয় প্রাপ্ত হচ্ছে। আচ্ছা, এখন আমাদের আসল প্রশ্নের মধ্যে আসা যাক্—"প্রকৃত পিতাকে ডাকতে তাঁর (গুরুর) প্রয়োজনীয়তা কিসের ?" এখন দেখিতে হইবে এই পিতা জিনিষটি কি ? আচ্ছা, আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে পিতা হচ্ছেন আমার (এই জীবত্ববোধের) স্রষ্টা বা প্রকাশক। পিতাতেই আমার প্রকাশ বা ঐ পিতৃত্ব বোধেই এই জীবত্ব বোধের প্রকাশ। তাহা হইলে আমরা পেলাম পিতা বা গুরু বা জ্ঞান একই বস্তু। মাত্র আধার ভেদে গুণানুসারে বিভেদ দৃষ্ট হয়। অতএব তোমার স্থূল শরীরকে প্রকাশ করিতে হইলে যেমন পিতার প্রয়োজন, ঠিক তেমনি তোমার সূক্ষ্ম শরীর বা তোমার স্ব-স্বরূপকে প্রকাশিত করিতে হইলে গুরুর প্রয়োজনীয়তা। কারণ, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, কারণ না হইলে কোনও কর্ম্ম কখনও হইতে পারে না। সেই জন্য প্রকাশরূপ কর্ম্ম সৃষ্টি হইতে হইলে তদ্বৎ কারণ বা প্রকাশকের একান্ত প্রয়োজন। (২) এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা কি ছিল ? উত্তরে ইহাই দৃষ্ট হয় বা অনুভব হয় যে ইহার প্রয়োজনীয়তা কখনও হয় নাই। এই শক্তি স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াই আছেন। ইহাকে কেহ প্রকাশ করেন নাই। আধার বা গুণভেদে বিশেষ দৃষ্ট বা অনুভব হয় মাত্র। ইহার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ বৈজ্ঞানিকেরা দিয়া থাকেন বা আমরাও সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে, যে কোনও শক্তিকে অনুভব করিতে হইলে আধারের

প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী। কারণ, আধার বা ইংরাজীতে যাহাকে matter বলে তাহা ছাড়া কোনও শক্তি বা force অনুভূত হইতে পারে না। অতএব শক্তিকে প্রকাশিত হইতে হইলে আধারকে প্রকাশিত হইতে হইবে। এখন কথা হচ্ছে যে, এই আধারটির আধার হচ্ছে আর কিছুই নয়, কতকগুলি শক্তি বা পরমাণুর (Electrones and protones) সমষ্টি মাত্র। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আধার বলেও কোনও কিছুই নাই, মাত্র একটী শক্তিই ওতপ্রোতভাবে প্রকাশিত হইয়া আছে।

ইহা থেকে আবার প্রশ্ন উঠিতেছে যে, ইহাই যদি সত্য হয় বা এই শক্তিই যদি আত্মা বা ভগবান এবং ইনিই যদি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকেন, তখন ইহাকে ডাকিবার বা পাইবার বা সাধনা করিবার কি প্রয়োজন? কারণ, ইহা হইতে স্বতঃই জিজ্ঞাসা উঠে, "ডাকিবে কাকে?" "ডাকিবে কে?", সাধন কার জন্য? সাধ্য কি?—

আচ্ছা এই যে শক্তি, এই শক্তি জিনিষটি হচ্ছে তিনটী গুণের যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনের সমষ্টিমাত্র। ইহার সত্ত্বাংশে প্রকাশ সাম্ভব্য, রজাংশে ক্রিয়া বা কর্ম্ম সাম্ভব্য এবং তমাংশে জড়ত্ব বা গভীর অজ্ঞানতা নিহিত আছে। ইহা যথাক্রমে ত্রিবিধভাবে বিকাশ হইতে থাকে। যথা, প্রথম তমঃ বা অজ্ঞানতা পরে রজঃ বা কর্ম্মদ্যোতনা, পরে সত্ত্ব বা আত্মপ্রকাশ—এই তিনটীর সম্পূর্ণতাই হইতেছে আত্মপ্রকাশ বা স্বরূপ অবস্থা। এখন ইহার রজাংশে বা কর্ম্মাবস্থার একটি বিশিষ্ট অবস্থা হচ্ছে মায়া বা

অবিদ্যা বা 'স্ব' এর বিস্মৃতি। ইহারই নাম জগৎ বা গতি বা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। এবং একমাত্র এই মায়া হইতেই আমাদের যাহা কিছু ভোগ্যের উদ্ভব। এখন এই মায়াটাকে সরানোর চেষ্টাই হচ্ছে সাধনা। আর মায়া চলে গেলে বা রজোগুণের অবসান হলে যাহা থাকে তাহাই সাধ্য। এই যে ত্রিগুণান্বিত শক্তি, ইহাই প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হয়ে রয়েছে। ইহা ত্রিগুণান্বিত হইলেও, ইহার কিন্তু প্রকৃতভাব বা অবস্থা বা গুণ হচ্ছে সত্ত্বভাব। রজঃ বা তমঃ ইহার বিকৃত অবস্থা। কিন্তু রজোতম গুণান্বিত প্রকৃতিও 'স্ব'ভাববশে 'স্ব'তে পূর্ণত্বে, পরিণত হবেই একদিন। কারণ, ইহার স্বভাবই হচ্ছে পূর্ণত্বের দিকে ধাবিত হওয়া। যেমন নদীর স্বভাবই হচ্ছে সমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা। আশা করি, তোমার প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে যথাসাধ্য দিলাম। এ সম্বন্ধে সাক্ষাতে তোমার সহিত বিশদভাবে আলোচনা করিব। পত্রে ইহার চেয়ে বিশদভাবে লেখা সম্ভবপর নয়। আশা করি, তোমরা কুশলেই আছ। অত্রস্থ মঙ্গল। আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(৫)

ওঁ

বৈদ্যনাথধাম
১৯৪২

মা কল্যাণি!

স্নেহময় শ্রীগুরুর স্নেহাশীষ তোমাকে প্রতিনিয়ত অভিষিক্ত করুক, ইহাই প্রার্থনা।

পত্র পেলাম। হ্যাঁ মা, তোমাদের খবর সময়মত না পেলে সত্যই প্রাণ বড় অস্থির হয়। যাক্, তুমি তাঁর আদেশমত কার্য্য করিতেছ জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। হ্যাঁ মা, ঐরূপে তাঁর প্রতিটি ইচ্ছা, প্রতি ইঙ্গিত, প্রতি আদেশ, সর্ব্বান্তঃকরণে হৃষ্টচিত্তে পালন করিতে চেষ্টা করিবে, নিজ জীবনকে তাঁর আদর্শের ছাঁচে ঢেলে গড়ে তুলতে হবে। তার উপায় হচ্ছে, তাঁর প্রতি ইঙ্গিতটী মন্ত্রের মত সর্ব্বদা স্মরণ রেখে সেইভাবে নিজ প্রকৃতিকে তৈরী করা। এমন একটা মুহূর্ত্তও যেন তাঁর চিন্তা ছাড়া অতিবাহিত না হয়। সংসারের প্রতি কর্ম্মের মধ্যে তাঁর সান্নিধ্য উপলব্ধি করতে চেষ্টা করিবে, সর্ব্বদা মনে করিবে— তুমি তাঁহারই কাজ করিতেছ অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মরূপেই তোমার প্রিয়তম, তোমারই প্রাণের গুরু কর্ম্মরূপে তোমার সামনে উপস্থিত - তোমার জীবনকে কর্ম্মময় করে তোলবার জন্য। এইরূপে মাগো, প্রতি কর্ম্ম, প্রতি দর্শন, প্রতি শ্রবণ, প্রতি গ্রহণ সব গুরুময়, প্রাণময় করে তোল। তার উপায় হচ্ছে পূজা করিতে বসিয়া চিন্তা করিবে যে, যাঁর পূজা করিতে

বসেছ তিনি সত্যই তোমার সামনে উপস্থিত ঐ মূর্ত্তিরূপে, ঐ মন্ত্র-রূপে, ঐ ভাবরূপে, ঐ প্রতি উপচাররূপে।

সংসারের প্রতি কর্ম্মের মধ্যে মনে করিবে যে, যে কার্য্য তোমার সামনে উপস্থিত, সেগুলি কর্ম্ম নয়—তোমারই প্রিয়তম, তোমারই প্রাণময় গুরু, তোমার সামনে কর্ম্মের রূপ ধরে এসে উপস্থিত—তোমার সেবা নেবার জন্য। যা কিছু সংসারে দেখবে সমস্ত দৃশ্য পদার্থ ই পদার্থ নয়—তোমারই গুরু, তোমারই সখা, ঐ দৃশ্যরূপ ধ'রে তোমার সামনে উপস্থিত—তোমার দর্শন ইন্দ্রিয়কে চরিতার্থ করবার জন্য। এইরূপে দর্শনে, শ্রবণে, ঘ্রাণে, স্পর্শে গুরুর সান্নিধ্য অনুভব করিতে চেষ্টা কর, জীবন ধন্য হয়ে জন্ম সার্থক হবে।

তোমার মা কেমন আছেন? কৈ তিনি ত আমায় কোন পত্র দিলেন না? তিনি বুঝি আমায় ভুলে গেলেন! বাবা ও মাকে মঙ্গলময় বিশ্বনাথের মঙ্গলাশীষ দিও। তোমার দিনগুলি কিভাবে কাটিছে? তাঁকে কতটুকু চিন্তা কর? তাঁর জন্য তোমার প্রাণের অবস্থা কিরূপ হয়? কখন তাঁর বিষয় চিন্তা তোমার গাঢ় হয়? তাঁর সঙ্গলাভ করবার জন্য প্রাণে কিরূপ ইচ্ছা থাকে? ইত্যাদি প্রতি অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিও। তোমার জিজ্ঞাস্য যদি কিছু থাকে তা হলেও লিখো। ওখানের সকলকেই শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদ দিও। আশা করি, গুরুকৃপায় সকলেই সুস্থ আছ। এ শরীর একরূপ ভালই আছে। পত্রপাঠ পত্র দিও। দেরী করো না। ইতি— দেব

(৬)

ওঁ

বৈদ্যনাথধাম
১৯৪২ সাল

স্নেহের ....,

শান্তিময় শ্রীগুরু তোমার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করুন, ইহাই প্রার্থনা।

তোমার পত্র পেয়ে সকল সংবাদ জানিলাম এবং বুঝিলাম যে তুমি তোমার স্নেহের পুতুলির স্থূলদেহের অভাবে অত্যন্ত কাতর হয়েছ। ইহা খুবই স্বাভাবিক এবং প্রত্যেক জীবই এ অবস্থাতে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। ইহাতে সান্ত্বনা পাইবার মত কোনও ভাষাই আজ পর্য্যন্ত সৃজন হয় নাই। কিন্তু বাবা, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তুমি সাধক, তুমি সদ্‌গুরুর সন্তান এবং জ্ঞানপিপাসু। সাধারণ জীবের ন্যায় একটা স্থূলের মোহে, স্থূলের মায়ায় আবদ্ধ থাকিয়া, তাহাকেই জীবনের সর্ব্বস্ব বুঝিয়া এবং ঐ স্থূলটাকে চিরন্তনী বলিয়া জানিয়া, তাহার অভাবে চিত্তকে অতটা বিক্ষিপ্ত করা ঠিক হয় না। কারণ, তুমি খুব ভালই জান যে, এই মৃত্যু জিনিষটা কি? এবং ইহা কত সত্য এবং কত স্বাভাবিক। ইহা বয়স, কাল, সময় কিছুই অপেক্ষা করে না। কারণ, তুমি খুব ভাল জান যে, এই স্থূল শরীরটা হচ্ছে কতকগুলি কর্ম্মের বা সঙ্কল্পের স্থূল

বিকাশ মাত্র। যতদিন পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত কর্ম্মের শেষ না হয় ততদিনই সে থাকে, পরে কার্য্য শেষ হইলে, সেই স্থূলের পরিবর্ত্তন হয়, ইহাই ইহার স্বভাব। এই ত' গেল একদিক। আবার অন্য দিক দিয়ে বিচার করে দেখিলে ইহাই পাওয়া যায় যে, তিনিই যখন সব সাজিয়া আছেন এবং তাঁর ইচ্ছাতেই যখন সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সাধিত হইতেছে, তখন সেই সর্ব্বভূতস্থিতা স্থিতি শক্তি নিজ ইচ্ছামত আসেন, থাকেন এবং অন্তর্হিত হন। ইহাতে জীবের বলিবার কি থাকিতে পারে? তিনি যখন প্রভু, নিয়ন্তা, রাজা, তখন তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। জীব আমরা, ক্ষুদ্র আমরা সান্ত আমরা, সেই অনন্তের, সেই বিরাটের লীলার বা কর্ম্মের বা ইচ্ছার কি বুঝিব? কতটুকুই বা মাপ পাইব? তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমার উপর তাঁর এই বিরাট সৃষ্টিলীলার সেবা করিবার ভার যতটুকু অর্পণ করিয়াছেন, আমি মাত্র ততটুকুই করিয়া যাই। তিনি ইচ্ছামত আসেন, থাকেন, চলিয়া যান। তিনি রাজা, আমরা প্রজা। তিনি প্রভু, আমরা দাস। তিনি পূজ্য, আমরা পূজক। তিনি সেব্য, আমরা সেবক। এই অনন্ত সৃষ্টি তাঁর— তিনি মালিক, তিনি নিয়ন্তা। তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমার উপর যতটুকু কর্ম্মের ভার দিয়াছেন কিংবা অন্য কথায় তাঁর যে সমস্ত নামরূপের সেবার ভার দিয়াছেন, আমার কর্ত্তব্য. মাত্র কর্ত্তব্য হিসাবে নিয়মিতভাবে সেই নিয়ন্তার, সেই প্রভুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তাঁর দেওয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করা। কিন্তু ইহাতে অর্থাৎ এই কর্ম্মে যদি আমরা মুগ্ধ হই বা মোহগ্রস্ত হই বা আমাদেরই

নিজত্ব বুদ্ধি অর্পণ করি, তাহা হইলে সে ভুল আমাদের নিজেদেরই এবং সেইজন্যই অর্থাৎ সেই ভুলের জন্যই আমরা ব্যথা পাই বা আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। কারণ, বেশ বিচার করে দেখ যে, যদি সমগ্র সৃষ্টিকেই মাত্র কর্ম্মের স্থূল বিকাশ বলে দেখ, তাহা হইলে তাহার যে অংশের কর্ম্মের শেষ হবে, তাহা স্বভাববশতঃই মিলাইয়া যাইবে। আর যদি ইহাকে তাঁহার লীলা ব'লে বোঝ, তাহা হইলে সেই লীলাময়ের ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। আবার যদি ইহাকে তিনি বলেই বোঝ, তাহা হইলে তাঁর ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিতে হবে কারণ তিনি যতটুকু ইচ্ছা করিবেন, ততটুকুই থাকিবেন, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক মুহূর্ত্তও তাঁকে ধরে রাখতে পারবে না। ইহার প্রমাণ আমরা সাধারণতঃ সব সময়েই পাইয়া থাকি। খেলুড়েরা তোমার সহিত খেলিতে আসিয়া খেলা করে এবং যখন তার খেলার সখ মিটে যায় তখন সে চলে যায় তোমার শত অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে। সোজা কথায় ইহাই বুঝ, এই বিরাট সৃষ্টির উপর আমাদের কর্ত্তৃত্ব কি আছে? ইহা সম্পূর্ণ পরের জিনিষ, আমি মাত্র ইহার রক্ষক বা সেবক। পরের জিনিষের উপর নিজত্ববোধ স্থাপন করিলে ব্যথা পাইতেই হয় ইহা ত স্বাভাবিক। অতএব বাবা, শোক বা দুঃখ কর কেন? আর করিয়াই বা কি লাভ? নিয়ন্তার কঠোর নিয়তির পরিবর্ত্তন কিছুতেই হবে না। ইহাই তাঁর কর্ম্মশৃঙ্খলা। আমি খুব ভাল বুঝি যে, কোনও ভাষা, কোনও সান্ত্বনাবাক্য, কোনও শাস্ত্র, কোনও দর্শনই এই পুত্রশোকের কাছে দাঁড়াতে পারে না কারণ ইহারই

নাম মহামায়া। এবং ইহাই জীবনকে যত কিছু যন্ত্রণা দেয় বা ইহার জন্যই, এই মায়ার জন্যই, এই ভ্রান্তির জন্যই আমরা পুনঃপুনঃ জন্ম—মৃত্যুর ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। বাবা, ইহাকে জয় করিবার জন্যই, এই মায়াকে বুঝিবার জন্যই যত কিছু সাধনা যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা ইত্যাদি। এই মায়াকে বুঝিবার জন্যই, এই বিষম ভ্রান্তি দূর করিবার জন্যই ঋষিরা কৃপাপূর্ব্বক কত শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এক কথায় এই মায়াই হ'চ্ছে মৃত্যু। সাধনার চরমফল এই মায়াকে, এই মৃত্যুকে, এই পরিবর্ত্তনকে জয় করা। সাধনায় সিদ্ধি মানেই এই মায়ার 'য়া'টি খসিয়া পড়ে এবং থাকে 'মা' বা আত্মা। এই মাকে পাবার জন্য, এই মাকে বুঝার জন্য, এই মাকে জানার জন্য, জীব জন্মজন্মান্তর ছুটাছুটি করিতেছে। অতএব জেনো বাবা, মৃত্যু কাহারও হয় না, শেষ কাহারও হয় না। তিনিও অনন্ত - তাঁর লীলাও অনন্ত। মাত্র একটা পরিবর্ত্তন। জীবননাটিকার একটা পরিচ্ছেদের একটা দৃশ্যের পটপরিবর্ত্তন মাত্র। সে ছিল সসীম, আজ হয়েছে অসীম। সে ছিল ক্ষুদ্র, আজ হয়েছে বিরাট। সে ছিল আবদ্ধ, আজ হয়েছে সে মুক্ত। সে ছিল পরাধীন, আজ হল সে স্বাধীন। এই স্বাধীনতা লাভের জন্য আজ সমগ্র জগৎ বদ্ধ-পরিকর, এই পরাধীনতার দারুণ শৃঙ্খল মোচন করিবার জন্যই কত সাধক জন্মজন্মান্তর ধ'রে কত তপস্যা করছেন। অতএব যখন সে তাঁর ইচ্ছায়, তাঁর কৃপায় জগতের ধূলিকাদা লাগার আগে চলে গেল, পরাধীনতার দারুণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবার পূর্ব্বেই মুক্তি পেল, তখন তার জন্য শোক করা

উচিত নয়। ইহাতে সেই জীবাত্মাকে ব্যথা দেওয়া হয়। আমরা যাকে ভালবাসি, যে আমাদের যথার্থ প্রিয়, আমাদের উচিত যাতে সে ভাল থাকে, যাতে সে শান্তি পায় তাই করা নয় কি? বল দেখি বাবা এইবার, সে যদি আজ স্থূলে থাকত এবং এই পরাধীনতার দারুণ শৃঙ্খল তার পায়ে পরত, তাহা হইলে সে কি শান্তি পেত? এই সংসারে কেউ কি শান্তি পাচ্ছে, না পেয়ে থাকে? তার চেয়ে আজ সে মুক্ত, শান্তির নির্ম্মল বাতাস তার অঙ্গে লেগেছে। শান্তিময়ের প্রশান্ত বক্ষে আজ সে বিরাজ করছে। বাবা, মুক্ত আকাশে মুক্ত বাতাসে বিচরণশীল পাখীকে যদি একটা পিঞ্জরে আবদ্ধ করে রাখ, তাহা হইলে তুমি তাকে যতই আদর কর সে কি কিছুতেই শান্তি পায়? মুক্ত দেশের জীব সে, যতক্ষণ না মুক্তির বাতাস তার গায়ে লাগে সে কি কখনও শান্ত হতে পারে? সেইরূপ চিরমুক্ত এই আত্মাকে জীবত্বের মোহে, জীবত্বের ধাঁধায় আর কতকাল আটকে রাখবে? সে যে মুক্ত দেশের মানুষ, সে যে স্বাধীন দেশের মানুষ, তাকে আর কতদিন পরাধীনতার গণ্ডীতে আবদ্ধ করে রাখতে পারা যায়? ফাঁক পেলেই সে উড়ে যাবে। অতএব বাবা! তার জন্য আর শোক করিও না, বরং তাঁর কাছে, সেই কৃপাময় শ্রীগুরুর কাছে তার শান্তির জন্য প্রার্থনা কর। আরও দেখ, সে যখন স্থূলে ছিল, অর্থাৎ তুমি তাকে যে জায়গাটা দিয়ে বুঝতে, অনুভব করতে, দেখতে, আজও ঠিক সেই জায়গাটা দিয়েই দেখবে, বুঝবে, অনুভব করবে। বরং স্থূলে সে দেখার, সে বুঝার, সে অনুভবের তারতম্য

হইত, কিন্তু আজ প্রতিনিয়ত, প্রতি মুহূর্ত্ত সে তোমার সঙ্গের সাথী। কারণ, সে ছিল তখন তোমার স্থূলবোধে আবদ্ধ, আর আজ সে সূক্ষ্মবোধে মুক্ত। এই থাকা বা না থাকা উভয়ই বোধ ছাড়া আর ত কিছুই নয়। অতএব যখন তুমি আছ, তখন তোমার বোধ আছে এবং বোধের বস্তুও আছে। অতএব কেউ মরে না। একটা বোধের তারতম্য হয় মাত্র। সুতরাং তার জন্য শোক কর কেন বা দুঃখ কর কেন? সে তখন এক জায়গায় তোমার বোধের এক অংশে ছিল, আজ সে বোধময়ী মা হয়ে তোমার অন্তর বাহির ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। এতদিন সে তোমার মায়া ছিল, আজ তার 'য়া' টি খসে গিয়ে 'মা' হয়ে গেছে। তাই বলি, দেখ সেই মাকে, ডাক সেই মাকে, ডুবে যাও মাতৃবোধে। মা, মা, বলিতে বলিতে আত্মহারা হয়ে বলিতে থাক—

ওঁ চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি, হরি ওঁ॥

ইতি —

বিশ্বজিৎ

(৭)

ওঁ

বৈদ্যনাথধাম
৫।১১।৪২

অভিন্নহৃদয়েষু—

স্নেহের ভাই! স্নেহময়ী মায়ের বিজয়াশীষ তোমার জীবনযুদ্ধে বিজয় আনয়ন করুক। তাঁর অমোঘ আশীষ, তাঁর করুণাই তোমার জীবনের চলার পথে একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র সাথী হউক, ইহাই তাঁর কাছে, এই দীন ভিক্ষুক তোমার জন্য ভিক্ষা চাচ্ছে।

আমার মনে হয়, সুদীর্ঘ দুঃখময় বিপদসঙ্কুল জীবনই জীবের কাম্য হওয়া উচিত। কারণ, দুঃখের মধ্যে, দৈন্যের মধ্যে, বিপদের মধ্যেই তাঁর আবির্ভাব হয়। ভাদ্রের ঘন বরিষার নিবিড় আঁধার ভেদ করিয়াই সেই মঙ্গলময়ের দিব্যজ্যোতিঃ জগতে প্রকাশ পেয়েছিল। কুন্তী শ্রীভগবানকে বলেছিলেন, "ঠাকুর, আমাকে এমনই করে চিরদিন দুঃখের মধ্যে রেখো, তাহলে তোমাকে ভুলব না।" যার জীবনে একমাত্র তিনিই কাম্য হন, যে সত্য সত্যই তাঁকে লাভ ক'রে, তাঁর অস্তিত্ব উপলব্ধি ক'রে জীবনকে ধন্য করতে চায়, তাহার জীবন প্রথম এইরূপই হওয়া উচিত। তথাকথিত সুখ শান্তির মধ্যে লালিত পালিত জীব উহাতেই মজিয়া থাকিতে চায়, উহাকেই জীবনের চরম বলিয়া মেনে নেয়,

ফলে দুঃখ ও অশান্তি পায়। পয়সা রোজগারই জীবনের চরম উদ্দেশ্য না হওয়াই উচিত। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, আমরা যথার্থ কি চাই? পয়সা? যশ? খ্যাতি? প্রতিপত্তি? না নির্ম্মল, পবিত্র, নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত আনন্দ। এই আনন্দকেই আমরা নানাভাবের ভিতর দিয়া, নানারূপের ভিতর দিয়া ভোগ করিতে প্রয়াস পাই এবং তাহাই পাইবার জন্য কখনও পয়সায়, কখন স্ত্রী-পুত্রে, কখনও বন্ধু-বান্ধবে, কখন যশ-খ্যাতি ইত্যাদিতে ঝুঁকে পড়ি। কিন্তু কিসে যে ইহা লাভ হয়, কোথায় গেলে যে ইহাকে পাওয়া যায়, সেই খুঁজতে গিয়ে অন্ধ আমরা, পথভ্রান্ত আমরা, এটা ওটা ধরতে গিয়ে অন্ধকারে ধাক্কা খেয়ে ব্যথা পাই। এ-পথ ও-পথ করতে গিয়ে পথ হারিয়ে হাঁপিয়ে উঠি। তাই মনে হয়, যখন এই সংসার বা জগৎ কর্ম্মক্ষেত্র এবং এখানে আসা মাত্র কর্ম্মক্ষয় করিবার, কামনা বাসনা শেষ করিবার জন্য, তখন সেইটুকুর জন্য যতটুকু প্রয়োজন, মাত্র ততটুকু করিয়া যাওয়াই ভাল। এবং সকল সময়েই সেই নিয়ন্তার দিকে দৃষ্টি বা লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখা উচিত।

ভাই, একটু চিন্তা করে দেখ যে, আমাদের ব্যথা দেয় কিসে? দুঃখ দেয় কিসে? অশান্তি হয় কিসে? মাত্র অভাব বোধেই – নয় কি? কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কিসের অভাব?

উত্তর—ভাবেরই অভাব। আমাদের স্ব-ভাবের অভাবই আমাদিগকে দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা, অশান্তি ইত্যাদি এনে দেয়। এখন দেখতে হবে, এই স্বভাবটী কি? স্ব-ভাব হচ্ছে, নিজের

অবস্থা। এই অবস্থার ত্রুটী বা বিস্মৃতিই অভাবের সৃজন করে। তাই সেই স্ব-কে, নিজেকে, জানতে হবে, চিনতে হবে। তবেই আমাদের দৈনন্দিন অভাব, অশান্তি, দুঃখ, কষ্ট ভুলতে পারব। যাকে পেলে আর পাওয়ার কিছু থাকে না, যাকে জানলে আর জানার কিছু বাকী থাকে না, তাকে পেতে হবে, তাকে জানতে হবে। তাকে পেতে হ'লে, তাকে জানতে হ'লে কিছুই ছাড়তে হয় না বা কিছুই ত্যাগ করতে হয় না। সবই যে সে—এইটে বুঝতে হবে। সে ছাড়া কোথাও কিছু নাই, কাজেই যাহাই ছাড়বে, তাহাতে তাহাকেই ছাড়া হবে। অতএব ও-সব কিছু নয়—ঐ ভোগের ভিতর দিয়া ত্যাগ ফুটিয়ে তুলতে হবে। বাহিরের ত্যাগ কিন্তু ত্যাগ নয়। ত্যাগ হয় অন্তরে অর্থাৎ অন্তর থেকে যখন আসক্তি একেবারে মুছে যাবে, তখনই ঠিক ঠিক ত্যাগ হবে। নচেৎ আমরা যা করি, ইহা ত্যাগের ভাণ মাত্র—ত্যাগ নয়। ইহা একটা মস্ত বড় মিথ্যাচার। যাক্, ইহা তবু একপ্রকার মন্দের ভাল। কারণ, ধর্ম্মের ভাণও ভাল। যদি এইরূপ ভাণ করিতে করিতে একদিন সত্যের আলো ফুটে বেরোয় মাত্র সেই আশায়। যাক্, ইহা অন্য কথা। এখন কথা হচ্ছে, সম্পূর্ণরূপে আসক্তিবর্জ্জনই যখন ত্যাগ, তখন দেখতে হবে আমাদের এই আসক্তি যাহাতে বুকের মধ্যে না আসন পেতে বসে। এখন এই আসক্তি যায় কিসে? সংসার যখন মাত্র কর্ম্মভূমি এবং মাত্র কর্ম্মক্ষয় করিতেই যখন আমাদের এখানে আসা, তখন আমরা আমাদের এই কর্ম্মের মধ্যে মুগ্ধ হ'য়ে আবার ইহা থেকে কতকগুলি কর্ম্ম সৃজন করি

কেন? কারণ কর্ম্মই কর্ম্ম প্রসব করে এবং ইহার একটা মাদকতা শক্তি আছে—ইহাই জীবকে সৎ বা অসৎ পথে নিয়ে যায়। সৎ—যাহা নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়। অসৎ যাহা অনিত্য এবং পরিবর্ত্তনীয়। অতএব জগৎ বা সংসার যখন পবিবর্ত্তনীয়, তখন ইহা নিশ্চয়ই অসৎ এবং ইহা হইতেই উদ্ভূত যাহা কিছু তাহাও পরিবর্ত্তনীয়। অতএব তাহা ত্যাজ্য। সুতরাং কোনও-রূপ আসক্তি না রেখে মাত্র কর্ম্ম ক'রে গেলেই মনে হয় ইহার মাদকতা শক্তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। বাগানের মালি কর্ম্ম করে যায়, বাগানের উপর তার কোনও আসক্তি থাকে না—ঠিক সেইরূপ সংসারকে সংসার ব'লে না দেখে ভগবান বলে দেখা উচিত এবং সংসারের সেবা করা ভগবানেরই সেবা করা, এই বোধ নিয়ে সংসার করিতে পারিলেও আসক্তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। যাক্— ।

অতএব, জীবনের ধর্ম্মই যখন পরিবর্ত্তন, তখন তোমার জীবনেও ক্রমশঃই পরিবর্ত্তন আনছে, তুমি নির্ব্বিচারে সেই পরিবর্ত্তনের স্রোতে নিজের নৌকাকে ছেড়ে দাও। কিন্তু ভাই, ঐ নৌকার হালটি দিও কিন্তু "জাত মাঝির" হাতে। তা'হলে যতই ঝড় তুফান উঠুক না কেন, ও নৌকা কখনও ডুবি হবে না। জেনো ভাই, স্থির সমুদ্রের বুকেই ঝড় উঠে এবং উহাই তাহার স্বভাব। অতএব সমুদ্রের মাঝ দিয়েই যখন আমাদের এই ভাঙ্গা ফুটা নৌকা নিয়ে পাড়ি দিতে হবে, তখন মাঝি যাহাতে ভাল হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। তাহ'লে আর বিপদের ভয়

থাকে না। তাই বলছি, লক্ষ্য যদি ঠিক থাকে, সঙ্কল্প যদি দৃঢ় হয় তখন আর কোনও ভয় নাই। ঐ সৎ কল্পনাই তোমাকে একদিন সেই 'সৎ' এর দিকে নিয়ে যাবে। আর একটা কথা—আমাদের দুঃখ কষ্ট বা অশান্তি আসিবার আর একটা কারণ আছে। সেটা হচ্ছে অভিমান বা অহংকার। ইহার হাত থেকে সর্ব্বদা নিজেকে রক্ষা করা উচিত। একজন আছেন—তাঁর হাতে এ নৌকার হাল ছেড়ে দিয়েছি, এখন তিনি যে দিকে নিয়ে যান সেই দিকেই চলব। ইহাতে আমার কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই। কারণ, বিশাল অনন্ত বিস্তৃত সমুদ্রবক্ষে ক্ষুদ্র যাত্রী আমি—ইহার ভিতরে দিক্ জ্ঞান হওয়া আমার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। যিনি নাবিক, যিনি অভিজ্ঞ, তিনিই ঠিক বুঝিবেন কিভাবে চলিলে নৌকা নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবে। অতএব, ইহাই যখন অবস্থা, তখন আমরা কিসের অহংকার করি বা কোন ছাই জ্ঞানের বড়াই করি। যাক্ অনেক কিছুই পাগলের মত বকিলাম। কিছু মনে করিস্ নি ভাই। এসব পাগলের পাগলামি ব'লে হেসে উড়িয়ে দিস্।

তুমি M.A পরীক্ষার জন্য তৈয়ারী হইতেছ জেনে বড় সুখী হলাম। ঈশ্বর তোমার সহায় হউন। তাঁর আশীর্ব্বাদ তোমার চেষ্টার সফলতা দিবে নিশ্চয়। তোমার শরীর কেমন আছে? পরম পূজ্যপাদ সেজকাকা ও পূজনীয়া কাকিমা কেমন আছেন? উঁহাদের শ্রীচরণে এই দীন ভিক্ষুকের শত সহস্র প্রণাম দিও। প্রাণাধিক পুত্রকন্যাগণকে তাঁর আশীষ দিও।

কল্যাণীয়া বধূমাতা কেমন আছেন? তাঁকে আশীর্ব্বাদ দিও। তুমি মধ্যে মধ্যে পত্র দিও। তোমার পত্র পেলে আমার বড় আনন্দ হয়।

আনন্দে থাক। ইতি—

দেব

(৮)

ওঁ

৺কালিঘাট
১৮।৭।৪৪ ইং

কল্যাণীয়াসু,

স্নেহের মা ..... !

কৃপাময় শ্রীগুরুর কৃপাশীর্ব্বাদই তোমার জীবনের একমাত্র সম্বল হউক। সেই অনাদিবর্ষি কৃপাবারি স্রোতে তোমার জীবন তরণী ভাসিতে থাকুক। কৃপাই জীবনের সাথী হউক মা! কৃপালাভই জীবনের লক্ষ্য হউক মা! তাঁর কৃপায় তাঁকে লাভ করে এ জীবন সার্থক কর – ইহাই প্রার্থনা।

গ্রহণের জন্য,—স্থানীয় সন্তানরা সেইদিন এখানে থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করায় এবং অন্যান্য কতকগুলি অনিবার্য্য কারণে গ্রহণ পর্য্যন্ত থাকিতে বাধ্য হইলাম। মঞ্জুর পয়সা এখনও বাহির হয় নাই—X-Ray, করিয়া জানা গিয়াছে। তাহাকে লইয়া ইহারা বড় বিপদে পড়িয়াছে। এখন, ঈশ্বরের কৃপাই একমাত্র ভরসা।

গ্রহণের সময় জপ্‌, ধ্যান, চিন্তা ইত্যাদি লইয়া থাকিবে। ও সময় কোনওরূপ বৈষয়িক চিন্তা করিবে না। গ্রহণের পরই যাইতে চেষ্টা করিব। সকল কাজের মধ্যেও, মন যাহাতে ঈশ্বর চিন্তায় রত থাকে সে বিষয় অভ্যাস করিবে।

মা গো! এই দুঃসময় সংসারের মধ্যে থাকিয়া, দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় মনকে শ্রীহরি চিন্তনে রত রাখা।

অনুক্ষণ চিত্তকে তাঁর চিন্তায় মগ্ন রাখিতে চেষ্টা করিবে। কখনও জপ্, কখনও ধ্যান, কখনও চিন্তা, কখনও তাঁর বিষয় আলোচনা, কখনও গান ইত্যাদিতে থাকা খুবই শান্তিদায়ক। যত বেশী এইভাবে নিজেকে তৈরী করিতে পারিবে ততই শান্তি পাবে। শান্তিময়ের শান্তিভরা নামছাড়া শান্তি পাইবার আর কোনও উপায় নাই। সংসার শান্তি দিতে পারে না মা, সংসার শান্তি দিতে জানে না। শান্তি যদি পেতে চাও, এই দুঃখের হাত থেকে যদি পরিত্রাণ পেতে চাও তবে সর্ব্বতোভাবে তাঁর শরণাপন্ন হও। তাঁর উপব তোমার সব কিছু ছেড়ে দিতে চেষ্টা কর— তাঁর উপর নির্ভর করিতে চেষ্টা কর। মা গো! আমাদের এই ভারবহ জীবনের বোঝা, এ জীবনের দায়িত্ব একমাত্র সেই কৃপাময় শ্রীগুরু ছাড়া আর কেহই নিতে চায় না। সে সর্ব্বক্ষণই এই বোঝা বইতে প্রস্তুত। আমাদের ছেড়ে দেওয়ার অপেক্ষায় সে জন্ম জন্মান্তর ধরে বসে রয়েছে। তাই বলি মা—আর ধরে থেকোনা —এইবার ছেড়ে দাও—নিজেকে সম্পূর্ণরূপে—

"নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বর"

বলে অর্পণ করে দাও। জীবন লাভ করবে। পরম শান্তির অধিকারিণী হইবে। জীবন লাভ করার যে সুখ, যে শান্তি তাহা অনুভব করিবে। আশা করি, কুশলে আছ। এ শরীর ভাল। ইতি—

—স্বামিজী।

(৯)

ওঁ

চন্দননগর
৯।৯।৪৪ ইং

পরম স্নেহভাজনেষু !

স্নেহের মা...... !

স্নেহঘন দেবতার স্নেহাশীর্ব্বাদ তোমার শিরে প্রতিনিয়ত বর্ষিত হউক। তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে লাভ করিয়া জন্মজীবন সার্থক কর।

এইমাত্র তোমার পত্রখানি পাইলাম। পত্রপাঠে পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। তোমার প্রাণের অবস্থা আমি এতদূরে থাকিয়াও প্রতিনিয়তই অনুভব করিতেছি। ইহা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, প্রাণ একটা-ই। অতএব, তাহার যে-অংশেই স্পন্দন উঠুক না কেন, সমস্ত অংশটাই সঙ্গে সঙ্গে স্পন্দিত হইয়া উঠে। জানিও, শ্রীগুরু আত্মপ্রাণ শিষ্যহৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই দীক্ষা। কাজেই ওখানে যাহাই কিছু ঘটুক না কেন, তিনি জানিতে পারিবেনই। বীণার তারে যে কোন অংশে অঙ্গুলী স্পর্শ করিলে যেমন সমস্ত তারটিই ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, ইহাও ঠিক সেইরূপ। তোমাদের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁহারই বুকে গিয়া আঘাত করে। তোমাদের হৃদয়-নদীতে যে চিন্তার ঢেউ, তাহা গিয়া গুরুবক্ষেই আঘাত করে। কাজেই তিনি ছাড়া এক

মুহূর্ত্তও নাই। ইহা এক অপূর্ব্ব সম্বন্ধ। গুরু শিষ্যের যে মিলন হয়, তাহা দেহের সঙ্গে নহে, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে নহে - সে মিলন হয় প্রাণে প্রাণে, হৃদয়ে হৃদয়ে। ইন্দ্রিয়ের মিলনে থাকে বিচ্ছেদ, থাকে দুঃখ, থাকে বেদনা। আর এ মিলনে বিচ্ছেদ নাই। কাজেই দুঃখ ও বেদনা কিছুই নাই—ইহা চিরন্তনী, শাশ্বত। এ মিলনে যে সুখানুভূতি হয় তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা আজ পর্য্যন্ত সৃজন হয় নাই। ঠিক্ এই কারণেই বৃন্দাবনের গোপীরা সেই বৃন্দাবনচন্দ্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য ঐরূপ পাগল হইয়াছিল। তাই বলি, এই মিলন সুখ যদি অনুভব করিতে চাও, তবে আত্মবলি দিতে চেষ্টা কর। অর্থাৎ নিজেকে বিলাইয়া দিতে চেষ্টা কর। যত নিজেকে ঢালিতে পারিবে, ততই দেবতার নিত্য মোহন বিকাশ হৃদয়াকাশে অনুভব করিতে পারিবে। জানিও মা! আত্মসমর্পণই সাধনার আরম্ভ এবং আত্মসমর্পণই সাধনার শেষ।

যাক্, পূজার সময় ঐ যে একটি অনুভূতির কথা লিখিয়াছ উহা খুবই সুন্দর। ঐ যে শূন্যবোধ হওয়া, ঐরূপ বোধ একটি চমৎকার অবস্থা। মন যে ক্রমেই সেই বিরাটে, সেই অনন্তে মিলিতে চেষ্টা করিতেছে, ইহা তাহারই পূর্ব্বাভাষ। খুব সুন্দর! বড় চমৎকার! আমার বড় আনন্দ হইতেছে।

কর এইভাবে সাধনা! ঢাল নিজেকে এইভাবে দেবতার চরণ প্রান্তে। ডাক তাঁহাকে প্রাণভরে দিবারাত্র। অনুভব করতে চেষ্টা কর তিনি তোমার একান্ত আপন, পরম

আত্মীয়, দরদী বন্ধু, তোমার ইহকাল পরকালের একমাত্র সাথী।

তাঁহার অভাববোধ যদি না জাগে তবে সেই স্বভাবকে জানা যায় না। দুঃখের তীব্রতা না জাগিলে সুখের মাধুর্য্য অনুভব করা যায় না। বিরহের জ্বালা না থাকিলে মিলনের শান্তি, তৃপ্তি উপলব্ধি হইত না। সেই কারণেই বলি, মিলন অপেক্ষা বিরহ অনেক ভাল। অনেকে বলেন, মিলনে সুখ কিন্তু আমি বলি, বিরহে সুখ বেশী। কারণ, বিরহতে সে আমার প্রতিটি শ্বাসের সাথী হয়। আমাকে সে ক্ষণিকের আড়াল করে না।

দেখ মা! একটি কথা মনে পড়িতেছে। আমাদের অর্থাৎ জীবের মন সদাই ব্যস্ত থাকে সেই বস্তুকে পাইবার জন্য যাহা দুর্লভ। যাহা সুলভ, যাহা অনায়াসলভ্য তাহার জন্য সে তত ব্যাকুল হয় না। ইহাই তাহার স্বভাব। তাই দয়াময় ঠাকুর আমার নিজে সব হইয়াও একটা পর্দ্দা দিয়া নিজেকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ সব রূপের সঙ্গে, সব ভাবের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া নিজে নিরাকার হইয়া রহিয়াছেন। আবার স্বেচ্ছায় কৃপাপরবশ হইয়া কখনও কখনও রূপ ধারণ করিয়া অর্থাৎ নিজ স্বরূপ প্রকট করিতেছেন। ইহাই তাঁহার জগৎ লীলা বা খেলা।

দেখ না, সেই রাসলীলার সময় যখন গোপীরা মনে করিল, এইবার ঠাকুরকে ঠিক আমার মত করিয়াই পাইয়াছি। অমনি আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তখন খোঁজ খোঁজ সাড়া

পড়িয়া গেল। ঠিক্ সেইজন্যই বৃন্দাবনের গোপীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অত সুলভ হইয়াও কত দুর্লভ ছিলেন। তাহারা যেন পাইয়াও পাইতেছিল না। ঠিক এই ভাবটা না? আমাদের দিক দিয়াও ঠিক সেইরূপ। বিচারে বা বুদ্ধিতে বুঝিলেও অনুভূতি নাই, কাজেই ভোগও নাই। সেইজন্যই চাই সাধনা, চাই অনুভূতি, চাই প্রাণ ঢালা ভালবাসা—প্রেম! যত ভালবাসিতে পারিবে, যত নিজেকে ভুলিয়া যাইতে পারিবে, ততই শান্তি পাইবে। সত্যই ঐ নিজের জন্যই যত জ্বালা, যত দুঃখ, যত অশান্তি। কেমন করিয়া নিজেকে সুখী করিব, নিজের আকাঙ্খা মিটাইব—এই চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকিতে হয়। যাক, এইসব কথা।

দেখ, সে নিষ্ঠুর বলিয়াই এত ভাল। সে যদি তোমার আমার মত দয়াময় হইত, তাহা হইলে বোধ হয় তাহার জন্য এত কাঁদিতাম না। আবার, সে কৃপণ বলিয়াই এত দাতা। সত্য সত্য মা! সে যে কি তাহা আজ পর্য্যন্ত ঠিকই হইল না - দেখা যাক্, কতদিনে এই ঠিক হয়।

* * *

এ শরীর একরূপ ভালই যাইতেছে। পত্রোত্তরে তোমাদের কুশল সংবাদ দিও। আনন্দে থাক।

ইতি—

বিশ্বজিৎ

(১০)

ওঁ

চন্দননগর

১৮।৯।৪৪

পরম কল্যাণীয়াষু,

স্নেহের······মা!

প্রিয়তম দেবতার প্রাণভরা স্নেহাশীর্ব্বাদ তোমার জীবনের একমাত্র সম্বল হউক, সেই অনাদিবর্ষি কৃপাবারি স্রোতে তোমার জীবন-তরণী ভাসিতে থাকুক! তাঁর কৃপায়, তাঁর আসন তোমার হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক! ইহাই তোমার জন্য, তাঁর কাছে প্রার্থনা করি।

তোমার ১৩ তারিখে লেখা পত্র আমি ১৬ তারিখে পাইয়াছি। পত্রপাঠে পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। শনিবার ও রবিবার সকাল থেকে রাত্র ১১টা পর্য্যন্ত এত বেশী ভিড় ছিল যে পত্র লিখিবার অবসরই পাইনি। সেই কারণে তোমার পত্রের উত্তর দিতে কিছু বিলম্ব হইল। তোমার পত্রখানি খুবই সুন্দর হয়েছে। পত্রে তোমার হৃদয়ের ভাব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সত্য সত্যই যে বিরহ বেদনায় অস্থির হয়ে উঠেছ— যার প্রাণ সত্যই সেই প্রিয় সঙ্গসুখলাভের আশায় উন্মুখ হ'য়ে থাকে—যে মাত্র নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তৃপ্ত থাকতে চায়—যে নিজেকে নিঃশেষ করে দেবতার চরণপ্রান্তে ঢেলে দিবার জন্য ব্যাকুল, যার বুকে সেই প্রেমময় দেবতার নাম স্মরণমাত্রেই বিপুল আনন্দস্রোত

বহিয়া যায়—বুঝিতে হইবে তাহার শুভদিন অতি সন্নিহিত। তাহার হৃদয়ের মেঘ—যাহা নিত্য প্রকাশিত গুরুশক্তিকে অনুভব করিতে দেয় না, ঢাকিয়া রাখে, তাহা ধীরে ধীরে কোন্ অজ্ঞাত দেশে অদৃশ্য হইবার উপক্রম হইতেছে। নিজ জীবনকে অমৃতের দেশে তুলিয়া লইবার পিপাসা যাহার হৃদয়ে সত্য সত্য, একটুও জাগিয়াছে, সে যথার্থই সেই সত্য বস্তুর পিপাসু। তাহার অন্তর—এ হৃদয়ের সমস্তটুকু বিলিয়ে দেবার জন্য উন্মুখ তাহার বিষয়দগ্ধ হৃদয়ের করুণ ক্রন্দনকে চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করিতে, তাহাকে মরজগৎ হইতে এক অমৃতময়ধামে লইয়া যাইবার জন্য, তাহার নিজ স্বরূপকে চিনাইয়া জানাইয়া, অমৃত লাভে অমর করিবার জন্য মঙ্গলময় ভগবান, ঐ যে গুরুশক্তিরূপে তোমার হৃদয়দ্বারস্থ। এক বিন্দু প্রাণ—এক বিন্দু ভালবাসা—তোমার দয়া করিয়া ভিক্ষা দাও! হও তুমি সংসার তাপদগ্ধ হও তুমি যতই ক্ষুদ্র তথাপি তোমার অমৃতপানের অধিকার আছে! দাও নিজের বুকখানিকে প্রাণটাকে দেবতার চরণপ্রান্তে ঢেলে দাও—ঢাল, একলব্যের মত ঢালিতে চেষ্টা কর! গুরুলাভ হবে, ভগবানকে পাবে—অমৃতময় হবে।

ওগো, সত্যই যদি তোমরা গুরুলাভ করিতে পার, সত্যই যদি শ্রীগুরুকে ভগবৎ করুণার মূর্ত্তবিকাশ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পার তিনি যে তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু - ভালবাসার ধন ; ইহা যত সত্য বুঝিতে পারিবে, ততই তাঁর দিব্য মোহন বিকাশ হৃদয়কল্পে সমুদিত হইবে।

ভয় নাই—দুঃখ নাই; অগ্রসর হও! নিজেকে তাঁর কাছে ছেড়ে দাও - ভালবাসার দ্বারা তাঁকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা কর—বুঝতে পারবে তুমি কত মধুময়।

তিনি দূরে নাই, তোমার অন্তর হইতে আরম্ভ করিয়া বিরাট বিস্তারে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। চক্ষু খুলিয়া দেখ—তিনি যে তোমাকে বড় ভালবাসেন—তাঁর এই ভালবাসা—এ কৃপা অনুভব করিতে চেষ্টা কর। জীবন ধন্য হবে। তুমি কৃতকৃত্য হবে। শিবমস্তু।

তোমাদের বাড়ীশুদ্ধ সব অসুখ জানিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত রহিলাম, পত্রপাঠ তোমাদের কুশল সংবাদ দানে সুখী করিও। আরও দু'খানি চিঠি আদান-প্রদানের সময় থাকিবে।

এ শরীর উপস্থিত ভালই। অন্যান্য সংবাদ ইহার পরপত্রে পাবে।

শ্রদ্ধেয় বাঁড়ুজ্যে মহাশয়কে আমার সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ জানাইও। অন্যান্য সকলকে মায়ের কৃপাশীর্ব্বাদ দিও।

পত্রপাঠ পত্র দিও। আনন্দে থাক। ইতি—

স্বামী বিশ্বজিৎ

বাঁড়ুজ্যে মহাশয়কে বলিও, তাঁর স্নেহপূর্ণ পত্র আমি পেয়েছি, পরে তাঁকে পত্র দিব। আজ বড় ব্যস্ত আছি। কোনও রকমে তোমাকে ২ কলম লিখিলাম। পত্র ছোট হল বলে দুঃখিত হইও না যেন।

(১১)

ওঁ

চন্দননগর

২১।৯।৪৭ ইং

পরম স্নেহভাজনেষু—

আনন্দময়ী মা আমার! আনন্দময় দেবতার স্নেহ ও করুণায় জীবন তোমার ভরিয়া উঠুক। এইমাত্র তোমার পত্রখানি পাইয়া বড় আনন্দ হইল। আমি দেখিতেছি পত্রগুলি এইখান হইতে ৩।৪ দিনে যায়। আমি তোমার পত্র যেদিন পাই, সেইদিনই কিংবা তারপর দিনই উত্তর দিই।

যিনি সত্যই জীবননাথ বা প্রাণনাথ, তাঁহাকে প্রাণের কোন কথাই মনে করাইয়া দিতে হয় না। কারণ, তিনি যে প্রাণরূপে তোমার অন্তরে প্রতিনিয়তই রহিয়াছেন। কাজেই ওখানে যেরূপ স্পন্দনই হউক না কেন, তিনি জানিতে পারেনই। যাউক একথা।

আগামীকল্য ষষ্ঠী। কল্য দুর্গত সন্তানদের বক্ষে তাহাদের দুর্গতিহরা জননীর বোধন হইবে। মায়ের আগমনের সাড়া বাংলার আকাশ বাতাস ধ্বনিত করিতেছে। এই প্রকৃতির দিকে চাহিলেই মনে হয় যেন, বিশ্ব প্রকৃতি দুর্গা দুর্গা করিয়া দুর্গতিহরার যোগনিদ্রা ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিতেছে। বৎসরান্তে মা আবার এই দুর্গত বাংলার ঘরে আসিতেছেন। যতই দুর্দ্দশাগ্রস্ত, যতই

আর্ত্ত আজ তাহারা হউক না কেন, তত্রাপি আজ তাহাদের আনন্দের সীমা নাই। করুণাময়ী মা এবারও তাঁহার ঐ লাঞ্ছিত দুর্ভিক্ষগ্রস্ত সন্তানদের 'মা' বলিয়া ডাকিবার অধিকার দিয়াছেন। মাত্র এইটুকু আনন্দেই আজ তাহাদের বুকগুলি ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। অসহায়, দীন, ক্ষুধার্ত্ত সন্তানগণ আজ ভুলিতে চেষ্টা করিতেছে তাহাদের অতীত দুঃখের স্মৃতি। আজ তাহাদের বিষাদ-মলিন মুখে মাতৃআগমনজনিত আনন্দের ক্ষীণ হাসিটুকু মুখে লইয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেছে তাহাদের ঐ দুর্গতিহরা জননীর কাছে। তাহাদের আশা, তাহাদের ভরসা, তাহাদের একমাত্র উপায় হইতেছে 'মা'। তাহারা যে আজ বড় আর্ত্ত, বড় অসহায়, বড় দুর্ব্বল, বড় দুর্দ্দশাগ্রস্ত! আজ শত কষ্ট, সহস্র লাঞ্ছনা উপেক্ষা করিয়াও আর একবার তাহারা কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেছে তাহাদের মায়ের কাছে। যদিও তাহাদের কোমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তবুও তাহাদের নিরাশার মাঝেও আশার ক্ষীণ আলোটুকু জ্বালাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে মাত্র এই আশায় যে, যদি মায়ের দয়া হয়। যদি মা তাঁহার এই হতভাগ্য, দীন আর্ত্ত সন্তানদিগের মলিন মুখগুলির দিকে চাহিয়া একটু কৃপা করেন তবেই তাহাদের আবার সেই শুভদিন ফিরিয়া আসিবে। অন্নপূর্ণার পরিপূর্ণ ভাণ্ডার আবার দিকে দিকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। থাক্ এই পর্য্যন্ত।

আজ আর বেশী লিখিবার অবসর নাই। পাছে চিঠি পাইতে দেরী হইলে তোমার কষ্ট হয়, সেই কারণে শত কাজ ফেলিয়াও তোমাকে পত্র দিলাম। আজ মাত্র এই একখানি চিঠিই লেখা

হইল। তুমি এই চিঠির উত্তর সময় মতই দিও। আগামী ৺লক্ষ্মীপূজার পরই এখান হইতে বীরভূম যাইব। সেখানে একদিন থাকিয়া সিউড়ি পৌঁছিব। সেখানে একদিন থাকিয়া বৈদ্যনাথ রওনা হইব।

তোমার সাধনা খুবই সুন্দর হইতেছে। বেশ নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইতে থাক মা! বড় শান্তি পাবে। একটা অমৃতময় জীবন লাভ করিতে পারিবে। জন্মমৃত্যুর ধাঁধা চিরতরের জন্য ঘুচিয়া যাইবে। শ্রীগুরু তোমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন, ইহাই প্রার্থনা।

তোমাদের অসুস্থ সংবাদে চিন্তিত হইলাম। পত্রপাঠ কেমন আছ সকলে জানাইয়া সুখী করিও। বাঁড়ুজ্যে মহাশয়ের শরীর কেমন? তাঁহাকে আমার সশ্রদ্ধ আন্তরিক ভালবাসা দিও। তিনি কি আমাকে কোন পত্র দিবেন না? শ্রীমতী......কেমন আছে? তাহাকে আশীর্ব্বাদ দিও। স্নেহের শ্রীমান.......কে আশীর্ব্বাদ দিও। সে ভাল আছে ত?

৺লক্ষ্মীপূজার পর যাওয়া হইতে পারে এইরূপ ইচ্ছাই আছে। এখানে থাকা বা খাওয়ার যত অসুবিধাই থাকুক না কেন, আমার নিজের কোন অসুবিধা হইতেছে না। কারণ, দুইটি ছেলে আমার কাছে আসে সেবার জন্য। ভোগ ইত্যাদি তাহারাই রান্না করে। সমস্তই তাহারা করিতেছে। অন্নপূর্ণার কৃপায় ভাণ্ডার পূর্ণই আছে। স্থানীয় সন্তানরা তাহাদের বহুকালের আশা পূর্ণ হইতেছে বলিয়া জীবনান্ত করিয়া দেখিতেছে। কোনরূপ অভাব বোধ করিতে দিতেছে না। শনিবার ও রবিবার প্রায়

৯০।১০০ জন লোক হয়। অন্য দিন দুই বেলায় প্রায় ৬০।৭০ খানি পাতা পড়ে। কোথা হইতে যে কি হয় কিছুই বুঝি না। জিনিষপত্র (চাল, ডাল ইত্যাদি) যেন ভূতে যোগায়। আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমি নিজেই অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতেছি। চুঁচূড়া, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, কালনা, মেমারী, সাতগাছিয়া, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে ভক্তের আগমন প্রায় প্রত্যহই হইতেছে। সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত কেবল লোক আর লোক। দুপুরে ২।৩ ঘণ্টা সময় পত্র লেখার জন্য কোনরূপে করিয়া লইয়াছি। তাহাও শনি, রবিবার বন্ধ।

যাক, কয়েকটা দিন বাদেই আবার তোমাদের কাছে যাব। সেই খোলার বাড়ীর ঠিকানাটি কোনও রকমে ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইতে পারিলে সুবিধা হইত। দেখ, যেরূপ সুবিধা হয় করিও।

দুধটাই কেবল মোটেই পাওয়া যাইতেছে না। ঘি এর সের ৬৲।৮৲ টাকা হইলেও আমার অভাব হইতেছে না। প্রায় সকল বাড়ী হইতে, গ্রাম হইতে সকলে কিছু কিছু ঘি ঘরে তৈয়ারী করিয়া আনিতেছে। তৈল হইতেই এই ন্যাবা রোগের সৃজন (ডাক্তারদের অভিমত) বলিয়া ছেলেরা আমাকে তৈলের সংস্পর্শে যাইতে দেয় না। আমার কোন আপত্তিই টিকে না। তুমি ভাবিও না। "আমি মার হাতে খাই পরি, মা আমার নিয়েছেন সকল ভার।"

এ শরীরটা এখনও ভাল আছে। তোমাদের কুশল সংবাদ পত্রপাঠ দিও। আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(১২)

ওঁ

চন্দননগর

৭।১০।৪৪ ইং

স্নেহের মা...... !

স্নেহময় দেবতার স্নেহাশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। পত্রপাঠে পরম প্রীতিলাভ করিলাম। তোমার অন্তরের আকুল আহ্বান দেবতার কর্ণে পৌঁছিয়াছে। ভক্তের আহ্বানে ভগবানের আসন টলে। ঠিক্ এমনি করিয়া ভক্ত যখন ডাকিতে থাকে তাহার ভগবান্‌কে, তখন তিনি আর থাকিতে পারেন না। তখনই তিনি ছুটে যান তাঁহার ঐ প্রিয় ভক্তের কাছে শ্রীগুরুমূর্ত্তিরূপে এবং সেই ভগবৎ বিরহ-তাপদগ্ধ ভক্তকে সস্নেহে নিজবক্ষে তুলিয়া লইয়া জুড়াইয়া দেন তাহার ত্রিতাপ জ্বালা, মুছাইয়া দেন তাহার জন্ম-জন্মান্তরের চোখের জল।

সত্যই আমরা তাঁহাকে ডাকি না। আমাদের যে ডাক সে ডাকে প্রাণের সাড়া নাই। সে ডাকে আছে মাত্র আমাদের স্বার্থ এবং সেই স্বার্থ পূরণের এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা। তাই বলি, তিনি কোনও মন্ত্র-তন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। তিনি কোনও ক্রিয়াকাণ্ডের অপেক্ষা রাখেন না। তিনি চাহেন মাত্র সরল শিশুর মত ডাক। সরলপ্রাণে অন্তরের সরলভাব তাঁহাকে

নিবেদন করিয়া ঠিক তোমারই মত বলিতে হয়, "এস ঠাকুর! এস ভগবান! এস ওগো দেবতা আমার! আর যে তোমার অদর্শনের জ্বালা সহ্য করতে পারছি না।"—ইত্যাদি। এইরূপ ডাকই সেই অচঞ্চলকে চঞ্চল করিয়া তুলে, সেই নিত্যস্থির দেবতাকে অস্থির করিয়া তুলে। এবং তখনই তাঁর আবির্ভাব হয় ঐ ভক্তের সম্মুখে এবং খুলিয়া দেয় তাহার চোখ হইতে মায়ার চশমা। জানাইয়া দেয় তাহাকে তাহার আপন স্বরূপ এবং চিনাইয়া দেয় তাহাকে তাহার আপন ঘর।

আগামী বুধবার এখান হইতে রওনা হইয়া পাণ্ডুয়া পৌঁছাইব। সেদিন সেখানে থাকিয়া বৃহস্পতিবার রাত্রের ট্রেণে পাণ্ডুয়া হইতে রওনা হইয়া শুক্রবার সকাল দশটায় দেওঘর পৌঁছিবার ইচ্ছা আছে। তোমার এ পত্রের উত্তর মুখেই শুনিব।

এ শরীরটা ভাল নাই। ২।৩ দিন যাবত আমাশয়ে ভুগিতেছি। আজ একটু ভাল। আশা করি সকলে তাঁহার কৃপায় কুশলে আছ। আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(১৩)

ওঁ

ঝান্সি।
'২৪।১২।৪৪ ইং

স্নেহের মা……!

স্নেহঘন অন্তর্দ্দেবতার স্নেহ এবং করুণা তোমার জীবন নূতন ভাবে গড়িয়া তুলুক। সেই অনাদিবর্ষি কৃপাবারি স্রোতে তোমার জীবন-তরণী ভাসিতে থাকুক। তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে লাভ কর।

পত্রপাঠে সুখী হইলাম। পত্র দিবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সুযোগ হইয়া উঠে নাই। কি যে অবস্থা চোখে না দেখিলে বুঝিবে না বা বিশ্বাস করিবে না। গতকল্য তোমার চিঠিখানি পাইয়াছি। এবং ঠিক সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ এই পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া চিঠি দিবার সময় করিতে পারিলাম। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে সাক্ষাতে বলিব।

তিনি যদি অন্তর্য্যামী বা অন্তরের ঠাকুর হন, তবে প্রত্যেকটি অন্তরের অবস্থাই তাঁহার জানা থাকা স্বাভাবিক। তিনি সকল জানিয়াও যেন কিছুই জানেন না—এইভাবে থাকেন। ইহা তাঁহার একটি বিশিষ্ট করুণার লক্ষণ। মনে হয়, "তিনি দয়াময় হইয়াও কেন এত কষ্ট দেন?" ইহার উত্তর—তিনি ঐরূপ কষ্ট দিয়াই আমাদের হৃদয়ক্ষেত্র তৈয়ারী করেন। একটা জমি ভাল-

ভাবে কর্ষণ করিতে হইলে তাহার বুকের উপর কত লাঙ্গল চালান হয়, কত শাবল কোদালের আঘাত পড়ে—তবে সে জমি ভাল হয় এবং তাহা হইতে উত্তম ফসলই উৎপন্ন হয়। আমাদের হৃদয় ক্ষেত্রও ঠিক্ ঐরূপ। বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ইহা এত বেশী শক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে উহাকে দুঃখ কষ্টরূপ লাঙ্গলদ্বারা কর্ষণ না করিলে কিছুতেই উহা হইতে ভাল ফল আশা করা যায় না। সেই জন্যই করুণাময় শ্রীগুরু "কৃষ্ণ" মূর্ত্তিতে অন্তরে বসিয়া জীব হৃদয় কর্ষণ করিতে থাকেন। যাক্ এ সব কথা।

সাধক জীবনে প্রিয় বিরহজনিত দুঃখ বা ব্যথার অনুভূতি বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহাকে নিকটে পাইবার আকাঙ্খা যত বেশী বাড়িবে, ততই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিবে। ঠিক সেই কারণেই গুরুতে বা ইষ্টমূর্ত্তিতে প্রিয়ত্ববুদ্ধি বা প্রেমের আয়োজন। যত ভালবাসিতে পারিবে, ভালবাসার দ্বারা হৃদয় যত পূর্ণ করিতে পারিবে, হৃদয়ের বৃত্তিগুলি ততই ভাল হইতে থাকিবে। ক্রমে জগতের সর্ব্ব বস্তু, সর্ব্ব জীবই তোমার চোখে ভাল বোধ হইবে। সকলের উপরই একটা প্রিয়ত্ববোধ জাগিবে। নিজ হৃদয়কে প্রেমের দ্বারা গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা কর। তাহা হইলেই সেই প্রেমিক ঠাকুরকে পাইবে।

শরীর ভালই আছে বলিয়া মনে হয়। যদি কোন বাধা বিঘ্ন না হয়, তবে আগামী বুধবার মেলে এখান হইতে ঢোলপুর রওনা হইবার ইচ্ছা আছে। সঠিক সংবাদ তারে পাইবে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাঁড়ুয্যে মহাশয় আশা করি ভালই আছেন। আমার

স্নেহময়ী মা ও মাসীরা কেমন আছে? সকলকে আশীর্ব্বাদ দিও। অন্যান্য সংবাদ সাক্ষাতে বলিব ও শুনিব। আনন্দে থাক।

ইতি—

বিশ্বজিৎ

(১৪)

ওঁ

ঝান্সি।
২৫।৯।৪৫ ইং

কল্যাণীয়া স্নেহের……মা!

স্নেহময় শ্রীগুরুর স্নেহাশীর্ব্বাদ লও। তোমার দুইখানি পত্রই পাইয়াছি। পত্র আসিতে একদিন দেরী হইয়াছিল। পত্রপাঠে সবিশেষ অবগত হইলাম।

মা! শান্তিময় শ্রীগুরু তোমার অশান্ত চিত্তকে শান্ত করুন, ইহাই প্রার্থনা। দেখ, সমুদ্রের মাঝে যাহারা বাস করে, তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে তাহাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করিবেই। কারণ, তরঙ্গ তোলাই সমুদ্রের স্বভাব। অতএব, এই সংসাররূপ সমুদ্রের মাঝে থাকিতে গেলে সুখ দুঃখরূপ তরঙ্গের আঘাত লাগিবেই। সুখ এবং দুঃখ, এই দুইটী অবস্থা লইয়াই সংসারে একটির সহিত অপরটির অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ। জীবনে দুঃখ যখন খুব ঘন হইয়া আসে, তখনই বুঝিতে হইবে, এইবার সুখ আসিবে। যাহাদের জীবনে যত বেশী আঘাত আসিয়াছে, তাহাদের জীবন ততই সমুন্নত হইয়াছে। অতএব, দুঃখতে কাতর হইও না। সর্ব্বদার জন্য মনে রাখিতে চেষ্টা করিও, সুখ এবং দুঃখ মনেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র।

ভালবাসার কোনও বস্তুর স্থূল অভাবে আমাদের চিত্তের যে বিক্ষেপ উপস্থিত হয়, উহা কিন্তু ভালবাসা নহে। উহা মাত্র

উচ্ছ্বাস--ঐ উচ্ছ্বাস ক্ষণস্থায়ী। ভালবাসা কিন্তু তাহা নহে—উহা চিরন্তনী এবং অতি গম্ভীর শান্ত, স্থির পবিত্র এবং নির্ম্মল। এইরূপ ভালবাসা কিন্তু কিছু প্রতিদানের আশা করে না, কোনও কিছু লক্ষ্য করে না। সে আপন বেগে বহিতেই থাকে। আপেক্ষিক ভালবাসা দুঃখদায়ক। কোনও স্থূল বস্তুর উপর আমাদের যে ভালবাসা উহা ভালবাসা নহে, মোহ মাত্র। বস্তুর অভাবে ভালবাসারও অভাব হয়। একটা অবস্থা বা গুণের উপর যে প্রিয়ত্ববোধ স্থাপিত হয় সেইরূপ ভালবাসাই আসল। কারণ, সে কোনও স্থূলকে কোনদিনও লক্ষ্য করে না। কারণ, সে যতদিন থাকে তাহার অন্তরের সে ভাবও ততদিন থাকে এবং সেই ভাবের অভিব্যক্তিই থাকিয়া যায়। কাজেই সেই জীব, সেই সাধক আপন ভাবে মগ্ন থাকে—কোনও অবস্থাই তাহাকে আর সেই ভাব হইতে বিচলিত করিতে পারে না। ইহার নাম ঈশ্বরীয় প্রেম। বিচ্ছেদ বা বিরহের ভিতর দিয়াই এই প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা সেই সাধক যখন দেখিতে পায় যে তাহার ভালবাসার সেই স্থূল প্রতীকটির সাময়িক অভাবেও তাহার মনের ভাব ঠিক অপ্রতিহতভাবেই আছে, তখনই সে বুঝিতে পারে যে, তাহার ভালবাসার উচ্ছ্বাসটি কমিতে আরম্ভ হইয়াছে। দুধ যতক্ষণ পাতলা থাকে, ততক্ষণই তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য একটা পাত্রের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যখন সে ঘন হয়, তখন তাহাকে যে কোনওরূপ পাত্রে রাখা যাউক না কেন, পড়িয়া যাইবার বা নষ্ট হইবার কোনও ভয় থাকে না। উচ্ছ্বাস যতক্ষণ

থাকে ততক্ষণই থাকে চঞ্চলতা। কিন্তু এই উচ্ছ্বাস যত কমিতে থাকে, ভাবও তত গভীর হইতে থাকে এবং তখনই ইহা স্থায়ী হয়। তোমরা স্ত্রীলোক—খুব ভালই বুঝিতে পারিবে যে বিবাহিত জীবনের প্রথমে যেরূপ অবস্থা থাকে পরে আর সেরূপ থাকে না। তাহার অর্থ কি তাহার ভালবাসা কমিয়া গিয়াছে? —তাহার ভালবাসা আরও গভীর হইয়াছে; মাত্র উচ্ছ্বাসটি, ভাবের চঞ্চল অবস্থাটি কমিয়া গিয়াছে। ভালবাসা বা প্রেম অন্তরের জিনিষ। উহা কোথাও হইতে আনা যায় না, কোনও কিছুর অপেক্ষা করে না। ইহা নিজ হইতে জন্মায়। চেষ্টা করিয়া ভালবাসা হয় না। যে সত্যিকারের ভালবাসে, সে মাত্র ভালবাসিয়াই সুখী হয়—ভালবাসা পাইবার দিকে লক্ষ্য রাখে না।

মিলন অপেক্ষা মিলনের আকাঙ্খাই বেশী শান্তিদায়ক। সেই জন্যই বিচ্ছেদের সৃজন হইয়াছে।

"আজ বিরহের অন্তরালে
মিলন বাঁশী বল কে বাজালে।"

—এই ভাব। এই মিলন এবং বিচ্ছেদ লইয়াই সংসার। বিচ্ছেদ বা বিরহ আছে বলিয়াই মিলনের মাধুর্য্য এত বেশী। ইহার মধ্যে যদি একটি না থাকিত তাহা হইলে অপরটির জন্য জীব এত অস্থির হইত না। যাহা হউক, এই সকল বিষয় তোমাদিগকে অনেকবার বলিয়াছি, উহা সম্বন্ধে আর বিশেষ কি লিখিব? এক কথায় জানিয়া রাখ, তিনি মঙ্গলময়। তিনি কখনও আমাদের অমঙ্গল করিতে পারেন না। যদিও তাঁহার এইরূপ কোনও ব্যবস্থা

আমাদের পক্ষে আপাতদুঃখদায়ক হয়, তাহা হইলেও জানিবে, ইহার তলদেশে কোনও মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত আছে। অতএব মা, যে কোন অবস্থাই আসুক না কেন, সে অবস্থা বা ঘটনা সুখদায়ক বা দুঃখদায়ক হউক না কেন তাঁহার স্নেহের দান বলিয়া মাথা পাতিয়া লইতে চেষ্টা করিও। এবং একটু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিলে নিজেই বুঝিতে পারিবে, কোন্ উদ্দেশ্যে কি কার্য্য হইয়াছে। যাহা হউক, এই বিষয় লইয়া নিজেকে বিক্ষিপ্ত করিও না। বেশ ধীর স্থিরভাবে তাঁহাকে বুকে লইয়া তাঁহার নাম করিতে থাক। যে তাঁহার শরণাপন্ন হয়, যে তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারে, তাহার জীবন কখনও দুঃখময় হইতে পারে না।

আমি স্থির করিয়াছি, আগামী বুধবার ৩১শে জানুয়ারী বেলা ১টার ট্রেণে এখান হইতে রওনা হইয়া লক্ষ্ণৌ হইয়া সোজা দেওঘর যাইব।

* * *

তোমার শরীর কেমন আছে? তোমাদের বাটীর আর আর সকলে ভাল আছেন ত? সকলকে শ্রীভগবানের কৃপাশীর্ব্বাদ দিও। এ শরীর একরূপ আছে। আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(১৫)

ওঁ

ঝান্সি।

২৮।১।৪৫ ইং

স্নেহের ·········মা !

স্নেহঘন অন্তর্দ্দেবতার স্নেহ ও করুণারসে তোমার জীবন সঞ্জীবিত হউক। পত্রপাঠে সবিশেষ জানিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম।

আজ পর্য্যন্ত কোন মহৎ কর্ম্মই অল্প আয়াসে সমাধান হয় নাই। যাহার জীবনে যত বেশী কষ্ট আসিয়াছে, যে জীবন আঘাতের পর আঘাত পাইয়াছে, সেই জীবনই সমুন্নত হইতে পারিয়াছে। জীবের জীবন যত বেশী অন্ধকার বলিয়া মনে হয়, সে জীবনে তখনই তাঁহার প্রকাশ হয়। সেই স্নিগ্ধ উজ্জ্বল নয়নমনোহর জ্যোতি ততই তাহার নয়নপথে উদ্ভাসিত হইতে থাকে।

মাগো, ভাদ্রের ঘন বরিষার নিবিড় আঁধার ভেদ করিয়াই সেই অভ্রভেদী গোকুলচন্দ্রের প্রকাশ হইয়াছিল। কত সাধক এই আনন্দ, এই শাশ্বত শান্তি লাভ করিবার জন্য কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া, কত শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা উপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন, কত কষ্ট সহ্য করিতেছেন। বৃন্দাবনের গোপীরা সেই বৃন্দাবনচন্দ্রকে লাভ করিবার জন্য কত না আঘাত বুক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; কত লাঞ্ছনা তাঁহারা

পাইয়াছেন, কতই কান্না তাঁহারা কাঁদিযাছেন। দুঃখের ভিতরই সেই করুণাময়ের করুণা নিবিড়ভাবে বুঝা যায।

তাই বলি, যে সাধক, যে জীব এই সমস্ত জাগতিক লাঞ্ছনা, আঘাত, দুঃখ, বিবাদ প্রভৃতির মধ্যে নিজের বিশ্বাসকে অটুট রাখিতে পারে, শত প্রলোভনের ভিতর থাকিয়াও নিজের নিষ্ঠাকে ঐকান্তিকভাবে রক্ষা করিতে পারে, শত আঘাত পাইয়াও যে ভাঙ্গিয়া না পড়ে, তাহার জীবনেই একদিন সেই প্রেমঘন-মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে বা সেই সাধকই সেই শাশ্বত শান্তি লাভ করে; এই জন্মমৃত্যুর কল্পিত ধাঁধা হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে। যদি তাঁহাকেই জীবনের সার করিযা থাক, যদি তিনিই তোমার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা হযেন, তবে তোমার বলিতে যা কিছু আছে, যথা -ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য, শোক-শান্তি, মান-অপমান ইত্যাদি সমস্ত "গোবিন্দায় নমঃ" বলিযা সমর্পণ করিযা দিযা, মনপ্রাণ ঢালিয়া দিযা একনিষ্ঠভাবে নাম করিতে থাক। হৃদযে নামীর রূপ লইয়া, মুখে নাম লইয়া সেই পরম শান্তিময়ের দিকে অগ্রসর হইয়া চল বিমল শান্তি, অপার্থিব সুখ, অফুরন্ত ভালবাসা, অনন্ত আনন্দ লাভ করিযা মানব-জীবন ধন্য করিতে পারিবে।

আজ পূর্ণিমা। তোমার চিঠি গতকাল বৈকালে পাইয়াছি। কাজেই হোমের মন্ত্র লিখিয়া কি লাভ? এখন যাক্, দেওঘর ফিরিয়া নিয়মিতভাবে সব করিও। বাংলা গীতা যদি পাও তবে তাহা পাঠ করিতে কোন আপত্তি নাই। তোমার স্বামীর কাজ যাহা যেরূপভাবে করিয়া আসিতেছ, তাহা সেইভাবে নিশ্চয়ই

করিবে। তবে এইভাব রাখা ভাল,—"তিনি এতদিন মনুষ্যরূপে তোমার কাছে ছিলেন, এখন তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া তিনি হইয়াছেন। তুমি তাঁহার সেইরূপের (যেরূপে তোমার কাছে ছিলেন) প্রতি তোমার অন্তরের সবটুকু শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছ।" ইহাই প্রকৃত শ্রদ্ধা।

* * *

তোমাদের বাড়ীর সকলকে আশীর্ব্বাদ দিও। এ শরীর এক-রূপ। আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(১৬) মধুপুর

ওঁ ৫।৪।৪৫

পরম কল্যাণীয়াষু,

শ্রীমতী······মা !

শ্রীভগবানের কৃপাশীর্ব্বাদ লও। পত্রপাঠে সুখী হইলাম। শরীর বিশেষ ভাল নাই। মাথায় একটা ফোঁড়া এবং কানের মধ্যেও কি জানি কি একটা হয়েছে, মাঝে মাঝে যন্ত্রণা হয়। যাক্ গে। ওসব নিয়ে আর ভাল লাগে না। এই যন্ত্রটাকে নিয়ে যেমনভাবে চালান দরকার মনে করবো সেই ভাবেই চালাবো। তবে এর কতকগুলি অংশ বোধ হয় মরচে ধরে গেছে কিংবা বোধ হয় খারাপ হ'য়ে গেছে—এটাকে দিয়ে কাজ করাতে গেলে সারান দরকার। আবার সারান দরকার কিনা তাহাও ত বুঝি না—কারণ আমার চেয়ে বেশী বুঝে, যিনি ইঞ্জিনীয়ার (যন্ত্রের বিশেষজ্ঞ)। তবে আর ভাল লাগছে না। বড় বিরক্তি আসছে, চাকর সুবিধা রকম পাওয়া যায়নি। সাতগেছে থেকে দুটী ছেলে চন্দননগর থেকে জিনিষপত্র নিয়ে এসেছে। তারা আছে এবং রান্না ইত্যাদি সব কাজই করছে। দিন চলছে এক রকম। খোকা গেছে, তার কাছে এখানের সংবাদ সবই শুনেছ বোধ হয়।

তাঁর প্রতি প্রেম যত গভীর হবে, হৃদয় ততই ভগবৎভাবে পূর্ণ থাকিবে। সকল সময় নামজপ অভ্যাস করা ভাল, মনের সংশয়ভাব সম্পূর্ণরূপে না গেলে বিশ্বাস দৃঢ় হয় না। বিশ্বাসের দৃঢ়তা না এলে অনুভূতিক্ষেত্র পরিষ্কার হয় না। ভক্তের সকল

ভাব, ভগবান বহন করিয়া থাকেন। তিনি অহেতুকী কৃপাসিন্ধু, প্রেম ভালবাসা ছাড়া তিনি আর কিছু চান না। কিন্তু ভক্ত দিতে চায় তাঁহাকে তাহার যা কিছু প্রিয় আছে। জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হচ্ছে শরীর, ধন ও মন। (তনু, মন, ধন)। তাঁর সেবায় এই তিনটি নিয়োগ করিতে হইবে। যে পরিমাণে তাঁকে তনু, মন ও ধন উৎসর্গ করিতে পারিবে, সেই পরিমাণে আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করিবে। ভগবান বাহিরের বস্তু নহেন। তিনি হৃদয়বিহারী। যেন জীবসেবায় ভগবানের সেবা হয়। সকলকেই ভগবানবোধে সেবা করা উচিৎ।

আজ আর বিশেষ কিছু লিখতে ইচ্ছা করিতেছে না। এবারে পত্রটি একটু ইচ্ছা করেই দেরী ক'রে দিলুম, কারণ বেশী ঘন ঘন পত্র দিলে যদি আবার তোমার মন খারাপ হ'য়ে যায়। কারণ, তোমার মন ত কারণ অকারণে খারাপ হয়ে থাকে। কাজেই দেরী করে পত্র দেওয়াই ভাল।

তোমরা সকলে কেমন আছ? শ্রদ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিও। শৈল মা কেমন আছে? তাকে আশীর্ব্বাদ দিও। আলোক, ছবি, ভবানী কেমন আছে? সকলকে আশীর্ব্বাদ দিও।

মধ্যে মধ্যে তোমাদের সংবাদ পাইলে সুখী হইব। আনন্দে থাক।

ইতি—

স্বামী বিশ্বজিৎ

পুনঃ—অপর পত্রখানি পিসিমাকে দিও।

(১৭)

ওঁ

মধুপুর
৯।৪।৪৫ ইং

কল্যাণীয়া,

স্নেহের•••...মা !

স্নেহময় অন্তর দেবতার স্নেহকরুণা তোমাকে প্রতিনিয়ত অভিসিঞ্চিত করুক। পত্রপাঠে পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। তুমি লিখিয়াছ যে আমার যাইবার কথা ছিল, কিন্তু কৈ আমি ত একথা জানি না? আমার যে ওখানে যাইবার কথা ছিল বা শীঘ্রই যাইবার কথা হবে এমন কোন কথা এখনও পর্য্যন্ত শুনি নাই। বরঞ্চ ইহা দেখিতে পাচ্ছি আমাকে এখানে কায়েমীভাবে সংসার করিতে হইবে। এ রীতিমত যাকে বলে মথুরায় রাজা হয়ে বসা। চুঁচুড়া থেকে চণ্ডি, সাতগেছে ও বর্দ্ধমান হইতে কয়েকটি ছেলে ও কয়েকটি মেয়ে আসিয়াছে; ইহাদের মধ্যে ২।৩ জন পরশু চলিয়া যাইবে। এবং সংক্রান্তির আগের দিনে কলিকাতা, আসানসোল, চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থান হইতে গুটিকতক ছেলে আসিবে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। প্রত্যহ এখানে সকালে বিকালে প্রায় ১৬।১৭ খানি পাতা পড়িতেছে। শরীর ভাল না থাকিলেও শরীরের সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবসর নাই। সকাল, দুপুর, বৈকাল, সন্ধ্যা সকল সময় ভগবৎ প্রসঙ্গ চলিতেছে। মনে হইতেছে বেশ

আনন্দেই দিনগুলি কাটিতেছে। কিন্তু ভাবিতেছি, এত সুখ সহিলে হয়—কারণ, সেই ছড়াটির কথা মনে পড়ে গেল—"এত সুখ যদি তোর কপালে, তবে কেন তোর কাঁথা বগলে?"

মীরার সংবাদ পেয়েছি। মায়ের কাছে তার আরোগ্য কামনা করি। তোমার পিসিমাকে বলিও চণ্ডি আসিয়াছে। তিনি কৈ পত্র ত দিলেন না? টাকা যাহা আসে তোমার কাছে রাখিয়া দিও। প্রয়োজন হইলে পাঠাইতে লিখিব।

মুখখানি ও বুকখানি তাঁর দিকে ফিরিয়ে, তাঁরই চোখে চোখ রেখে আনন্দরস পান করিতে থাক, দুঃখ বিষাদ ইত্যাদি যাহা কিছু সামনে উপস্থিত হবে তার ভিতরেও দেবতার স্নেহমাখা রূপ দেখিতে চেষ্টা করিও। মনে রেখো, একমাত্র গুরু ছাড়া, ভগবান ছাড়া আর কোথাও কিছু নাই। যা কিছু দেখিতেছ, যা কিছু শুনিতেছ সে সমস্তই গুরু, ব্রহ্ম, ভগবান।

"চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্বাং।"

দেখ অন্তরের মনরূপ তিনি, চিন্তারূপ তিনি, প্রাণরূপ তিনি। আবার বাহিরে বিশ্বরূপ তিনি, চন্দ্ররূপ তিনি, সূর্য্যরূপ তিনি, সরল বিশ্বাসে, অকপট হৃদয়ে তাকাও দেখি একবার তাঁর দিকে— ঐ দেখ। যিনি তোমার একান্ত আশ্রয়, সেই তিনি তোমার অন্তরে বাহিরে কত অপরিসীম মধু নিয়ে নিত্য প্রতিভাত রহিয়াছেন। শুধু দেখ ভগবানকে, ডুবে থাক ভগবানে, ঢেলে দাও নিজেকে ভগবানে, ডুবে যাও ভগবৎ রসে। শিবমস্তু। তোমার সর্দ্দিজ্বর হইয়াছে লিখিয়াছ, কেমন আছ জানাইও। মাথা নিচু

করিয়া লিখিতে কষ্ট হচ্ছে বলিয়া অপরকে দিয়া লিখাইলাম। এ শরীর যাহা হয় একপ্রকার আছে। ওখানে যাওয়া সম্বন্ধে কবে হবে বলিতে পারি না। দেখি— যদি— মনে হয়—তবে একবার, যবে হোক, যেতে চেষ্টা করিব। পত্রোত্তরে তোমাদের কুশল দানে সুখী করিও। তোমার পিসিমা, শৈলমা, আলোক, ছবি, ভবানী প্রভৃতি কেমন আছে? সকলকে আশীর্ব্বাদ দিও। পত্রোত্তরে সুখী করিও। আনন্দে থাক। ইতি—

স্বামী বিশ্বজিৎ

(১৮)

ওঁ

মধুপুর

জুন, ১৯৪৫

পরম স্নেহাশীর্ব্বাদ বিশেষ :—

শ্রীমতী……মা!

স্নেহময় দেবতার স্নেহাশীর্ব্বাদ তোমার শিরে নিয়ত বর্ষিত হউক। পত্রপাঠে সবিশেষ জানিয়া বড় আনন্দ হইল।

এখানের অবস্থাও সেইরূপ; কি আর বলিব মহামুস্কিল। এ আমি এক বিপদেই পড়েছি। কিছুই ভাল লাগে না। কোন দিন সব ছেড়ে টেরে দিয়ে একদিকে স'রে প'ড়ব। গয়ার পত্র পেয়েছি। যোগেশ্বরী তোমার সংবাদ চাহিয়াছে। আমি আহার, নিদ্রার কষ্ট মোটেই ধরি না, কারণ, ওসব গা সওয়া হ'য়ে গেছে। তিনি যখন যেরূপ অবস্থার ভিতর রাখিবেন, সেইরূপ থাকিতে অভ্যাস অনেকদিন থেকেই হইয়াছে। সে কথা ত নয়। আমি তক্তপোষখানি অপরদিকে ঘুরিয়ে নিয়েছি। ঘরে জিনিষপত্র যেভাবে সাজান ছিল, সব ওলট-পালট ক'রে আর একরকম ক'রে গুছিয়েছি। ওভাবে আর ভাল লাগছিল না। কি জানি কেন? উৎসবের আয়োজন ছেলেরা সব খুব প্রাণ দিয়ে করিতেছে। …এসেছে। আর একটি ছেলেও এসেছে। সাতগেছে থেকে আরও পর আসবে সংবাদ পাইলাম। উমা আসিতেছে। বোধ-

হয় আজকালের মধ্যেই সব এসে পড়বে। কলিকাতা থেকে উদয় ও সরযূ আসিবে বলিয়া সংবাদ দিয়াছে। দেখা যাক কি হয়! বিরাট ফ্যাসাদ বেধে গেছে। এ বড় গোলমাল, আমার ভাল লাগছে না। একটু একা একা বসে বসে চিন্তা করিতে ভাল লাগে, কিন্তু পাজিগুলো বড় গোলমাল করে।

যে আনন্দস্রোত তোমাদের প্রত্যেকের হৃদয়-নদীতে প্রবাহিত হচ্ছে, সেই আনন্দের দিকে যখন চোখ পড়ে, তখন জগতের সমস্ত দুঃখ কষ্টের কথা ভুলে যেতে হয়। তোমাদের চক্ষুর দৃষ্টি যাহাতে, তোমাদেরই অন্তরস্থ ঐ অপরিসীম আনন্দের দিকে আকৃষ্ট হয়, তার জন্যই—তোমাদের সেবার জন্যই শ্রীভগবান এবার আমাকে পাঠিয়েছেন; যাতে তোমরা সেই আনন্দস্রোতে ভেসে ভেসে সীমাহীন, অভাবহীন, চঞ্চলতাহীন, আনন্দসমুদ্রে উপনীত হয়ে, তোমরা তোমাদের নিজেদের আনন্দময় স্বরূপ বুঝে নিতে পার, দেখে নিতে পার, ভোগ করিতে পার, দুঃখ, যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্ত হ'তে পার, তার জন্য শ্রীভগবান এবার আমায় এ জগতে পাঠিয়েছেন।

যাক্ এ সব কথা আর জানবার দরকার নাই। কর মা—তপস্যার দ্বারা সত্ব শুদ্ধ করিয়া দিব্য স্বরূপের অমৃতরসাস্বাদ কর। ধ্যান ধারণাই যেন জীবনের প্রধান ও প্রথম কার্য্য হয়। একটিবার মা, মাত্র একটীবারও শ্রীভগবানের হৃদয়ে আপন প্রাণটাকে সংলগ্ন করো। জীবনের যেটী সনাতন বস্তু যেটী শাশ্বত জাগরণ সেইটাকে দেখে নাও, ভোগ করে নাও। জীবন নবীন হবে, জাগ্রত

হবে, আপনার দিব্যধামকে আপনি চিনতে পারবে। শিবমস্তু।

ছবি চুঁচড়া থেকে তোমাকে পত্র দিয়াছে, পাঠাইলাম। আমাকেও লিখেছে এই সঙ্গে পাঠালাম। তুমি দেখে আমাকে পাঠিয়ে দিও। আমি বেশ কড়া করে জবাব দেব। আমার মনে হয় তোমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার এ এক নূতন ব্যবস্থা। যাক। তোমার পিসিমাও পত্র দিয়াছেন।

এ শরীর কিরূপ আছে বা থাকা স্বাভাবিক—জানি না– তবে চলেছি এক রকম করে।

তোমাদের কুশল দিও। সুধীর বাবু কেমন আছেন? তিনি আমার কথা বলেন কি? তোমার দিদির সংবাদ ভাল ত? তাঁর শ্বশুরের আবার ব্যথা ধরিতেছে জানিয়া দুঃখিত হইলাম, ঠাকুর তাঁকে সুস্থ করুন।

আলোকের পত্র পেলাম। সকলকে শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ দিও। পত্রপাঠ পত্র দিও।

খেমুমা কেমন আছে? তাকে আশীর্ব্বাদ দিও। ইতি—

স্বামী বিশ্বজিৎ

পুঃ

চণ্ডী ও কিঙ্কর তোমার চিঠি শুনে হিংসা করছে। বলছে এরূপ চিঠি আমাদের ভাগ্যে জোটেনি। –

(১৯)

ওঁ

মধুপুর
২৯।৫।৪৫

পরমকল্যাণীয়াষু,

মা আমার, স্নেহঘন অন্তর্দেবতার স্নেহদৃষ্টিতে ধীরে ধীরে তোমার জীবনকে সেই নিত্য-বস্তুর নিকট পৌঁছাইয়া দিক ইহাই প্রার্থনা। তোমার পত্রখানি পাঠে পরম পরিতোষলাভ করিলাম।

সত্যই মা, যদি তাঁর চরণে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করতে পার তবে তাঁর কৃপায় সকলই সম্ভব হবে। তরণীর যেমন কর্ণধার আবশ্যক তেমনি মানবের সংসার-সমুদ্রে ভ্রাম্যমান জীবন-তরণীর কাণ্ডারী চাই। সদ্‌গুরুই ভক্তের জীবন-তরণীর কাণ্ডারী। যুগে যুগে জীব-দুঃখ-বিগলিত-হৃদয় সেই পুরুষোত্তম পুরাণ পুরুষ সদ্‌গুরুরূপে মানবদেহ ধারণপূর্ব্বক শরণাগত, আশ্রিত সেবকগণকে মুক্তির পথে পরিচালনাপূর্ব্বক এই মায়ামোহসঙ্কুল সংসারের ত্রিতাপ জ্বালার নির্ব্বাণ করেন। যুগে যুগে যখনই বিশ্বমানবের প্রাণে শান্তির পিপাসা, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, তীব্র ব্যাকুলতায় মূর্ত্তিমতী হয়ে উঠেছে তখনই শ্রীভগবান শ্রীসদ্‌গুরুরূপে মানবদেহ ধারণপূর্ব্বক জীবের বুকে শান্তিবারি সেচন করতে ছুটে এসেছেন। কাজেই তাঁর কৃপার ত কম কোনদিনই

নাই। সর্ব্বদা সমভাবে কৃপাবিন্দুপাতে তোমাদের কৃপাসিঞ্চিত করছে। বরঞ্চ কৃপণতা আমাদের—তাঁকে যথাসর্ব্বস্ব দিতে—আত্মসমর্পণ করতে। মুখে আমরা বলি—হে ভগবান আমার যা কিছু সব তোমায় অর্পণ করলেম। কিন্তু কার্য্যে ঠিক তা পারি না। তাই বলি মা, সত্যই যদি আমরা তাঁর চরণে শরণ নেওয়ার মত নিতে পারি তবে সকল আশাই তাঁহার কৃপায় পরিতৃপ্ত হবে।

সর্ব্বদাই জীবের বুকে এই বুদ্ধি থাকা দরকার যে "আমি তাঁহারই দাস, তাঁহারই সেবকমাত্র", তাহলেই আর দম্ভ আসবে না; ফলাকাঙ্খার জন্য মনকে ক্ষণিকের জন্য উত্তেজিত ও অবসন্ন করবে না, ও কোনপ্রকার স্বার্থপরতার কলুষ সঞ্চিত করবে না। এমনভাবে সংসারের যাবতীয় সংকল্প ভাবনা চিন্তা বাক্য কার্য্য করিতে হইবে যে, সমস্ত কিছুর অন্তরে বাহিরে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান অনুভবপূর্ব্বক তাঁর তৃপ্তি এবং প্রীতির জন্য তাঁকে নিবেদন ক'রে দৈনন্দিন সংসারের খুটীনাটীর সমস্ত কিছুর অনুষ্ঠান করিতে হইবে। মূল কথা, দৃষ্টি যেন অনুক্ষণ ভগবানে থাকে। ভগবৎ-স্মৃতি হারাইয়া নিজেই যেন কর্ত্তা সাজিয়া না বসি। বিশ্বের অনুপরমাণুটী পর্য্যন্ত সেই কৃপাময়ের দান। অতএব, সব কিছুর ভিতর দিয়াই তাঁহার কৃপা অনুভব করতে হবে। তিনি যে বিশ্বের যাবতীয় বস্তু, ব্যক্তি, বিষয়ের অন্তরে বাহিরে অনুস্যূত পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন, এই স্মৃতি হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করতে হবে। তখন দেখবে, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম এক হয়ে গেছে, মনপ্রাণ এক অজানা নির্ম্মল প্রেমানন্দে ভরপুর হ'য়ে গেছে।

মা, তোমার জীবন যে একদিন সেই কৃপাময়ের কৃপার পরশে স্বার্থক ও মধুময় হয়ে উঠবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কারণ যাহার কাছে তোমার জীবন তরণীর হালটী ছাড়িয়া দিয়াছ তিনি যে খুব সুদক্ষ নাবিক তাহাতে আর সন্দেহ নাই, এবং একদিন তোমায় তিনি কূলে পৌঁছাইয়া দিবেনই। জ্ঞানহীন শক্তি-সাধনহীন অসহায় শিশুর মত সরল বিশ্বাসে প্রাণের বেদনাঘন ব্যাকুলতা নিয়ে তাঁকে দিবানিশি ডাকতে থাক, তোমার নিজের বলতে যা কিছু আছে সব কিছু নিঃশেষে নিংড়ে দিয়ে তাঁর পবিত্র শ্রীচরণে অঞ্জলি দিতে দিতে বল--

"তুমি দক্ষিণা লও আমারে—
দিবার আমার কিছু নাহি ওগো
......শুধু আমি আছি আমার ভাণ্ডারে।"

শিবমস্তু।

তোমার প্রেরিত জিনিষগুলি এখনও পাই নাই। তোমার ছোট ছেলে পাশ করিয়াছে শুনিয়া বড় আনন্দিত হলাম। বাণীর ও তোমার অসুখের কথা জেনে বড়ই চিন্তিত রহিলাম। আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্বজিৎ।

(২০)

ওঁ

পাটনা

৩০।৬।৪৫

পরম স্নেহভাজনেষু—

করুণাময় শ্রীগুরুর অমোঘ কৃপা ও আশীর্ব্বাদ তোমার জীবনকে সঠিক পথে চালিত করুক। তোমার পত্রপাঠে পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। আমি মাঝে কয়েকদিনের জন্য দেওঘর আসিয়াছিলাম (অম্বুবাচীর পূর্ব্বে) এবং গ্রহণের পরদিনই মধুপুর আশ্রমে ফিরে যাই। সেখানে গিয়ে তোমার পত্রখানি পাইয়াছি। পত্রখানি পড়িয়া আমার খুব আনন্দ হইল।

তোমার আর্থিক ও পারিবারিক অবস্থা জেনে চিন্তিত ও দুঃখিত হইলাম। যাক্ তুমি কিছু চিন্তা করিও না। তোমার চিন্তাগুলি আমায় দিয়ে তুমি তাঁর চিন্তা নিয়ে থাক। মঙ্গলময় শ্রীগুরু অবশ্যই তোমার মঙ্গলবিধান করিবেন। জেনো ভাই, এ সংসার কর্ম্মক্ষেত্র। প্রতি জীবই এ সংসারে আসিয়া থাকে কর্ম্ম করিবার জন্য। একটা জীবন কতকগুলি ঘটনার সমষ্টি মাত্র। তোমার জীবনে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে বা ঘটিবে সব কিছুই আগে থাকতে ব্যবস্থা হইয়া আছে (Pre-arranged)। মাত্র সময়ের অপেক্ষায় থাকে। সময় আসিলে হেতু সংযোগে কর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে। এগুলি প্রায়শঃ ক্ষেত্রে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফল স্বরূপই হইয়া থাকে। তোমার সুখ বা দুঃখের হেতু কোনও জীব নহে। ইহার

হেতু মাত্র তোমার কর্ম্ম। তবে যদি কোনও বস্তু বা জীবকে তোমার দুঃখের হেতু বলিয়া স্বাভাবিক দৃষ্টিতে মনে হয়—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উহারা উপলক্ষ্য মাত্র; হেতু নহে। হেতু তোমার কর্ম্ম। তুমি যে কর্ম্মের জন্য সৃষ্ট হইয়াছ অথবা স্রষ্টার এই বিশাল সৃষ্টির মধ্যে তোমাকে দিয়ে যে যে কর্ম্মগুলি করিয়ে নেবার জন্য তিনি তোমার ঐ দেহ, মন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তোমাকে করিতেই হইবে। এখন দেখিতে হইবে যে এই বিশাল সৃষ্টি তাঁর, তিনিই মালিক। সৃষ্টবস্তু সবই তাঁর, তিনি যাহাকে যেভাবে রেখে, যেরূপ কর্ম্ম করাইবার ইচ্ছা করেন, তাহাকে সেইভাবেই রাখিয়া থাকেন। এখন দেখিতে হইবে যে কতকগুলি জীবের (স্ত্রী-পুত্রাদি) সেবার ভার তোমার উপর তিনি দিয়াছেন; যাহাদিগকে তুমি ভ্রমবশতঃ তোমার আপন বলিয়া জানিয়া থাক। কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা তোমার কেহই নহে। তোমাকে উপলক্ষ্য ক'রে, তিনি তাঁর সৃষ্টিকার্য্য চালাইতেছেন। অতএব তাহাদের সুখ বা দুঃখের হেতু তুমি কোন দিনই নও বা হ'তে পার না। প্রত্যেকেই নিজ কর্ম্মানুযায়ী সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। তোমাকে মাত্র লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে তোমার উপর যে সেবা-কার্য্যের ভার তিনি দিয়াছেন, তাহা তুমি যথাযথভাবে সম্পন্ন করিতেছ। এখন ব্যাপারটা কি হয় শোন। তোমাকে দিয়ে তিনি যে কার্য্য করাইবেন, তাঁর যে যে সৃষ্টবস্তুর সেবা করাইবেন, তদনুযায়ী তোমার দেহ, মন, বুদ্ধি এবং ক্ষেত্রও তিনি দেন। ঠিক যেন অফিসের কাজ। মালিক তোমাকে দিয়ে যে কাজ করাইবেন,

সেইরূপ কর্ম্মক্ষেত্র, অধীনস্থ কর্ম্মচারী এবং কাগজ কলম দোয়াত প্রভৃতি সবই দিয়া থাকেন, ইহাও ঠিক সেইরূপ। তুমি কোনও দিনই দেহ নও, মন নও, বুদ্ধি নও। যেগুলিকে (অর্থাৎ দেহ, মন, বুদ্ধি) তুমি বলিয়া বুঝিয়া থাক, উহা ভ্রম মাত্র। তুমি অতটুকু কোনও দিনই নও। ঐগুলি তোমার কর্ম্মের সহায়তার জন্য তোমাকে দেওয়া হইয়া থাকে। কাজেই এই বুদ্ধি নিয়ে যদি কাজ করা যায়, তবে তোমার যে অবস্থাই হউক না কেন তাহাতে দুঃখ করিবার বা চিন্তা করিবার কোনও কারণই কোনও দিন থাকিতে পারে না। কারণ, তোমার জন্য যখন যে অবস্থার প্রয়োজন হইতেছে, তাহাই তিনি তোমার সামনে নিয়ে এসে হাজির করিতেছেন। সকল ব্যবস্থাই তিনি করিতেছেন। তোমাকে দুঃখে রাখা প্রয়োজন যত দিন বোধ করেন, ততদিন দুঃখে রাখেন, আবার সুখে রাখার প্রয়োজন বোধে সুখে রাখেন। এইরূপ বোধ নিয়ে থাকতে পারলে আর আসক্তি থাকিবে না। অবশ্য সবই সেই তিনি করিতেছেন। তোমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিছুই নাই এই বোধ ধরিয়া থাকিতে পারিলে সুখ বা দুঃখ তোমার কাছে সমজ্ঞান হইবে। যাক্ এ সমস্ত কথা।

তুমি যাহা যাহা করিতেছ সবই ঠিক হইতেছে। কারণ একটু পূর্ব্বেই বলেছি, তুমি কিছুই কর না, তোমার ভিতর যেরূপ প্রেরণা তিনি এনে দিচ্ছেন, তুমি সেইরূপ কার্য্যই করিতেছ। তিনি যখন যেরূপ প্রয়োজন, যাহাকে দিয়া যাহা করান প্রয়োজন, তাহাই করিতেছেন বা করিবেন।

আশ্রমে কিঙ্করের বাবা, মা এসেছে। তা'রাই উপস্থিত আশ্রমে আছে। আমি পাটনা এসেছি, সেখান থেকেই তোমাকে এই পত্র দিচ্ছি। আমি এই শুক্রবারে মধুপুরে ফিরিব। তুমি মধুপুরেই চিঠির উত্তর দিও।

আশা করি, শ্রীগুরু কৃপায় তোমার বিপর্য্যস্ত অবস্থা ক্রমেই তিরোহিত হচ্ছে। যখন তোমার খাওয়া দাওয়ার এত কষ্ট হচ্ছে তখন না হয় চারু মাকে নিয়ে যাও। আর সত্যই, দু' জায়গার খরচ চালান এই বাজারে মুস্কিল। অবশ্য তোমার পক্ষে মুস্কিল কিছু হবে বলে মনে হয় না। কারণ গুরু তোমার সহায়, তিনি তোমাকে ঠিকই চালিয়ে নেবেন। কিছু ভেবো না। আর কি লিখিব। তোমার সর্ব্ববিধ সংবাদ পত্রপাঠ দিও। তোমার শরীর কেমন আছে? এ শরীরটা বিশেষ ভাল নাই। বৈদ্যনাথের সংবাদ ভালই। পত্রপাঠ পত্র দিও। আনন্দে থাক। ইতি—

স্বামী বিশ্বজিৎ।

(২১)

ওঁ

আশ্রম
২৬।৩।৪৭

কল্যাণীয়াষু—

মা, স্নেহময় শ্রীগুরুর মঙ্গলাশীষ তোমাদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করুক, ইহাই প্রার্থনা।

মা, গতকল্য তোমার পত্রে তোমার স্নেহের ভাইটির পরলোক গমনের সংবাদে মর্ম্মাহত হইলাম। এইরূপ একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তোমার মা ও দিদিমা যে মুহ্যমান হইয়া পড়িবেন ইহাতে আর সন্দেহ কি? ইহা খুবই স্বাভাবিক।

মা আমার, কি আর লিখিব? এ শোকে সান্ত্বনা দিবার মত ভাষা আজ পর্য্যন্ত সৃজন হয় নাই। একমাত্র কালই এই কালের দুঃখ হরণ করিবার সামর্থ্য রাখে। কাল শব্দে এখানে আমি সময় বলিতেছি। যে কালকে আশ্রয় ক'রে জীব এ জগতে কর্ম্ম করিতে আসে, সেই কালকে আশ্রয় ক'রেই সে থাকে এবং সেই কালই আবার তাকে নিয়ে যায় এবং সেই কালই তার প্রিয়জনকে কিছু শান্তি দেয়। মা, এ শোকে সান্ত্বনা দিবার মত কি ভাষা আছে? আমাদের চিত্ত তাহার জন্ম-জন্মান্তরীন অভ্যাসের ফলে স্থূলের প্রতি এতই আসক্ত যে, কোনও ভাষা,

কোনও সান্ত্বনাবাক্যই এ অবস্থায় তাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে না। যাক্—

মা, এই আসক্তিই আমাদের যত দুঃখের মূল। একটু ভেবে দেখ মা, ঐ শরীরটার জন্য আমরা কোনও দিনই দুঃখ করি না, আমরা দুঃখ করি আমাদের ঐ স্থূল বোধের অভাব হেতু। যাক্ এ অন্য কথা—

এখন শোন, তোমরা যাহার অভাবে দুঃখ করিতেছ, সে তোমাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিল, কেমন? আচ্ছা যাকে আমরা ভালবাসি, আমরা চাই, যেন সে সুখে থাকে, শান্তিতে থাকে, কেমন? মা, বলিতে পার এ জগতে এমন কেহ আছে যে সুখে বা শান্তিতে আছে? আমরা আপাতমধুর অবস্থার দাস। পরে কি হবে এরূপ চিন্তা আমাদের থাকে না। ঐ আপাত-সুখকর অবস্থাটা পেয়েই আমরা মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ি। এই দেখ—আমরা ইহা যতই সত্যরূপে জানি যে এ জগতে কেহই চিরকাল থাকিবার জন্য আসে নাই, সকলকেই যেতে হবে এবং সে যাওয়া যে কখন হবে তা কেহ বলিতে পারে না তত্রাপি ঐ অল্পদিনের জন্যও আমরা আসক্ত হইয়া পড়ি। ফলে ঐরূপ দুঃখ পাইতে থাকি। বিবাহের পূর্ব্বে ছেলে ও মেয়ে অনেক সুখ স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পরেই সে বুঝে যে পূর্ব্বের চিন্তা তাহার স্বপ্ন "আকাশ কুসুমবৎ।" দেখ আমরা এই মোহ বা অজ্ঞানতায় এতই আচ্ছন্ন যে, পিতামাতা সংসারে প্রবেশ ক'রে অনন্ত দুঃখশোক ভোগ করিয়াও তাহার পুত্র কন্যাকে

ভালবেসে এই দুঃখের মালা পরাবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন। কাজেই ভেবে দেখ, আমাদের ভালবাসার দৌড় কতদূর? আমরা অপরের সুখশান্তির জন্য লালায়িত কোনও দিনই নই; নিজেরা সুখী হব এই চিন্তাতেই এই সব ব্যবস্থার জন্য ব্যস্ত হই এবং ইহার অভাবে দুঃখ করি। দেখ না, এই দুঃখময় জগতে কেহ কোনও দিনই শান্তি পায় না বা সুখী হয় না; একটা না একটা অশান্তি তার আছেই। একমাত্র যে সেই শান্তিময়ের চরণ আশ্রয় করিয়াছে, তাহারই এই তুচ্ছ জিনিষের জন্য মোহ অপসারিত হইয়াছে এবং সেই মাত্র শান্তিতে আছে।

"করতল ভিক্ষা—তরুতল বাস"—ইত্যাদি।

তাই বলি মা, যদি তোমরা তাকে যথার্থ ভালবাসিয়া থাক তবে তার জন্য শোক না ক'রে সে যাহাতে শান্তিতে থাকে সে-জন্য সেই শান্তিময়ের চরণে প্রার্থনা করা উচিত।

মাগো! যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাই হইয়াছে। প্রত্যেককেই এ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে ইহা ত আমরা জানি তবে যারা একদিন নিশ্চয় ঘটিত বা ঘটিবে তাহাই ঘটিয়াছে। অতএব তার জন্য দুঃখ করিয়া কি লাভ? সে ভাল ছিল, পবিত্র ছিল, এ জগতের ধূলিকাদা লাগিবার আগে, দুঃখ কষ্ট ভোগ করিবার আগেই সে শান্তিময়ের চরণে আশ্রয় নিল। মা, সে ত কোথাও যায় নাই, সে চিরকাল যেখানে ছিল, আজও ঠিক সেইখানেই আছে এবং চিরকাল থাকিবে। মাত্র কয়েকদিন, কয়েকটী কর্ম্মের

জন্য সে একটা শরীর গ্রহণ করিয়াছিল এবং কর্ম্মান্তে সে অপ্রয়োজনীয় শরীর পরিত্যাগ করিয়াছে। অতএব মা, ইহা সত্যজ্ঞানে জানিয়া তোমরা শোক ত্যাগ করিবে। এ সম্বন্ধে আর একটী বিশেষ কথা শোন—ঐ যে জীবাত্মা,যে এতদিন ঐ শরীরটিকে আশ্রয় করিয়া তোমাদের একজন পরম প্রিয় আত্মীয় ছিল, সে আজ যেখানে আছে, সেখান থেকে সে তোমাদের প্রত্যেকটী কার্য্য দেখিতেছে, প্রত্যেকটী কথা শুনিতেছে, এখন তোমাদের মত তাহারও তোমাদের প্রতি, এতদিনকার ঘনিষ্ঠ সঙ্গের ফলে একটা মোহ জন্মিয়াছিল। এখন তোমরা যদি তাহার জন্য কান্নাকাটি কর, তাহা হইলে সেখান থেকে তার একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা হবে। সে না পারবে তোমাদের কিছু বলিতে, তোমাদের কিছু করিতে। মাত্র কষ্টই ভোগ করিবে। অতএব. ইহা জানিয়া বুঝিয়াও তাহার জন্য শোক করিয়া তাহাকে কষ্ট দেওয়া কি উচিত?

তাই বলি, তার জন্য শোক না ক'রে শ্রীভগবানের কাছে তার জন্য কাতর প্রার্থনা করা উচিত। তোমার মা ও দিদিমাকে যদি একবার এখানে নিয়ে আসতে পার তবে আমার মনে হয়, তাঁদের অনেক শান্তি হবে। এবং তুমি তাঁদের এইরূপ সেবার দ্বারা তাঁদের অনেক উপকার করিবে। ঐস্থানে থাকিয়া তার স্মৃতিগুলি সর্ব্বদা তাঁদের চক্ষে ফুটিবে, এবং ঐ জাতীয় চিন্তায় তাঁদের চিত্ত সর্ব্বদা মগ্ন থাকিবে। কিন্তু এই স্থানপরিবর্ত্তনের ফলে মনেরও পরিবর্ত্তন হবে এবং এইরূপ একটা পবিত্র

সঙ্গের ফলে মনেরও অনেক পবিত্রভাব ফুটে উঠিবে এবং আমার বিশ্বাস, তাঁহারা বহুল পরিমাণে শান্তি পাবেন।

সত্য কি এসেছিল? তুমি উঁহাদের যত শীঘ্র সম্ভব নিয়ে আসতে চেষ্টা করিও। ইতি—

বিশ্বজিৎ।

(২২)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম।
জসিডি
১৯৪৭

স্নেহাস্পদেষু—

বাবা……,

শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদ লও। তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত জানিলাম। বুঝিলাম তুমি তোমার চাকুরীর জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছ। এত চিন্তা ও উদ্বেগের কোন কারণ নাই। তিনি মঙ্গলময়। যে ঘটনাই ঘটুক না কেন বুঝিতে হইবে তাহা মঙ্গলের জন্যই ঘটিয়াছে। তোমার অপ্রীতিকর হইলেই যে উহা অমঙ্গল হইল এবং প্রীতিকর হইলেই মঙ্গল হইল ইহা বোঝা ঠিক নয়। তিনি যখন তোমার প্রভু নিয়ন্তা, সুখ দুঃখের ভোক্তা তখন নিশ্চিন্তমনে তাঁর মুখের দিকে তাকাইয়া থাক এবং দেখ কেমন-ভাবে তিনি সুখ দুঃখের বেশ লইয়া তোমায় তাঁর শান্তিময় ক্রোড়ে লইয়া যাইতেছেন, সংসারের নানাবিধ ঘটনার সম্বন্ধ ও তাৎপর্য্য তোমায় বুঝাইয়া দিতেছেন। সর্ব্বাবস্থায় স্থির থাকিয়া তাঁকে ডাকাই জীবের প্রকৃত কর্ত্তব্য।

পত্রোত্তরে তোমার চাকুরীর কি হইল জানাইও। তোমাদের কুশল সংবাদ দিও। আনন্দে থাক।

তোমার চাকুরীতে যাহাতে বিশেষ কোনও গোলমাল না হয় সে বিষয় চেষ্টা করিব। ইতি—

বিশ্বজিৎ।

(২৩)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
জসিডি
৬।৬।৪৭

স্নেহের—

প্রিয়তম দেবতার স্নেহ ও করুণায় তোমার হৃদয় ভরিয়া উঠুক। সেই চির উজ্জ্বল, শ্যাম স্নিগ্ধজ্যোতির ছায়া তোমার চলার পথ আনন্দময়, মধুময়, আলোকময় করিয়া তুলুক, ইহাই প্রার্থনা।

তোমার ছোট্ট চিঠিখানি প'ড়ে, আজ আমার বুক আনন্দে ভ'রে উঠেছে। শোন বাবা, প্রতি জীবহৃদয়ে যে সদ্‌বুদ্ধি আছে তাহাকেই শাস্ত্র শ্রীগুরু বলেন। এই সদবুদ্ধি অজ্ঞানান্ধ জীবকে জ্ঞান দেয়, মোহাচ্ছন্ন জীবকে মোহমুক্ত করে, বুদ্ধির জড়তা নষ্ট করে। এই বুদ্ধি সৎ হয় তখনই, যখনই জীবহৃদয় গুরুভাবে পরিপূর্ণ হ'য়ে যায়। জীব যখন দেহধারী শ্রীগুরু মূর্ত্তিকেই জীবনের চরম এবং পরম লক্ষ্য বলিয়া মেনে নেয়, তাহার আদর্শ বলিয়াই গ্রহণ করে, তাঁর প্রেমে আত্মহারা হইতে পারে, তখনই জীবের বুদ্ধি সদ্‌ভাবাপন্ন হইয়া যায় এবং করুণাময় শ্রীগুরু ভগবান তখনই জীবহৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থান করিয়া তাহাকে জগতের প্রতি কর্ম্মে, প্রতি চিন্তাধারায়, অবস্থা হ'তে অবস্থান্তরে চালিত করে। জীবনের অন্ধকার বিদূরিত ক'রে প্রতিটি স্তর

উদ্ভাসিত ক'রে দেয়, সত্যে প্রতিষ্ঠিত করে, বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে নিয়ে যায়।

স্নেহের দুলাল আমার, আজ আমার এই ভেবেই আনন্দ হচ্ছে যে গুরুতত্ত্ব তোমার হৃদয়ে পরিস্কাররূপে ফুটে উঠেছে। হাজারের মধ্যে একজনও যদি গুরুকে চিনতে পারে, গুরুস্বরূপ অবগত হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার আনন্দ হউক বা না হউক, সেই দেহধারী শ্রীগুরুমূর্ত্তির আনন্দের সীমা থাকে না। তাঁর গুরুগিরি সার্থক হয়। আমি যদি সত্যই তোমার গুরু হই তাহা হইলে সেই গুরুত্বের দাবী লইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি, গুরুতত্ত্ব তোমার বুকে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠুক। তুমি গুরু হও, গুরু তুমি হউক।

তুমি লিখেছ এবার আশ্রমে এসে তুমি আনন্দ পেয়েছ। এই আনন্দটি দ্বিবিধ উপায়ে লাভ হইতে পারে। প্রথম আনন্দ পাইবার কারণ, যে স্থানে তার প্রিয়তম থাকেন তিনি যদি প্রকৃতই তার প্রিয়তম হন, তাহা হইলে সে স্থান কদর্য্য হইলেও তার কাছে স্বর্গ। শাস্ত্রের একটী প্রমাণ আছে—"প্রিয়ঃ প্রিয়তমদেবঃ নিত্যঃ. আনন্দকারকঃ।" প্রিয়ত্ব বুদ্ধি যেখানে সেখানে কোন বিচার থাকে না। বুদ্ধি সেখানে চিন্তা করিতে গিয়া বিমূঢ় হইয়া যায়, বাক্য সেখানে মূক হইয়া যায়, দৃষ্টি সেখানে একীবদ্ধ হইয়া যায়, মন লক্ষ্যবদ্ধ হইয়া পূর্ণানন্দের সৃজন করে, ইহাই আমার জানা আছে। দ্বিতীয় কারণ:— প্রতি জীবেরই আশ্রম সম্বন্ধীয়, আচার্য্য সম্বন্ধীয় কিছু না কিছু

ধারণা থাকে। অবশ্য এ ধারণা পাগলামী ধরণের ধারণা নয়। যে ধারণা সর্ব্ববাদীসম্মত, যুক্তিসঙ্গত এবং শাস্ত্রসিদ্ধ তাহাই আদর্শ বা ধারণা বলিয়া যুক্তিসিদ্ধ। এখন সে যদি আশ্রমে তদনুরূপ কিছু পায় তাহা হইলেই তাহার আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক, ইহাই দ্বিতীয় কারণ।

আজ এইস্থানে তোমায় ২।১টী কথা বলিতে চাই। কেননা আজ আমি তোমাকে আমার উপযুক্ত সন্তান বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। পিতা হিসাবে, পুত্র যদি উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে পিতার পুত্রের সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করা শাস্ত্রসিদ্ধ, "প্রাপ্তে তু ষোড়শবর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।" গুরু হিসাবে শিষ্য যদি উপযুক্ত হয়, অন্তরঙ্গ হয়, তাহা হইলে সেই গুরু, সেই শিষ্যের কাছে তাঁর হৃদয় খুলিয়া দেন অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছা তাহার কাছে সরলভাবেই ব্যক্ত করেন। এই যুক্তি মাত্র পুরুষে প্রযোজ্য নয়, স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই প্রযোজ্য। আজ আমি উভয় দাবী লইয়াই তোমার কাছে একটী কথা ব্যক্ত করিতে চাই। ইহা আমি আজ পর্য্যন্ত কোথাও করি নাই। আমার প্রাণে একটী লুকানো ছবি ছিল। ইহা ছিল বলিলাম কেন, পরে বলিব। আমার আশা ছিল আশ্রম যদি করিতে হয় তাহা হইলে তাহা এমনই হইবে যাহা ভারতের তথা জগতের আদর্শস্থানীয় হইবে। এই আদর্শ কিনিতে পারা যায় একমাত্র প্রেমের দ্বারা অন্য কিছুর দ্বারাই নয়। আমার বড় সাধ ছিল, এমনই একটি স্থান হইবে যেখানে পরস্পরের মধ্যে রাগ ও বিদ্বেষবুদ্ধি থাকিবে না, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, অভিমান,

অহঙ্কার ইত্যাদি দরজার বাহিরে অবস্থান করিবে। প্রেম হবে সেস্থানের লক্ষ্য, অনুরাগ হবে সেস্থানের মন্ত্র, পরস্পর সৌহৃদ্য হবে সেস্থানের একমাত্র আদর্শ। কিন্তু বোধ হয়, আমার সে সুখ-স্বপ্নও ভেঙ্গে যেতে বসেছে। সে মনোবৃত্তি কই? সন্তানদের মধ্যে আমি তাহা দেখিতে পাই না। তাহাদের মধ্যে এখনও হিংসা বিদ্বেষ আছে, তাহারা এখনও একজন একজনকে প্রাণ খুলে আলিঙ্গন করতে পারে না, তাহারা এখনও আচার্য্যকে নিজের লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। আজ আমার মনে পড়ে, ছেলেবেলায় ননীবাবুর কুরুক্ষেত্রের একটী স্থান পড়িতে বড় ভাল লাগিত, তাই পড়িতাম। ভগবান্ কৃষ্ণ গুরু ব্যাসকে বলিতেছেন—"গুরুদেব, বৃন্দাবনে গোচারণে বসে, একাকী রচেছিলাম—সুখ-স্বপ্ন এক। গড়িব এমন বিশ্ব—প্রেম যাহে হবে মূল আদর্শ তাহার॥" ঠিক এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য আজ পর্য্যন্ত কত লড়াই করিতেছি কত বেদনা, কত লাঞ্ছনা নীরবে হাসিমুখে বহন করিতেছি, কিন্তু হায়! বুঝি আমার সে স্বপ্ন সিদ্ধ হইবে না। যাক্, যদি তোমাদের মধ্যে একটী ছেলেও আনন্দ পেয়ে থাকে, যদি একজনেরও বুকে আমি আচার্য্য বলে ফুটে উঠে থাকি, তাহলে আমি এ যাত্রা সার্থক ব'লে মেনে নিব। এইরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের মত আমারও বলিতে ইচ্ছা হয়, "প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে বাণ না ধরিব। বাণ না ধরিলে আজি পাণ্ডবে হারাব।" ইহার অর্থ খুলিয়া বলিব না। গুরুকৃপায় তোমার অন্তরে ইহা পরিস্ফুট হইয়া উঠুক। শ্রীরামচন্দ্রের মত

আজ আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি—"গুরুদেব, ক্লান্ত আমি জীবন সংগ্রামে। বিশ্রাম লভিতে চাই, তাহাও দিবে না মোরে, গুরু-ভক্ত দেশবাসিগণ॥'

যাক্ আজ এই পর্য্যন্ত থাক। উৎসবান্তে আশ্রম হইতে তোমার চলিয়া যাইবার পর আশ্রমে আর এক উৎসব লাগিল। এ উৎসব রোগের উৎসব। প্রথমেই শ্রীমান বৈদ্যনাথ, তৎপর ডাক্তার সত্যচরণের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, তৎপর শ্রীমতী অপরাজিতা মা। এখনও যুদ্ধ থামে নাই, চলিতেছে। তবে আমি এখনও পড়ি নাই, জানি না এ বুক আর কত সহিবে। আবার সেই নবীনবাবুর কথাই মনে পড়িতেছে। অভিমন্যুবধান্তে অভিমন্যুসারথি অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—'হে পার্থ, তব সারথির ক্ষত বিক্ষত শরীর, কিন্তু পুত্র সারথির অক্ষত শরীর।" ইহার অর্থও বলিব না, বুঝিয়া লইবে। শ্রীমতী অপরাজিতা মা এখনও শয্যাশায়ী, জানি না তিনি উঠিবেন কি না। শ্রীমতী রাণুর বিবাহ সম্বন্ধে আমি চিন্তা করিতেছি। পরে তোমায় জানাইব। তপন রতনের কোষ্ঠী অনুযায়ী বয়স লিখিয়া পাঠাইও। তাহাদের উপনয়নের ব্যবস্থা শীঘ্রই করিতে হইবে। মা মৃণালিনী কেমন আছেন? তিনি গুরু-কৃপা লাভ করুন ইহাই প্রার্থনা। তাঁহাকে পত্র দিতে বলিও। আজ আর বৈষয়িক কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছে না। ৺গুরু পূর্ণিমার পূর্ব্বে তোমার আসার কথা তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই। অন্ততঃ একদিনের জন্যও আসিলে সুখী হইব। ইতি-

বিশ্বজিৎ

(২৪)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম।
জসিডি
১২।৬।৪৭

স্নেহের... !

আশীর্ব্বাদ লও। আজ সকালে তোমার পত্র পাইয়া সবিশেষ অবগত হইলাম। তুমি আমার পত্রগুলি পাইতেছ কি না কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি তোমার পূর্ব্বপত্র দুইটীর উত্তর যথাসময়ে দিয়াছি। সে পত্র পাইলে কি না, জানাইয়া সুখী করিও। শ্রীমতী বাসন্তী মায়ের সংবাদ জানিলাম। তিনি তোমাকে যে অনুযোগ দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কোন অপরাধ হইতে পারে না, কেন না স্ত্রী যদি স্বামীর বিরুদ্ধে কোনও কটূক্তি শ্রবণ করে, তাহা হইলে স্বামীর প্রতি প্রেমযুক্ত মনে যে বিক্ষোভ বা অভিমান উপস্থিত হয়, তাহা যথাযথ অধিকারী স্থানেই প্রকাশ হইয়া থাকে। যেমন ছেলেয় ছেলেয় যদি ঝগড়া হয়, মা তাঁহার নির্দ্দোষ পুত্রকেই শাসন করেন কারণ, তাঁহার পর-পুত্রের উপর কোনরূপ অধিকার নাই। তাঁহার শাসনের উদ্দেশ্য ইহাই হয়, যে তুমি তাহাকে মারামারি করিবার সুযোগ দিয়াছ কেন? সেইরূপ বাসন্তী মার তোমার প্রতি অনুযোগের ইহাই মর্ম্ম যে, তুমি এমন কাজ করিবে কেন যাহা দ্বারা অপরে

তোমাকে কোন কিছু বলিতে পারেন। অতএব, এ ক্ষেত্রে তাঁহার কোনই অপরাধ দিতেছি না। তোমার পিতামাতার সম্বন্ধে ইহাই বলিতে চাই, তাঁহারা সংসারী জীব, বৈষয়িকভাবাপন্ন, অসংখ্য সমস্যাপূর্ণ হৃদয়। পুত্রকে সাধারণতঃ দৃষ্ট জীবনযাত্রার পথ হইতে কিছু এদিক ওদিক দেখিলেই তাঁহারা ভীত হইয়া পড়েন। "বুঝি বা তাঁহাদের পুত্র বিবাগী হইয়া গেল।" অতএব সংসারী জীব সাধারণতঃ স্বার্থসংরক্ষণেই ব্যস্ত থাকেন এবং এই স্বার্থের বিন্দুমাত্র ক্ষতি সহ্য করিতে পারেন না। অনেক আশা করিয়া তাঁহারা পুত্রকে মানুষ করেন; এবং সেই পুত্রের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা রাখেন। সংস্কার-আবদ্ধ মন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না যে, এপথে আসিলে স্বার্থের হানির পরিবর্ত্তে অধিকতর স্বার্থের বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পুত্রসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইবার পরিবর্ত্তে আরও নিবিড়ভাবে তাঁহারা তাহাকে তাঁহাদের মধ্যে পাইয়া থাকেন। যাক্, এখন শোন, সংসারে এইরূপ তরঙ্গ নিত্য উঠিতেছে এবং উঠিবেই। বাধাবিঘ্ন উন্নতিকামীর সহায়ই হইয়া থাকে। পূর্ব্বাপর মনীষিগণের জীবন আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বহু লাঞ্ছনা, বহু গঞ্জনা, বহু বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগকে জীবনলাভ করিতে হইয়াছিল। আমার বিবেচনায়, বাধাবিঘ্ন চলার পথ অচল করিয়া দেয় না, সচল করিয়া রাখে।

একটী ক্ষুদ্র সংসার ভাল করিয়া গড়িয়া তুলিতে গেলে কর্ত্তাকে কত ঝঞ্ঝাবাত, কত বাধাবিঘ্ন, কত প্রতিকূল

ঘটনার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার কত সাধের একটা দুঃখের সৌধ গড়িয়া তুলিতে হয়। অতএব বাবা, দুঃখকে বরণ করিতে গিয়া যদি এত কষ্ট পাইতে হয় (দুঃখরূপী সুখ), অত বেগ পাইতে হয়, তাহা হইলে যাহা সুখ, যাহা শাশ্বত শান্তি তাহা পাইতে গেলে একটু বেগ পাইতে হইবেই, একটু ওলট-পালট করিবেই। অতএব শ্রীকৃষ্ণের মত আমিও বলিতে চাই গীতার সেই বাণী--

"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ"।

হতাশ হইও না, যত বাধা আসিবে, যত বড় উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া তোমার ঐ ক্ষুদ্র নৌকাখানিকে বিক্ষিপ্ত করিতে চেষ্টা করিবে, তুমি তত আঁকড়ে ধরিতে চেষ্টা করিও। অনাথের নাথ তিনি, বিপদের বন্ধু তিনি, অকুলের কাণ্ডারী, তোমার নিত্যসখা, শ্রীগুরু তোমার নিত্যসাথী। মুখ মন এবং বুক যখন তাঁহার দিক থেকে স'রে যায় তখনই তোমরা কষ্ট পাইয়া থাক। ঘাত-প্রতিঘাত নিয়েই একটা জীবন। আঘাত না পেলে কোন দিনই একটা ভাল জীবন তৈরী হয় না। আলো এবং অন্ধকার নিয়েই সৃষ্টি। যেখানে আলো সেইখানেই অন্ধকার। অতএব, দুঃখ করিয়া, অশান্তি করিয়া, ঝগড়া করিয়া এ অন্ধকার সরান যায় না।

"অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে
মানে না বাহুর আক্রমণ।
একটি আলোকশিখা সম্মুখে ধরিলে
নিমিষে করে সে পলায়ন॥"

অতএব হতাশ না হইয়া, দুঃখিত না হইয়া নির্ব্বিচারে শ্রীগুরুর উপর নির্ভর করিতে চেষ্টা কর। দুঃখের ভিতর দিয়া কিংবা সুখের ভিতর দিয়া, শান্তির ভিতর দিয়া, কিংবা অশান্তির ভিতর দিয়া, সম্পদের ভিতর দিয়া কিংবা বিপদের ভিতর দিয়া, যে কোন রাস্তা দিয়াই তিনি তোমাকে লইয়া চলুন না কেন, শিশু যেমন রাস্তার কোনরূপ বিচার না করিয়া হাসিমুখে পিতার উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহার হাত ধরিয়া নাচিতে নাচিতে আনন্দে চলে, তোমরাও সেইরূপ চলিতে থাক। তোমাদের এই দুঃখের নিশা অচিরাৎ অবসান হইবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীমান্ ফণীকে এই পত্রখানি দেখাইও। তাহাকে আর পৃথক পত্র দিলাম না।

আমার শরীরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এ শরীর সম্বন্ধে তোমাদের আর বিশেষ কিছুই লিখিতে ইচ্ছা হয় না। শরীর ও মন দুইই খুব অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আর কিছুই ভাল লাগে না। এইবার আমি তোমাদের কাছ থেকে ছুটি চাচ্ছি যাই হোক, ২রা জুলাই আন্দাজ যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে একবার আসিতে চেষ্টা করিও। তোমাদের নিত্য কুশল কামনা করি। আনন্দে থাক।

ইতি—

বিশ্বজিৎ

(২৫)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
জসিডি
২৪।৬।৪৭

বাবা—

আশীর্ব্বাদ লও। আজ তোমার একখানি পত্র পাইলাম। পত্র-পাঠে সবিশেষ অবগত হইলাম। Environment কে উপেক্ষা করা চলে না। উহা কতকটা তোমার উপর influence করিবেই। যাক্, তোমরা একটা ভুল কর। শোন, যাহাদের এইরূপ environment এর মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা বসবাস করিতে হইবে তাহাদের পক্ষে নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করা উচিত। একটা হ'ল inner self, আর একটা হ'ল outer self. অর্থাৎ তুমি নিজে যা তাহা নিজেই থাকিবে। নিজের অন্তরের ভাবসকল বাহিরে প্রকাশ করিতে যাওয়া একটা মস্ত ভুল, কেননা যাহাদের নিকট তুমি ঐ সকল ভাব প্রকাশ করিতে যাও তাহারা সকলেই অত্যন্ত বহির্ম্মুখীন বৈষয়িক মনোভাবাপন্ন এবং কতকগুলি সংস্কারের দ্বারা তাহাদের মন আচ্ছাদিত, তোমাদের ভাবধারা তাহারা কখনই গ্রহণ করিতে পারে না কেননা ওরূপ ভাবধারার সহিত তাহারা কখনই

অভ্যস্ত নয়। কাজেই তোমার মনোভাবের সাহত তাহাদের মনোভাব মিলাইতে গিয়া ঐরূপ একটি অবস্থার সৃজন হয়, ফলে তোমাকে আঘাত দেয়। সেই কারণে তোমরা ভাব যাহা, তাহা তোমার ভিতরেই থাকা উচিত। বাহিরে তাহাদের মত হইয়া মেশা প্রয়োজন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রচার করিবার ভার ঠাকুরেরই। তিনি যেখানে নিজেকে প্রচার করিতে ইচ্ছা করিবেন, সেখানে কোন ঘটনাচক্রের দ্বারা তোমাকে লইয়া যাইবেন এবং তোমার দ্বারা যদি তিনি প্রচারিত হইতে ইচ্ছা করেন, স্বাভাবিক গতি দ্বারাই তিনি প্রচারিত হইবেন। তজ্জন্য তোমাকে কোন চেষ্টা করিতে হইবে না। সকল স্থানে এই ভাব প্রকাশ করিতে নাই, কেননা, বর্ত্তমানজগৎ এভাব কোন দিনই গ্রহণ করিতে পারে না। যাক্, এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা তোমার সহিত সাক্ষাতে করিব, পত্রে এত বেশী লেখা চলে না। উপস্থিত ঐরূপ environment কে সাধ্যমত এড়াইয়া চলাই কর্ত্তব্য; উহাদের সহিত উপর উপর মিশিলেই ভাল হয় অর্থাৎ তোমার সঙ্গে যতটুকু উহাদের কার্য্যতঃ সম্বন্ধ ততটুকুই মেশা উচিত। অন্য সময় নিজের মধ্যে বা তোমার ভাবাপন্ন লোকের সহিত মেলামেশা উচিত। ইহাতে তোমার উপকারই হইবে। এ সম্বন্ধে পত্রে আর বিশেষ কিছু লিখিলাম না। তুমি আসিলে সাক্ষাতে এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হইবে এবং আলোচনাদ্বারা বুঝাইয়া দিব। তুমি 1st. July 17 up এ আসিতে চেষ্টা করিবে এবং 3rd রাত্রে বা 4th সকালে যাইবে। এইরূপ ব্যবস্থা

করিয়া আসিবে। এ শরীর একরূপ আছে। তোমার মাতাঠাকুরাণী বেশ আছেন এবং খুব ঘুমুলেন এবং এখন উঠে আম কলা খাচ্ছেন। তোমরা সকলে কে কেমন আছ? সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও। আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(২৬)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
জসিডি
১২।৭।৪৭

পরমশুভাশীর্ব্বাদ বিশেষ—

মায়ী, স্নেহঘন করুণাবরুণালয় শ্রীগুরু ভগবান, তোমাকে তাঁর সেবার উপযোগী করুন, ইহাই নিয়ত প্রার্থনা করি।

মাগো, তোমার পূর্ণ সুন্দর পত্রটী ঠিক সময়েই পেয়েছি। মা, এতে দুঃখ কিসের? শ্রীগুরু ভগবান্ যদি স্থূলে তোমায় এবার এখানে আনা প্রয়োজন মনে করতেন তবে নিশ্চয়ই তুমি স্থূলে আসতে পারতে। মা, জীবনকে সর্ব্বতোভাবে তাঁর সেবায় উপযুক্ত করে নেবার জন্যই তিনি ঐরূপ নানা বিরুদ্ধ অবস্থার সৃজন করেন। দেখেন অনুকূল অবস্থায় জীব যেমন তাঁকে চায়, প্রতিকূল অবস্থাতেও সে তার সমস্ত আমিত্বটুকু বিসর্জ্জন দিয়ে তাঁর করুণার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে কি না। এইজন্য এই বিরুদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি।

দেখ মা, এবার তোমার শ্রীগুরুপূজা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে। শ্রীভাগবতের ব্রাহ্মণ পত্নীগণের আখ্যায়িকাটি মনে আছে কি? যখন তাঁরা গোপবালাগণের মুখে শ্রীভগবানের সান্নিধ্যের সংবাদ পেলেন, তখন তাঁরা দুর্ব্বারবেগে সকল বাধা পদদলিত করে, সাগর-সঙ্গাভিলাসিনী নদীর ন্যায় সমস্ত বাধা তুচ্ছ ক'রে তাঁর কাছে গিয়ে

মিলেছিলেন। তাঁদেরই মধ্যে একজন শারীরিক বাধা অতিক্রম করতে না পেরে, মানসে সর্ব্বাগ্রে গিয়া শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে পৌছেছিলেন। তাই বলি মা, এই সংসার তাঁর লীলার স্থান। তিনিই খেলোয়াড়। যে রকমভাবে তাঁর খেলতে ইচ্ছা, তিনি ঠিক সেই ভাবেই ঘুঁটী সাজিয়ে নিয়ে খেলছেন। তুমি শুধু আনন্দিত মনে তাঁর লীলাটুকু দেখে যাও। নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করো মা। জীবের যতকিছু দুঃখ এই কর্ত্তৃত্বাভিমান থেকে—এই অহংকার থেকে। দেখ, এই অহংভাবটী বড়ই মলিন। এইজন্যই ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্ত্রিত্ব শক্তি জীবের জ্ঞানে পরিস্ফুট হয় না। যেদিন জীব এই মলিন অহমিকা ত্যাগ ক'রে, প্রকৃত জ্যোতির্ম্ময় অহংসঃ এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, সেদিন আর কোন বিরুদ্ধ ভাবই তাকে দুঃখ দিতে পারবে না। সে সর্ব্বত্র, সকল কার্য্যে সকল সময়ে তার প্রিয় প্রভুর লীলা দর্শনে মগ্ন থাকবে। সে অমৃতময় হয়ে যাবে, সে দেবতা হবে।

মা, নামরূপ অগ্নি জ্বলেছে। বর্ত্তিকা উজ্জ্বল করে দাও, তোমার কাজটুকু হবে শুধু এই আলোটির দিকে সকল সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখা, যেন তোমার অবহেলায় সে নিভে না যায়। তারপর এর কাজ সে নিজেই করবে। তবে মা ধৈর্য্য ধর। একদিন প্রিয়তমকে পাবেই, সে বিষয়ে সন্দেহ করো না। শ্রীগুরুতে বিশ্বাস রেখে, তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার চেষ্টা ক'রে, তাঁর হাত হাতে নিয়ে, তাঁর অভয়বাণীরূপ সম্বল নিয়ে, চল মা পূর্ণত্বের দিকে অমৃতত্বের দিকে।

মাগো, একথাটী সবসময়ে স্মরণে রেখো, শ্রীগুরু কোন এক বিশেষ দেহে বা কোন এক বিশেষ স্থানে আবদ্ধ নহেন। তিনি বিষ্ণু সর্ব্বত্রই তিনি বর্ত্তমান। তাঁর ব্যাপকত্ব আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে না, আমাদের অভিমানের দ্বারা আমাদের জ্ঞান আবৃত ব'লে। তুমি যতটা আপনাকে তাঁর হাতে ছেড়ে দিতে পারবে, নিজের আমিত্বটুকু তাঁ'তে মিলিয়ে দিতে পারবে, ততটুকুই তুমি তাঁর লীলাদর্শনে সমর্থ হবে। তবে একদিনে ত আর সবটা হয় না মা! কত কোটী যুগের সংস্কাররূপ ময়লা তোমার মনে স্তূপীকৃত হয়ে আছে, একদিনেই কি সে সব কেটে যাবে? একটু সময় তো লাগবেই। তবে আর ভয় নাই। আলো জ্বলেছে অন্ধকার নাশ হচ্ছে। বাতি জ্বালাও—অহর্নিশ জেগে, সতর্ক প্রহরীর মত জেগে বাতি জ্বালাও। আসুক অবিশ্বাস, সংশয়ের বন্ধন মাভৈঃ তোমার শ্রীগুরু আছেন। তিনি তোমার হাত ধরেছেন। যতই ঝড় তুফান উঠুক না কেন, তিনি প্রবীণ, সক্ষম নেয়ে, তুমি লক্ষ্যস্থলে পৌছিবেই। পথে ঝড় তুফানে মাঝে মাঝে মনে হবে যেন তরী বানচাল হ'ল, কিন্তু ভয় নাই. নেয়েকে সবটা ছেড়ে দাও, সে সামলাবে। তার মাঝে তুমি যেন নিজে ব্যস্ত হ'য়ে দাঁড় ধরতে যেওনা, তাহলেই বানচাল হবার সম্ভাবনা। আসুক বাত্যা, আসুক প্রভঞ্জন। সংসারে, জ্বালা বন্ধুরূপী সংসারের প্রিয় বন্ধুজন, জেনো, এরা তোমার প্রিয় প্রভুরই দান. তোমার নিজের কেউ নয়। তুমি তাঁরই সেবা করছ। ভয় কি মা, আমি যে তোর আছি। সারাক্ষণ তোর কিসে মঙ্গল হবে

সেদিকে যে তোর প্রিয় প্রভুর সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। এই সংসারের আবর্ত্ত কি তোকে আর ডুবাতে পারে? তুই যে আমার আনন্দের দুলাল! বল, উচ্চকণ্ঠে বল, "জয়গুরু, জয়গুরু!" দে শাঁখে ফুৎকার দে, গর্জ্জে উঠুক সে জয়গুরু বলে, যত অমঙ্গল দূরে পালাক। আয় মা, আয়! ওরে আমার দুলালী, বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছিস! সে কী রে, তুই যে অমৃতের সন্তান। সংসারের বিষ তোকে ক্লান্ত, অবসন্ন করবে কেমন ক'রে? জাগ, জাগ মা, স্ব-স্বরূপে জাগো, বলো—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ-বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

শিবমস্তু।

ইতি—

বিশ্বজিৎ

(২৭)

ওঁ

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

মারে রো
হাজারিবাগ
২৭।৯।৪৭

স্নেহভাজনেষু—

পরমস্নেহঘন শ্রীগুরু ভগবান তোমার অশান্ত মনকে অমৃতধারার অনুক্ষণ অভিসিঞ্চিত করুন—ইহাই মঙ্গলময়ের শ্রীচরণে নিয়ত প্রার্থনা করি।

বাবা, প্রতিটি জীবেরই কাম্য এই মাতৃস্নেহের। সকলেই এই অমৃতধারায় স্নান করিবার জন্য নিয়ত উন্মত্ত। বাবা, এই মা কে? তিনি কি নামরূপধারী কোনও জীব? তা ত' নয় মা। যে বিশ্বশক্তি শ্রান্ত জীব-মনকে স্নেহের ঝরণাধারায় নিয়ত জীবনীশক্তি সঞ্চার করছেন, তাহাই ত প্রকৃত মা। 'মা' শ্রীগুরু ভগবানের ঘনীভূত স্নেহ ও করুণা। তাহা ত বাবা সর্ব্বদাই অবোধ জীবের জন্য উন্মুখ। ছেলে খেলা পেয়ে, ক্ষণকালের জন্য সেই মাকে ভুলে রয়েছে। মা কি ছেলেকে ভুলতে পারে? তিনি যে তাঁর ক্ষীরধারা ল'য়ে অবিরাম তাঁর আপনভোলা ছেলেকে ডাকছেন, 'ওরে খোকা আয়। তোর সর্ব্বাঙ্গে ধূলামাটি।

আর কতকাল মাকে ভুলে থাকবি? আয় বাপ! এবার ধূলা-খেলা সাঙ্গ ক'রে মায়ের স্নেহকোলে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম নে।' ছেলে কিন্তু আজ খেলায় উন্মত্ত। তাই মা'র ডাক তার কানে পৌঁছায় না। যে ছেলে সুবোধ সে মায়ের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে গিয়ে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আনন্দে মায়ের বুকের অমৃতধারা উপভোগ করছে আর অর্দ্ধ উন্মিলীত চোখে মায়ের মুখের দিকে চাইছে আর আনন্দ-সাগরে ডুবে হাসছে। দেখ দেখি কত তার আনন্দ! সে যে নিজেকে ভুলে সবটাই মাকে ছেড়ে দিয়েছে। তাইতেই না সে মায়ের স্নেহ-অমৃতধারায় আজ ডুবে গেছে। আর যে সন্তান মাকে ভুলে, ধূলাখেলায় মেতে আছে, তার জন্য কি মায়ের বুকে দুঃখ নেই? আরে পাগল! যে ছেলে দুষ্টু, তারজন্য যে মায়ের চোখে ঘুম নাই, আহারে রুচি নাই। সকল সময় তার স্নেহময়ী মা যে তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছেন! কি জানি কখন সে কি করে ফেলে, কত কষ্টই না পাবে বলে? যে ছেলে মার কোলে রয়েছে তার জন্য মা'র ভাবনা নাই।

তাই বলি বাবা, মা ত ছেলেকে ভুলে নেই, ছেলেই মাকে ভুলে রয়েছে। একবার ধূলাখেলা ফেলে মায়ের প্রসারিত হস্তের মধ্যে একবার নিজেকে ধরা দে দিকি? দেখ, সেখানে কত শান্তি, কত আনন্দ! ধূলাখেলায় কি আনন্দ আছে রে পাগল?—অভিমান ত্যাগ কর যাদু। তোমার ঐ মাতৃবিরহ-বিদগ্ধ হৃদয়খানি নিয়ে সরল শিশুর মত "মা, মা" বলে মায়ের বুকে

ঝাঁপিয়ে পড়। তোমার সকল জ্বালা দূর হবে,—মাতৃসুধায় হৃদয় ভরপূর হ'য়ে উঠবে—আনন্দময়ীর কোলে চিরানন্দে বিরাজ করবে। শিবমস্তু।

ইতি—

বিশ্বজিৎ।

(২৮)

ওঁ

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

মারে রো
হাজারিবাগ
৫।১০।৪৭

কল্যাণীয়াষু,

মায়ি—আনন্দ চিদ্ঘন প্রাণের দেবতা শ্রীগুরু ভগবানের আশীর্ব্বাদ লও। তাঁর করুণায় তোমার জীবন সর্ব্ববাধা-বিনির্ম্মুক্ত হয়ে শাশ্বত শান্তির অধিকারী হউক।

মাগো, একটা জীবন কোনদিনই সম্পূর্ণ বাধাহীন হয় না। এই সব বাধাই জীবকে তার প্রিয়তম দেবতাকে লাভের জন্য অধিকতর শক্তি ও উৎসাহ দেয়। দেখ নদী যখন বাধা প্রাপ্ত হয় তখন সেই অনুরাগিনী নদী স্বীয় স্বামী সাগরের সহিত সঙ্গমের জন্য কত ব্যাকুলা হয়? সেই উদ্দাম বেগকে কে প্রতিহত করতে পারে? সমস্ত বাধাই ভেসে যায় তার সেই উন্মত্ত গতির সম্মুখে। সেইরূপ হৃদয়ে যদি প্রকৃত ভালবাসা জাগে, পারে কি তাকে প্রতিহত করতে কোন জাগতিক বাধা? দেখ মা, শ্রীমতি রাধিকার জীবন। রাজার নন্দিনী, আয়ানের ঘরণী, জাতিকুলের ভরম কি তার ছিল না। কিন্তু যখন হৃদয়ে প্রেমবন্যা বইল, যখন শ্যামের মুরলীধ্বনি তার শ্রবণ ভিতর দিয়া মরমে পশিল, সে হল পাগলিনী—তুচ্ছ করলে সে সমস্ত বাধা।

সত্যই মা, জীব যদি তার সমস্তটা তার প্রাণের দেবতাকে সমর্পণ করতে পারে, তখনই সে অনুভব করতে পারে, তার ঠাকুর তার সব বাধা অপসারণ ক'রে দিচ্ছেন। আমাদের কি রকম ভালবাসা জানো? আমরা 'এ্যাও' চাই আবার 'ঐও' চাই।. দুটা কি এক সঙ্গে রক্ষা হয় মা? দেখ ইংরাজিতে একটা চল্‌তি কথা আছে "He is a jealous God" অর্থাৎ শ্রীভগবান কখনই দুদিক রাখতে দেন না। মাগো, আমরা কোথায় ভুল করি জান? আমরা ভাবি তাঁকে ভালবাসলে বুঝি আমার এদিক (সংসারের) ভেসে যাবে। কিন্তু মা, যাকে পেলে আর অন্য কিছু 'না পাওয়া' থাকে না যখন সেই সবপাওয়াকে পায়, তখন সে দেখে "আরে আমি যাদের ছেড়ে যেতে ভয় পাচ্ছিলাম, তারাও যে আমার সেই প্রিয়তমই" আমার প্রিয়তমই, আমার চাহিদামত পুত্র, কন্যা, স্বামী ঘর সংসার সেজে আমায় আদর করছেন।

একটা গল্প শোন ভাগবত পুরাণের। কোন স্থানে একদিন ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। কথক মহাশয় বলছেন, শ্রীভগবান সংসার-সমুদ্র অবহেলে পার করে দেন তাঁর ভক্তকে। এখন এক গয়লানী রোজই সেই গাঁয়ে আসত একটা নদী পার হয়ে দুধ দিতে। সে শুনে বিশেষ আনন্দিত হয়ে সেইদিন ঠাকুরের নাম নিতে নিতে অবহেলে পেরিয়ে গেল নদী। পরের দিন কথক মহাশয় সেই কথা শুনে মুখে নাম করতে করতে নদী পার হচ্ছেন কিন্তু মনে তাঁর অবিশ্বাস আছে হেঁটে কি নদী পার হওয়া যায়? ফলে জলও বাড়ছে কাপড়ও ভেজে ভেজে।

তখন গয়লানী হেসে বল্লে—ও ঠাকুর! দুদিক কি একসঙ্গে রক্ষা হয়? ভগবানকেও ডাকবে আবার কাপড়ও সামলাবে?

মা, আজ এ স্থান সত্যই শ্রীবৃন্দাবনে পরিণত হয়েছে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তনাদি হচ্ছে, বহু ভক্ত সমাগম হয়, বেশ আনন্দ হচ্ছে। দেখ মা, আনন্দের স্বভাবই হচ্ছে বিচ্ছুরিত হওয়া। নদী যখন মিশতে যায় সাগরের সাথে, তখন সে তার প্রাণের আনন্দের গান শুনিয়ে যায় সবাইকে কুলকুল নাদে। ডেকে বলে—ওরে শ্রান্ত ভ্রান্ত জীব—আয় প্রিয়তমের সাথে মিলিগে যাই। দুঃখ কিসের? দ্বন্দ্ব কিসের? দেখ্ আমাকে দেখ্। আয়, আয়।

পাঁচু, নীলু সব এখন যাচ্ছে বাংলায়। তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে তা হলে ৺পূজার আগে এদের কাহারও সঙ্গে আসতে পার। অবশ্য যদি তোমার বিশেষ কোনও অসুবিধায় না পড়তে হয়। শ্রীমতী রাধিকার কাহিনী আশা করি তুমি পরিপূর্ণভাবেই জান। দেখ প্রিয়তমের সহিত মিলনের জন্য তাঁকে কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা না শুনতে হয়েছে। মাগো এরা জগতের জীব। এরা আপন স্বভাব অনুযায়ী কথাই বলবে। তাই বলে কি তুমিও এমনই ভুল বুঝবে? তুমি যখন নিজের কাছে নিজেকে সাচ্চা বলে জান তখন তোমার প্রতিটি কাজই সময়ে সকলকে জানিয়ে দেবে তুমি কোন অন্যায় কাজ করছ না। একটু সাহস করতে হয় মা। দেখ একটি সাপ ছিল। এখন সে এক সাধুর সংস্পর্শে এসে সংস্বভাবাপন্ন হ'ল। সে ছেড়ে দিলে তার স্বভাব-

সুলভ হিংসা ক্রূরতা। এখন তাকে সকলেই নানাভাবে জ্বালাতন করতে লাগল। কিছুদিন পরে যখন সেই সাধুর সঙ্গে সেই সাপটির পুনরায় দেখা হল, তখন সে বল্লে, "ঠাকুর, আমি ত ভাল হতে চাই কিন্তু এই সংসারের এরা ত আমায় ভাল হতে দেয় না; অনবরত জ্বালাতন করে।" সাধুটি হেসে বললেন, "বাবা, এরা এদের স্বভাব অনুযায়ী কাজ করছে, তুমিও তোমার স্বভাব অনুযায়ী কাজ কর। আমি তোমায় হিংসা দ্বেষ সব ত্যাগ ক'রে গুরুমুখী হতে বলেছি কিন্তু ফোঁস করতে ত বারণ করি নাই। যখনই এরা অসুবিধা করতে আসবে, তখন তুমি ফোঁস করবে। দেখবে সবাই শান্ত হবে।" তাই বলি মা, এই কোপটা রাখতে হবে।

সব রকমই ব্যবস্থার কথা বললাম। এবার তুমি যেরূপ ভাল বোঝ সেইমত কর। তবে এ আনন্দের মাঝে তোমাদের পেলে বেশ আনন্দ হয়।

পত্রপাঠ উত্তর দিও। আশীর্ব্বাদ জানিবে। আনন্দে থাক।

ইতি—

বিশ্বজিৎ

(২৭)

ওঁ

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

মারে রো
হাজারিবাগ
৬।১০।৪৭

প্রাণাধিকেষু—

স্নেহঘন দেবতা, প্রাণের ঠাকুর শ্রীগুরু ভগবানের স্নেহাদর লও। বাবা, তোমার ১৯।৯।৪৭ তারিখের রেজেষ্ট্রি চিঠি এবং ১০০৲ যথাসময়ে পাইয়াছি। টাকাটি দ্বিজেশকে দিয়াছি। শরীরটা ক্রমেই সুস্থ হচ্ছে।

...সম্প্রতি কঠিন রোগ থেকে উঠল। এ সময় তাকে দেখান যুক্তিসঙ্গত হবে না। তুমি ভেবো না। উহাদের ব্যবস্থা আমার হাতেই আছে। সময়মত সমস্ত ব্যবস্থা হবে।

মা মৃণালিনীর শরীর উপস্থিত কেমন? দেখ তার সম্বন্ধে উপস্থিত যাহা উচিত সেইরূপই ব্যবস্থা শ্রীগুরু ভগবান করিয়াছেন। যখন যেরূপ ব্যবস্থা করা উচিত তিনি তাহার বিধান ঠিকমতই করেন এবং করিতেছেন। তুমি ব্যস্ত হইও না। সে আমার স্নেহের পুত্রবধূ। তার সম্বন্ধে উচিতমত ব্যবস্থা হইবেই।

বাবা, তুমি যে অবস্থার কথা লিখেছ, তা ভণ্ডামি নয়। তুমি নিজে কি তোমার প্রভু? তোমার সম্বন্ধে তোমার ঠাকুর যেরূপ

ব্যবস্থা করেছেন তুমি সেই মতই চল্‌হ। দেখ, একদিনেই কেউ সর্ব্বদোষমুক্ত হতে পারে না। শনৈঃ শনৈঃ পন্থা। কত জন্ম জন্মান্তরের সংস্কারে জীব-হৃদয় বদ্ধ। একদিনেই কি তা পরিস্কার হয় বাবা। তবে যে জীব আপন দোষ দেখে, তা হতে মুক্ত হবার চেষ্টা করে, সে সম্পূর্ণ মুক্ত না হলেও তাকে মুক্তিপথগামী বলা চলে। ইহাতে নিজেকে দোষ দেওয়া চলে না। আশীর্ব্বাদ করি বাবা, এইরূপ প্রতি পদে আত্মবিচার করিয়া চলিয়া সর্ব্বদোষ মুক্ত হও।

জীবের স্বভাবই এই, আত্মীয়স্বজনের দুঃখ কষ্ট দেখিলে সে তা নিবারণের জন্য চেষ্টা করে, তা নিজ শরীর দ্বারাই হোক অথবা অন্য কোন উপায়েই হোক! যাহারা অভিমানী তাহারা নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত পথ বেছে নিয়েছ। তোমার যিনি সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয় তাকেই তুমি এর প্রতিবিধানের ভার দিয়েছ। ইহা তোমার শ্রীগুরুতে অকৃত্রিম ভালবাসাই দ্যোতীত করিতেছে। তুমি তোমার সুখে দুঃখে সর্ব্ব অবস্থাতেই, তোমার সেই পরম বন্ধুকেই স্মরণ করেছ। ইহাই রীতি এবং সাধনার ইহাই লক্ষ্য। যাই হোক, এ সম্বন্ধে সাক্ষাতে বিশদভাবে আলোচনা হইবে। পত্রোত্তরে তোমার বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে জানাইয়া নিশ্চিন্ত করিও। অত্রস্থ মঙ্গল। শ্রীগুরু তোমাদের সর্ব্ববিধ কল্যাণ বিধান করুন, ইহাই কামনা করি। আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(৩০)

ওঁ

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
অক্টোবর, ১৯৪৭

কল্যাণবরেষু—

হে পথিক্, জ্ঞান বিজ্ঞানময় সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীগুরু ভগবান তোমার চলার পথকে সুগম করিয়া দিন, ইহাই প্রার্থনা করি।

বাবা, ধর্ম্ম অর্থে শাস্ত্র ইহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যাহার দ্বারা মন ধৃত হয়, তাহাই ধর্ম্ম ইহাকে আবার দুইভাগে ভাগ করা হয় (১) প্রবৃত্তি ধর্ম্ম (২) নিবৃত্তি ধর্ম্ম। প্রবৃত্তি ধর্ম্ম আবার বহুভাগে বিভক্ত হয়েছে, শারীরিক ধর্ম্ম, সামাজিক ধর্ম্ম ইত্যাদি। জীবের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য এবং সমাজে সকলের সঙ্গে বাস করিতে হইলে কয়েকটী নীতি মানিয়া চলিতে হয়। নচেৎ সব বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। এই সব ধর্ম্ম পালন করিলে ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কামনার পরিপূরণ এই সব মাত্র লাভ হয়। কিন্তু জীবের চাহিদা কি? সে কেন জন্মে এবং মরণের বা প্রয়োজন কি? মরণের পর তার কি গতি হয়? এই পরিদৃশ্যমান জগতের স্রষ্টা কে? ইহাকে পরিচালিত করিতেছে কে? এই সব প্রশ্নের

মীমাংসা হয় অধ্যাত্ম শাস্ত্র বা নিবৃত্তি ধর্ম্মের অনুসরণে। এই শাস্ত্রে কামনা বাসনা বহুমুখীন গতি ত্যাগ করিয়া একমুখীন গতি প্রাপ্ত হয়। মনের স্বভাবই হচ্ছে গ্রহণ এবং বর্জ্জন। আবার এর একটা সুন্দর ধর্ম্ম হচ্ছে যে, এ একসঙ্গে দুইটী বিষয়, কোন সময়েই ধারণা করিতে পারে না। একটী ত্যাগ করিয়া পরে অন্য বিষয় গ্রহণ করে। এখন পঞ্চ ইন্দ্রিয় পথে পঞ্চেন্দ্রিয় ভোগ্য পঞ্চ বিষয় রস আসিয়া একটার পর একটা মনকে আন্দোলিত করিতেছে। ফলে, সে চঞ্চল হইয়া বহুমুখীন গতি প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু এই যে বিবিধ রস বা বিষয় বলিয়া আমাদের ধারণা, ইহা মূলতঃ কিন্তু এক রস। যেমন আমরা বহু রঙ দেখিলেও সর্ব্বরঙের পরিসমাপ্তি এক সাদা রংঙে। মন সর্ব্বদাই ঐ এক রসের সন্ধানে ব্যস্ত। এখন ইন্দ্রিয় সমুদয় বিষয় রসকে আনিয়া মনকে সমর্পণ করে। মন সে সমুদয় তার নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, যাহাকে আমরা বুদ্ধি বলি, তাহাকে দেয়। সে বুদ্ধি স্থির করিয়া দেয় ইহা এই রস বা ওই রস। এখন রস শব্দের মূলগত অর্থ হচ্ছে আনন্দ। এই আনন্দ পাইবার জন্যই মন অবিরত ইন্দ্রিয়পথে ছুটাছুটি করছে। সে বিষয়ে আনন্দ পাচ্ছে কিন্তু তা খণ্ড আনন্দ। নামরূপের দ্বারা সীমাবদ্ধ পরিবর্ত্তনশীল আনন্দ। কিন্তু সে ত তা চায় না। তার চাহিদা হচ্ছে অখণ্ড, ভূমা আনন্দের। কারণ, সে যে ভূমারই অংশ বা রূপান্তর। অতএব, ভূমার যাহা স্বরূপ তার অংশেরও সেই ধর্ম্ম হওয়া উচিত। তাই সে ঐ অখণ্ড আনন্দ খুঁজছে। এখন সবই ঐ আনন্দের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইলেও আমরা আমাদের অল্পজ্ঞান

বা অজ্ঞান বা মায়া দ্বারা এই নামরূপের গণ্ডী দ্বারা সেই ভূমাকে সীমাবদ্ধ করে দেখছি। এখন যে ধর্ম্মের দ্বারা আমরা এই অখণ্ড বা ভূমাকে জানিতে পারি তাহাই নিবৃত্তি ধর্ম্ম।

এখন এই ধর্ম্ম অনুশীলন করিতে হইলে যাঁহারা ইহাতে অভিজ্ঞ তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করতেই হয়। যেমন Diamond Harbour থেকে কলিকাতা আসিতে হইলে, যাঁরা সেখানে এসেছেন তাঁরাই তার প্রকৃত পথ বলিতে পারেন। কোন অনুমানের দ্বারা যেমন তাহা জানা সম্ভব নহে সেইরূপ এই অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে বা নিবৃত্তিশাস্ত্রে যাঁরা পারঙ্গম, মাত্র তাঁরাই ইহার বিষয় বলিতে পারেন। এখন Diamond Harbour থেকে কলিকাতা আসা স্থূলবস্তু কিন্তু এই অধ্যাত্মশাস্ত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা সূক্ষ্ম-অনুভূতিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার মন বহু জন্ম ধরিয়া আপাতঃ সুখকর বস্তুতে এতই মুগ্ধ হইয়া আছে যে সে সহজে আয়াসসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'তে চায় না। সেইজন্যই প্রকৃত অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন। এই অভিজ্ঞ শিক্ষকই হচ্ছেন সদ্‌গুরু।

এই অধ্যাত্মশাস্ত্র, যাঁহাকে জানাইয়া দেন তিনিই ভগবান। তাঁহার স্বরূপ শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে তিনি সচ্চিদানন্দ-ঘন বিগ্রহ। সৎ অর্থে অস্তি—আছে। সকলের নাশের পরও যাহার অনুভূতি হয়, সেই পরম সত্ত্বাকে 'সৎ' বলে। চিৎ অর্থে ভাতি, প্রকাশিত করছেন বা হচ্ছেন নিজ শক্তিতে যিনি। কি প্রকাশিত করছেন? না আপন আনন্দময়তা পূর্ণতা। তোমার

প্রবৃত্তির যেখানে শেষ, যাহা পাইলে তুমি আর কিছুই চাহিবে না, সেই পূর্ণত্ব। এই তিনের সংযুক্ত অবস্থাকে শাস্ত্র ঈশ্বর বলেছেন। এখন ইহাকে যুক্তির দ্বারা কিঞ্চিৎ বোধগম্য করা গেলেও ইহাকে সম্পূর্ণ জানা যায়, যখন ইহাকে ভোগ করা যায়। যেমন একটা বিষয়ের জ্ঞান পূর্ণ হয় যখন তার সম্বন্ধে ভাবায় যতটা জানা যায় সেটা এবং সেই বিষয়কে ভোগ করিয়া। এই উভয়ের সমষ্টি ফলই হচ্ছে সেই বিষয় সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান। যেমন আম বলিলে একটী ফল বুঝায়, যাবা সেই আম খাইয়াছে তাহারা বলিয়াছে ইহা খাইতে মিষ্ট, খাইলে কান্তি বৃদ্ধি হয়, ক্ষুধা নষ্ট হয় ইত্যাদি। কিন্তু তুমি কোনদিনই আম খাও নাই। তোমার নিকট এই পর্য্যন্তই অপরের নিকট হইতে জানা যাইতে পারে। কিন্তু তুমি নিজে যখন এই ফলটী খাইলে, তখন ঐ সব বিষয় পূর্ণভাবে জানিলে। তখন হইল তোমাব পূর্ণজ্ঞান। আম সম্বন্ধে তোমার যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তখনই মাত্র তাহা তোমার সম্পূর্ণ হইল।

অতএব, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেই রস বা আনন্দ, বা জ্ঞানকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্তই হৃদয় সংশয়াকুল হইয়া নানারূপ দুঃখের সৃজন করে। সেই কারণে, উহার মূল তত্ত্বটি জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সংক্ষেপে আজ এ পর্য্যন্তই থাক। পরে এ বিষয়ে পুনরায় আলোচনা হইবে। অত্রস্থ মঙ্গল। পত্রোত্তরে তোমাদের কুশল দিও। আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্বজিৎ।

(৩১)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
১৭৷১০৷৪৭

পরম স্নেহভাজনেষু—

বাবা, তোমার প্রেমঘন অন্তরদেবতার স্নেহ ও করুণাধারায় চিত্তের সংশয়মূলক বৃত্তিসমূহ ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হউক।

১। তোমার অভিমানমূলক পত্রখানি পাইয়া সবিশেষ অবগত হইলাম। শোন বাবা, জীবের তার নিজের উপরই বিশ্বাস নাই। সেই কারণে সে কোন বস্তুই বা কোন অবস্থায়ই সম্পূর্ণ বিশ্বাসের চক্ষে গ্রহণ করিতে বা ধরিতে পারে না। ইহার মুখ্য বা মূল কারণ অজ্ঞানতা। নামরূপের কাজলে চক্ষের দ্বারা সে যাহা কিছু দেখে, অনুভব করে, সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল। যাহা অল্পক্ষণ স্থায়ী, যাহা পরিবর্ত্তনীয়, তাহা কোনদিনই সংশয়শূন্য হতে পারে না। দেবতা ত সে কোনদিন চোখে দেখে নাই। জীব কল্পনার চোখে তাহার নিজ অন্তরেই নিজ দেবতাকে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে; এবং তাহার সেই কল্পনা অনুযায়ী অবস্থা যেখানে দেখে না, সেইখানেই তার মন ছোট হইয়া যায়। কিন্তু এই যে দেবত্ব বিষয়ক কল্পনা, ইহাতেও সে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। কাজেই সে কোন অবস্থাতেই শান্তি পায় না। অভিমানান্ধ জীব, ঐ অভিমানটাকে বড় করিয়া দেখে এবং তার অভিমানপোষক—

বিরুদ্ধ অবস্থা সে কোন সময়েই নিজের মধ্যে মানিয়া নিতে পারে না। তুমি লক্ষ্য করিয়া দেখিও জগতে যত কিছু দুঃখ বা অশান্তি এই অভিমানকেই লক্ষ্য করিয়াই ঘটিয়া থাকে।

২। নিজের ক'রে না লইলে এই নিজের ক'রে নেওয়া অর্থে তুমি কি বুঝ? শোন- গুরু যেদিনই, যেমুহূর্ত্তেই তোমাকে কৃপা করিলেন, ঠিক সেই সময়েই তোমার সহিত তাঁহার হৃদয়ের বিনিময় হইল। "ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু, মমচিত্তং অনুচিত্তস্তেইস্তু।" এই মন্ত্রদ্বারা শিষ্যের সহিত গুরুর চিত্তবিনিময় হইয়া যায়। ইহাই দীক্ষা। এখন ক্ষেত্র অনুযায়ী সময়ে ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ যে জীব বা যে ভক্ত কিম্বা সাধক গুরুতে অধিক প্রেম বা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয় তাহার হৃদয়েই অনুক্ষণ গুরুবিষয়ক চিন্তা চলিতে থাকে। বিষয় সংস্কারসম্পন্ন চিত্তদর্পণ অর্থাৎ বৈষয়িকচিন্তার দ্বারা আচ্ছাদিত চিত্ত গুরু-প্রেমবারিতে ধৌত না হইলে, দেবত্ববিষয়ক ভাবধারাগুলি প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। ইহার স্বপক্ষে যুক্তি হইতেছে—একটা দর্পণ যতই স্বচ্ছ হউক, একবার মলিনতাপূর্ণ হইলে, ঘর্ষণের দ্বারা পরিস্কার না করিলে সে কোনদিনই মলিনতামুক্ত হইতে পারে না। এই চিত্ত অনুক্ষণই বিষয়ের সংস্পর্শে আসিয়া থাকে। কাজেই তাহাতে বিষয়ের ছাপই অধিক লাগে। বৈষয়িক যত কিছু চিন্তা বা ভাবধারা সমস্তই অভিমানমূলক এবং উহা অভিমানেরই পরিপোষক। সে যাহা কিছু দেখে, যাহা কিছু শোনে, যাহা কিছু অনুভব করে, সমস্তটাই ঐ অভিমানের পরিপোষক বা পরিবর্দ্ধক। এখন ইহার

বিরুদ্ধভাব যেখানেই দর্শন করে বা অনুভব করে, সেইখানেই তাহার মন নীচে নামিয়া যায়। এ সম্বন্ধে আরও একটু তোমায় লিখিব—জীবের একটা মজ্জাগত স্বভাব, যে অবস্থাটাই সে তার নিজ বুদ্ধির উপরে বা বাহিরে অনুভব করে, সেইটাই তার কাছে অলৌকিক বা আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলি—তুমি এমন একটা অবস্থা বা ঘটনার মধ্যে প্রকৃতির নিয়মানুসারে পড়িয়া গিয়াছ, যাহা তুমি কিছুতেই তোমার ভিতরে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছ না। তখন তোমার ভিতরে একটি স্বাভাবিক বুদ্ধি জাগে, ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য এবং তাহার সেই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিসম্পন্ন স্থান যেখানেই অনুভব করে সেইস্থানেই যায়, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য। সে উক্ত অবস্থাতে এত বেশী উত্যক্ত হইয়াছে যে ইহা হইতে এক মুহূর্ত্তেই নিষ্কৃতি পাইবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া সে ঐ শ্রেষ্ঠত্বের শরণাপন্ন হইয়াছে এবং তাহার কল্পনামত সময়ের মধ্যে সে যদি নিষ্কৃতি না পায় তাহা হইলেই সে ঐ শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করিয়া বসে এবং নানারূপ ভাবের দ্বারা সে নিজ মনকে বুঝাইতে থাকে যাহাতে তাহার মন ঐ শ্রেষ্ঠত্বে আস্থাহীন হইয়া পড়ে। ইহাই জীবের অবস্থা। সে তাহার অবস্থাতে এত বেশী মাত্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে যে, তাহার বুদ্ধি বিচারই করিতে পারে না যে তাহার উপস্থিত মনোবৃত্তিগুলি, যেগুলি আজ তাহাকে বেদনা দিতেছে, কিছুদিন পূর্ব্বে এইগুলিই তাহাকে সান্ত্বনা বা আনন্দ দিবে এইরূপ কল্পনা করিয়া, আদর করিয়া নিজের মধ্যে

বরণ করিয়া লইয়াছিল এবং আজ তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াও অভ্যাসবশতঃ এখনও তাহাতে ইন্ধন যোগাইতে বাধ্য হইতেছে।

এখন এই যে অবস্থা ইহা নিজের মধ্যে লইয়া আসিতে কত সময় লাগিয়াছে। আজ সে ইহা হইতে নিষ্কৃতি একদণ্ডেই পাইতে চায়, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব? অজ্ঞানান্ধজীব ইহার স্বপক্ষে যুক্তি দেয় যে গুরু সর্ব্বশক্তিমান। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। তাহাদের এ যুক্তি আমি স্বীকার করি। কিন্তু ওরে পাগল, তোর ঐ যে কষ্টকর অবস্থা, যেটা শান্তি দেবে বলে তুই এতদিন আগ্রহ ক'রে নিজের মধ্যে আনিয়াছিলি, আর আজ সেটা দুঃখ দিচ্ছে ব'লে তা হ'তে নিষ্কৃতি পেতে চাস্, ওরে এই অবস্থাটাও ত গুরুই আনিয়াছিলেন? তা এই অবস্থা আনিতে যদি তাঁর অত সময় লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা হইতে নিষ্কৃতি দিতে তাঁর অর্দ্ধেক সময় লাগাও স্বাভাবিক। যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন সত্য, কিন্তু যেকাজ করিতে যতটুকু সময় লাগা দরকার, ততটা সময় তাঁকে দেওয়া উচিত নয় কি? কোন একটা জিনিষ তৈরী করিতে গেলে সেই বস্তুরই তৈরী করিবার যে Scheduled time থাকে তাহা তাহাকে দিতেই হইবে। অবশ্য, Engineer এর skilfulness এর দরুণ সময়ের কিছু কম বেশী হইতে পারে। কিন্তু সময় লাগিবেই। Unscientific কোন বস্তু কোনদিন হইতে পারে না। ঈশ্বরের একটি নাম বিজ্ঞানময় অর্থাৎ Scientist. He cannot be beyond science বিজ্ঞানের

বাহিরে তিনি কিছু করিতে পারেন না বা হইতে পারেন না, বা জীব অনুভব করিতে পারে না।

আমি তোমার এই প্রশ্ন যতটা সম্ভব পরিস্কার করিয়া বলিলাম। আমার উপরোক্ত যুক্তিগুলি বার বার পড়িলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। একবার দু'বার পড়িলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। তোমার বুঝিবার জন্য একটী উদাহরণের দ্বারাও তোমায় বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি :

মনে কর, তোমার স্ত্রী—দেখ, এই স্ত্রীলোকদের স্বামীবিষয়ক একটা কল্পনা তাহার বাল্যকাল হইতে থাকে এবং সে তাহার কল্পনানুসারেই তাহার স্বামীকে পাশে দেখিতে ইচ্ছা করে। এখন এই যে কল্পনা, ইহা তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে মনের মধ্যে বাসা বাঁধে। এখন যতদিন যায় সে তাহার চতুস্পার্শ্বস্থিত উক্ত অবস্থাই প্রতিনিয়ত দেখে এবং নিজের সঙ্গে মিলাইতে থাকে। এখন সে চেষ্টাও করিতে থাকে তাহার স্বামীকে নিজ কল্পনাঅনুযায়ী তৈরী করিতে। যখন কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে না, তখনই তার মন বিদ্রোহ ঘোষণা করে; এমন কি তাহার কল্পনা বা অভিমান পরিপোষকের জন্য যে কোন অবস্থাকেই বরণ করিয়া লইতে সে পশ্চাদপদ হয় না। তাহার এই কল্পনা তাহাকে এমনই করিয়া পাইয়া বসে বা অভিভূত করে যে, সে চায় যে একমুহূর্ত্তেই একটা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রকৃতি তার প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে। জীব কোনদিনই কল্পনা করিতে পারে না যে, দু'টী প্রকৃতি একভাবাপন্ন হয় না। এই প্রকৃতির মিলন বা অমিলন

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল অনুযায়ী হইয়া থাকে। একই প্রকারের রোগী দুইটী। একটি ডাক্তার দুইটি রোগীকেই দেখিতেছে, দুইটি রোগীকেই একই ঔষধ দিতেছে। কিন্তু একটি রোগী বাঁচিল, অপরটি মরিল। এখন দোষ কার? রোগীর না ডাক্তারের?

৩। গুরু নিত্য সাথী। গুরুর নিত্য বর্ত্তমানতা তখনই উপলব্ধি হয় যখনই মন নিয়ত গুরুতেই সংলগ্ন থাকে অর্থাৎ গুরু-চিন্তায় পূর্ণ থাকে॥ গুরুর স্থূল শরীর সঙ্গকালীন মনে আর কোন চিন্তা আনিতে পারে না, একমাত্র সেই চিন্তা ছাড়া। সেই কারণেই গুরুর নিত্যসান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সে যখন সংসারে ফিরে যায় তখন তাহার মনে গুরু চিন্তা ছাড়াও অন্যান্য চিন্তা বলবতী থাকে। সেই কারণেই গুরুর নিত্য সান্নিধ্য উপলব্ধিগম্য হইলেও চিত্ত ধারণা করিবার অবসর পায় না। তবে গুরুতে প্রেম যদি অধিক হয় তাহা হইলে উক্ত অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। শ্রীগুরুর স্থূলের সঙ্গ করিয়া শিষ্য গুরুর নিত্যসান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে পারে। ইহাই মানব-জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ।

' কৃপা কোনও হেতুকে লক্ষ্য করিয়া বর্ষিত হইয়াছে, ইহা ত আমার জানা নাই। কৃপা চিরকালই অহৈতুকী, তিনি যদি কৃপাময় হন, তাহা হইলে কোন কিছু উপলক্ষ্য করিয়া তাঁর কৃপা বর্ষিত হইতে পারে না। কৃপাময় শ্রীগুরু চিরকালই অহৈতুকী করুণাই করিয়া থাকেন এবং সেই কারণেই গুরু ভগবান। শ্রীগুরুর সন্তানদের মঙ্গলের জন্য, তাদের শান্তির জন্য অক্লান্ত

পরিশ্রম, নিঃস্বার্থ প্রেম বিতরণ করাই তাঁর স্বভাব। কিন্তু সন্তানরা এর বিনিময়ে লাঞ্ছনা, অশ্রদ্ধা, সংশয়, অবিশ্বাস দিয়ে গুরু-অঙ্গ ভূষিত করিয়া দেয়। আর করুণাময় শ্রীবিগ্রহ তাহাই হাস্যমুখে বরণ করিয়া লইয়া আনন্দে মত্ত হইয়া নিঃসঙ্কোচে ঐ শিষ্যদত্ত বিষ গলাধঃকরণ করিয়া কণ্ঠে ধারণ করেন বলিয়াই তিনি নীলকণ্ঠ।

যাক্ এ সমস্ত কথা। আমি তোমাকে ৺পূজাতে আসিতে নিষেধ করি নাই। তোমার এই উক্তিতে আমি আন্তরিক ব্যথিত হইয়াছি। তুমি আমার কাছে থাকিলে আমি কতটা শান্তি পাই ইহা বোধ হয় তোমার অবিদিত নাই। তুমি আমার চিঠিখানি পড়িয়া দেখিও। আমি লিখিয়াছিলাম, যদি বিশেষ অসুবিধা বোধ কর তাহা হইলে না হয় আসিও না; অশান্তি করিয়া আসিবার প্রয়োজন নাই। কাহাকেও দুঃখ বা অশান্তি দিয়া আমি সুখী হইতে চাই না। এরূপ প্রকৃতি আমার নয়, আমি চাই, তোমরা সুখী হও, তোমরা শান্তিতে থাক, তোমরা হাস্যমুখে, আনন্দে, এই দুঃখময় জগৎটার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াও। ইহাতে যদি আমার লক্ষ লক্ষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, শত বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণা আমি ভোগ করিলে, তোমরা সুখী হও, আমি সানন্দে তাহা গ্রহণ করিব। ইহা আমার আন্তরিক উক্তি। ইহাতে কিছুমাত্র কপটতা নাই।

কি আর বলিব, এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার জীবন শান্তিপূর্ণ হউক। তুমি কি সত্যই ৺পূজায় আসিবে না? Magazineটী যথাসম্ভব শীঘ্র বাহির হওয়া উচিত। বড় দেরী হইয়া গেল। আমি সুরথবাবুর সঙ্গে দেখা করিব।

মাখনের পত্র আমি পাইয়াছি। তাহাকেও আজ পত্র দিলাম। হাজারিবাগ জায়গা আমার মনের অনুকূল সত্য, স্বাস্থ্যের অনুকূল কি না আমার জানা নাই, আশ্রম হাজারিবাগে shift করা বিষয়ে আমার মতামত কিছুই নাই। কারণ, আশ্রম আমার নয়, আশ্রম তোমাদের। আমি তোমাদের সেবক। যেখানে থাকিলে তোমাদের সেবা করিবার সুবিধা হইবে এবং তোমরা যেখানে আমাকে রাখিবে, আমি সেখানেই থাকিব। সেবকের নিজের কোনও ইচ্ছা নাই। থাকিতে পারে না, এবং তাহা যুক্তিসঙ্গতও নয়। তোমার কার্ডের চিঠি পাইয়াছি। Easy chair এতদূরে পাঠান যুক্তিসঙ্গত হইবে না। আমি হারানগঞ্জের সেই বাড়ীতে shift করিয়াছি। এখানেও প্রত্যহ বহুলোক সমাগম হইতেছে। শ্রীশ্রীভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন হইতেছে। তোমার জন্য মন খুবই অস্থির হয় যদিও আমার মনের কোনই মূল্য নাই। অত্রস্থ মঙ্গল জানিবে। তোমার কুশল দিও। ইতি—

বিশ্বজিৎ।

(৩২)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
৩০।১০।৪৭

পরম স্নেহাস্পদেষু—

বাবা, প্রেমঘন বিগ্রহ জ্ঞানবিজ্ঞানময় শ্রীগুরু ভগবানের আশীর্ব্বাদ লও। তোমার ১৪।১০।৪৭ তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। তুমি ঠিকই লিখিয়াছ। দীক্ষার পূর্ব্বে গুরু-শিষ্য উভয়েরই উভয়কে পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত। শাস্ত্রেও এই নির্দ্দেশই দিয়াছেন যে, এক বৎসর গুরু ও শিষ্য উভয়ে সঙ্গ করিয়া তৎপর বরণ করিবে। দেখ বাবা, গুরুবরণ করিবার আগে শিষ্যের কি দেখা উচিত? তিনি সদগুরু কি না তাহাই বিবেচ্য। কারণ, একমাত্র সদগুরুই সমর্থ। তিনি শিষ্যের যাবতীয় সংশয় নিরশন করিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে তাহার গন্তব্যস্থল যে "পরমং পদং" তথায় লইয়া যান। কারণ, সদগুরু অর্থে ব্রহ্মবিদ্, এবং "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" এই সূত্রে জানা যায় যে সদগুরু সর্ব্বশক্তিমান্। এখন সদগুরুর লক্ষণ শাস্ত্রদৃষ্টে দেখা যায় যে, তিনি সদাপ্রফুল্ল, বালকস্বভাব, সর্ব্বপ্রকার ভাবের সুমীমাংসায় দক্ষ, পরনিন্দাবর্জ্জিত, আত্মপ্রশংসাপরাঙ্মুখ ইত্যাদি, যাঁহার মধ্যে এইসব গুণের অধিকাংশ পরিলক্ষিত হয় তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লওয়া যায়। কারণ, তদধিক শিষ্যের আর শক্তিই নাই যাহা দ্বারা সে

ব্রহ্মবিদ্‌কে চিনিতে পারে। অপরন্তু বৈষ্ণবশাস্ত্রে দেখা যায়, যাঁহাকে দেখিলেই চিত্ত প্রসন্ন হইয়া উঠে তিনিই বৈষ্ণব বা সদগুরু-বাচ্য। তুমি যদি এসব লক্ষণ এশরীরে দেখিতে পাও তাহা হইলে ইহাকে গ্রহণ করিতে তোমার কি আপত্তি থাকিতে পারে? যদি তুমি বল, "আমি সাঁতার শিখিয়া পরে জলে নামিব" তাহা হইলে তোমার কোনদিনই সাঁতার শেখা হইবে না। তোমার সর্ব্ববিধ সুবিধা হইবে তবে তুমি গুরুবরণ করিবে, এ যুক্তি কদাচ সঙ্গত নয়। শিষ্যের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ হচ্ছে শ্রদ্ধা। জীবের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, "আনন্দ লাভ" করা। জগতে সে সর্ব্বদাই এই আনন্দের পশ্চাতে ছুটছে কিন্তু শাশ্বত নিত্য অপরিসীম আনন্দেরই সে লাভেচ্ছু, খণ্ড আনন্দের নয়। "ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি"। কিন্তু যাহা নামরূপের দ্বারা সীমাবদ্ধ তাহা কোনদিনই অখণ্ড আনন্দের সংবাদ দিতে পারে না। যিনি সেই আনন্দ অনুভব করেছেন, তিনিই মাত্র ইহার সংবাদ দিতে পারেন, এবং এইজন্যই সদগুরুর প্রয়োজন। তিনি আপন শক্তিবলে শিষ্যের সমুদয় সংশয় নিরসন ক'রে ধীরে ধীরে তাকে বৈষ্ণবধামে লইয়া যান। ইহাই গুরুর কার্য্য।

দেখ, কৃপা চিরকালই অহেতুকী। জীবের মধ্যে এমন কোনই গুণ নাই যাহার বিনিময়ে শ্রীগুরু ভগবান শিষ্যের প্রতি অনুগত হইতে পারেন। তাঁহার অভাব কিছুই নাই। তিনি সদা পূর্ণ অর্থাৎ আনন্দময়। আনন্দের স্বভাবই হচ্ছে স্বতঃবিচ্ছুরিত হইয়া অপরকে আনন্দিত করা এবং এই স্বভাবের বশেই সদাপূর্ণ

ভগবান অপূর্ণ শিষ্যের বুকে এই আনন্দ পরিবেশন করিতে সদা উৎসুক। শিষ্য তাঁহাকে কিছু দিবে এই প্রত্যাশায় নহে। আবার মজা হচ্ছে, যেখানে যত বেশী অভাব সেখানেই এই উৎস তত বেশী মাত্রায় যাইয়া পড়ে। মায়ের স্নেহ অবোধ অকৃতি সন্তানের উপরেই অধিক হয়।

দেখ, গুরু বলিতে তুমি কি বুঝ? সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত নাম রূপের গণ্ডীতে আবদ্ধ কোনও পরিবর্ত্তনশীল দেহ কোন দিনই গুরু নন। গুরু অর্থে জ্ঞান। শিব অর্থে কল্যাণ বা মঙ্গল এবং কল্যাণ অর্থে যখন জীবের অজ্ঞান বা অল্পজ্ঞান নাশ হয়, যখন সে নিজের স্বরূপে অবস্থিত হয়, তখনই কল্যাণময় অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্যই শিব গুরু। জ্ঞানের দ্বারা তোমার যে অল্পজ্ঞান অর্থাৎ 'আমি জীব' এই পরিমিত ভাব— এই বোধ পরিবর্ত্তিত হইয়া আমি বদ্ধ নই, আমি মৃত্যুগ্রস্ত নই, এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই, সাধনা এবং তখনই জীব শিব হয়। (গীতা ২য় অধ্যায়) "নৈনং ছিন্দতি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইত্যাদি। গুরু সর্ব্বজ্ঞ। তিনি তাঁর অবাধ দৃষ্টিতে শিষ্যের শুধু এই জীবনটাই নয় পূর্ব্বাপর সমস্তটাই দেখতে পান এবং শিষ্যের যদি কোনও অনর্থের সম্ভাবনা দেখেন, তখন তিনি সেটাকে কোনও সামান্য ভোগের দ্বারা কাটাইয়া দেন অথবা নিজে ভোগ করেন। দেখ, আমাদের জীবনে যে সব ঘটনা হয়, তাহা প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল স্বরূপ, এবং প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত কোনদিনই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। আজ কোন ক্রিয়া দ্বারা তাহাকে দমিত করিয়া রাখিলে, সময়ান্তরে তাহা সঞ্চিত

কর্ম্মরূপে ফল প্রসব করিবেই। সেইজন্যই সমর্থী সদগুরু অল্প ভোগের দ্বারা তাহা করাইয়া দেন। নচেৎ তাহার পক্ষে তাহার কাম্য শিবত্ব দুর্ল ভ হইয়া উঠে। এই কারণ আমার মনে হয়, তোমার কবচ ধারণের কোনই প্রয়োজন হইবে না। এইখানে তোমায় একটি গল্প বলি শোন,—কোন এক সাধু একদিন এক বড়লোকের বাড়ী বসে আছেন। এমন সময় দেখলেন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভিক্ষা ক'রতে সেই বাড়ী এল। সাধু দৃষ্টি মাত্রই বুঝতে পারলেন, প্রারব্ধ বশে সেই ব্রাহ্মণের বিষম দুর্দ্দশা উপস্থিত। তিনি তা দর্শন করে দয়াপরবশ হয়ে তার প্রারব্ধ ক্ষয়ের জন্য তাকে গালাগালি করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ তদুত্তরে তাঁকেও গালাগালি করাতে সাধু হস্তস্থিত দণ্ডের দ্বারা ব্রাহ্মণকে এমন প্রহার করলেন যে ব্রাহ্মণের এক হাত ভেঙ্গে গেল এবং সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। পুলিশ এসে সাধুকে ধরে নিয়ে গেল এবং বিচারে সেই সাধুর ছয় মাস জেল হল। সাধু হাসিমুখে সেই দণ্ড গ্রহণ করলেন। সেদিন সেই ব্রাহ্মণের মৃত্যুযোগ ছিল। এই সামান্য ভোগ এবং অবশিষ্ট সাধু নিজে ভোগ করে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে মহাদুর্দ্দশা থেকে মুক্ত করলেন।

তুমি যে সব স্বপ্ন দেখিয়াছ তাহা বড়ই সুন্দর। শ্মশান, মৃতদেহ এইসব সংসারে আসক্তির নাশ, বৈরাগ্যে আস্থা সূচিত করে। এবং জীবের অন্তরে যখন এই বৈরাগ্যের উদয় হয় তখনই সে 'আমি কে', কোথা হইতে 'আমি' আসিয়াছি, 'কেন মোরে জারে তাপত্রয়" --এইসব চিন্তার উদয় হয়। এবং এই বৈরাগ্য উদয় হয়

সৎসঙ্গের ফলে। সৎসঙ্গে চিত্ত গুরুমুখী হইয়া উঠে। তখন তার চিন্তার ধারাও তার অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে সৎ প্রসঙ্গলাভের জন্য ব্যগ্র হয়। যেমন Mercury বা পারদ। উহা নিয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে পারদের ক্রিয়া শরীরে লক্ষিত হয়। তুমি যে স্বপ্ন দেখেছ তোমায় মা কালির কাছে বলি দেওয়ার নিমিত্ত। তুমি জপ করতে থাকলে পরে শুনলে তোমায় বলি দেওয়া হয়ে গেছে। সত্যই তাই। দেখ কালী অর্থে ব্রহ্মের কালশক্তি—পরিবর্ত্তনশীল অবস্থাকে যাহা নাশ করে সেই শক্তি। গুরু অর্থে শিব। তিনি জীবকে এই কালীর নিকট লইয়া গিয়া পরিবর্ত্তনশীল নামরূপের ধাঁধা থেকে মুক্ত করেন। তার পরিবর্ত্তন কি হয়? এই জগৎ, এই দেহ, এইসব কি বদলাইয়া যায়? না, তা নয়। মনের গতির পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। ওরে পাগল, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" সবই ব্রহ্মময়। সব যদি ব্রহ্মই হয়, তবে এর নাশ হবে কেমন করে? ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্য বস্তু। তোর যে ধারণা ছিল, এই দেহ আমি, এই সংসার আমার—মাত্র এই চিন্তাধারা পরিবর্ত্তিত হয়ে, তুই তখন দেখতে থাকিস আমিই জগৎ, আমিই সব, তখন সমস্তই মধুময় হয়ে যায়। তখন তুমিও মধু, আমিও মধু, আকাশও মধু, বায়ুও মধু। দেখ, এই অবস্থাকে লক্ষ্য করেই শ্রুতি বলেছেন—

"ওঁ মধুর্বাতা ঋতায়তে, মধুং ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্ণ্ণ সন্ত্বোষধীঃ,
ওঁ মধুনক্তমুতোষসো, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধুদ্যৌরস্তুনঃ পিতা।
ওঁ মধুমান্নো বনস্পতি মধুমান্ অস্তু সূর্য্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তুনঃ।

ওঁ মধুঃ, ওঁ মধুঃ, ওঁ মধুঃ।" কিছুই পরিবর্ত্তন হয়নি। হয়েছে মাত্র তোর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন। দেখ, সদগুরুর ক্ষণিক সঙ্গগুণে ঠাকুর তোকে এই স্বপ্ন দেখিয়েছেন। ইহা ভৌতিক বা মিথ্যা নয়।

তোমাদের কুশল দিও। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(৩৩)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
২।১১।৪৭

কল্যাণীয়াসু--

মায়ি! স্নেহঘন দেবতা শ্রীগুরুগোবিন্দের ও বজয়ার আশীর্ব্বাদ লও। ইতিপূর্ব্বে তোমায় পত্র দিয়াছি, আশা করি পাইয়া থাকিবে।

মা, সৎসঙ্গ করিতে হইলে মন সর্ব্বতোভাবে অন্য ভাবশূন্য হইয়া একেবারে তন্ময় হইতে হয়। একবার মাত্রও অন্যমনা হইলে এইরূপ বাধা আসিয়া থাকে। গুরুসঙ্গ অতি কঠিন। তিনি জীবকে এইরূপ পদে পদে বাধারূপ শিক্ষা দিয়া জানাইয়া দেন, "ওরে দু' নৌকায় পা দিয়া এপথে চলা যায় না।"

মা, এত অল্পে মনোভঙ্গ হলে চলে কি? সমুদ্রে পাড়ি দিতে আরম্ভ করেছ। একবার একটা তরঙ্গাঘাতে যদি ভাঙ্গিয়া পড় তবে পরপারে পৌঁছান অসম্ভব। তোমরা সদ্‌গুরুর সন্তান। তাঁর জিনিষ তিনি যেমন ইচ্ছা খেলবেন। তবে জেনো তিনি সুদক্ষ খেলোয়াড়, কোন ব'ড়ের চাল কখন দিলে বাজীমাৎ হয় তা তাঁর খুব ভালমতেই জানা আছে। তুমি আমি তার জন্য ব্যাকুল হব কেন? যতদিন পর্য্যন্ত নিজের সুখদুঃখের অভিমান থাকবে, জানবে ততদিন পর্য্যন্ত শ্রীগুরুর কৃপা ধারণা করবার যোগ্যতাই

আমাদের হয় নাই। এইরূপ বিপর্য্যয়েই তাঁর করুণার পরিচয়। নিজের আমিত্বটুকু সম্পূর্ণভাবে তাঁতে বিলিয়ে দিয়ে চল মা ঐ আনন্দোজ্জ্বলধামের দিকে। বল মা, উদাত্তস্বরে—

'হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥'

একবার নিজেকে এইভাবে গোবিন্দে সমর্পণ করতে পারলে দেখবে, তখন মৃদুমন্দ মধুর রবে শ্যামের বাঁশরী বাজছে। তখন ব্রজবাসীগণের ন্যায় উন্মাদগতিতে প্রেমাস্পদের দিকে এগিয়ে যাবে সমস্ত বাধা পদদলিত করে। মা শাস্ত্র আমাদের এই শিক্ষাই দিয়াছেন, যদি তুমি আপন প্রিয়তমকে চাও, তা'হলে অন্য কোনদিকে দৃষ্টিপাত করলে চলবে না। তাই না ব্রজদেবী গেয়েছিলেন—"প্রাণ সঁপিলে গোবিন্দে, লোকে যদি নিন্দে, সে কলঙ্ক হবে মোর মালা।"

মা, তোমায় এই শিক্ষা দিবার জন্যই এবার এই বাধার সৃষ্টি হয়েছিল। তোমাদের বেগ হবে প্রভঞ্জনের মত, পর্ব্বতনিঃসৃত তরঙ্গিনীর মত। সামনে পাহাড় পড়লে তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে না? গুরুগতপ্রাণ সাধকের পক্ষে অসাধ্য কি থাকিতে পারে? শ্রীগুরু সর্ব্বশক্তিমান নয়? তিনি সর্ব্বদা তাঁর ভক্তকে রক্ষা করিতেছেন।

যাক্, এবার পত্রপ্রাপ্তিমাত্র শ্রীগুরু বলে যাত্রা করো। মনে রেখো, শ্রীগুরু তোমার সঙ্গে রয়েছেন; সমস্ত বাধা দূর হ'য়ে যাবে। আশীর্ব্বাদ জেনো। আনন্দে থাক। ইতি—

পুঃ —তোমার চিঠি Murray Row-র বাড়ীতে এসে পড়েছিল, আজ পেলাম। কলেজের মোড়ে রাঁচী রোডে মোটর থেকে নামলে এখানে শীঘ্র আসা যায়। বাসওয়ালাকে বললেই সে ব্যবস্থা করে দেবে। ইতি –

বিশ্বজিৎ।

(৩৪)

ওঁ

শান্তিকুটীর
হাজারিবাগ
৬।১১।৪৭

কল্যাণবরেষু --

সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ সর্ব্বকল্যাণআকর জ্ঞানবিজ্ঞানময় শ্রীগুরু ভগবান তোমার চলার পথকে বিঘ্নহীন করুন, এই প্রার্থনা করি।

দেখ বাবা, তুমি অতি সত্যকথা বলিয়াছ। আমরা সত্যই আমাদের লক্ষ্য স্থির না করিয়াই ধর্ম্মের বড় বড় তত্ত্বকথা বলিয়া থাকি। সর্ব্বপ্রথম আমাদের জানা উচিত ধর্ম্ম কি এবং এই ধর্ম্মের লক্ষ্য কি? যে বস্তুকে বা যাহাকে অবলম্বন করিলে মনের সর্ব্ববিধ চঞ্চলতা নষ্ট হয় তাহাই ধর্ম্ম। এই নিশ্চয় অবস্থা লাভ করিতে হইলে কয়েকটী নিয়ম পালন করিয়া চলিতে হয় এবং ঐ সব বিষয়ে যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহাদের নিকট হইতে তাহা শিক্ষা করিতে হয়। এই ধর্ম্ম যাঁহাকে জানাইয়া দেয় সেই সর্ব্বনিয়ামকই ভগবান।

সত্যই সমস্ত বিষয়ই নিয়তির অধীন। এখন এই নিয়তি শব্দে কি বুঝা যায়। সেই সর্ব্বনিয়ামক যে কোনও ঘটনা প্রকাশ করিবার জন্য যে নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, তাহাই নিয়তি বলিয়া কথিত হয়। এখন এই নিয়ম অনুসারে জীবের স্বভাবের পরিবর্ত্তন

সম্ভব এবং কার্য্যতঃ তাহাই দেখা যাচ্ছে। তা না হ'লে জগাই মাধাই-এর ন্যায় দুষ্কৃতকারীরা কোনদিনই উদ্ধার পেত না।

হাঁ, যতদিন জীবের কর্ম্মসংস্কার অর্থাৎ স্থূলে আসক্তি থাকে তাকে ততদিনই এরূপ যাওয়া-আসা করতে হয়। এই নামরূপে আসক্তির নাশ হয় যখন ভগবানে প্রেম হয়; মাত্র তখনই মুক্তি বা এই গতাগতির নিবৃত্তি হয়। সমস্ত জগৎই এই আসক্তি-হেতু নামরূপের মোহে মুগ্ধ আছে। যাহারা শান্তিকামী তাহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে, কি উপায়ে এই আসক্তির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায় তাহার উপায় সন্ধান করে সেইমত আচরণ করা। পত্রে এর বেশী লেখা সম্ভব নয়। লিখিলেও বুঝা কঠিন। এর অধিক জানিতে হইলে স্থূলে সাক্ষাৎকার প্রয়োজন। আমি February পর্য্যন্ত এখানে আছি। এরপর জসিডি যাইব। আপাততঃ এইরূপ স্থির আছে। যদি প্রয়োজন বোধ কর তবে দেখা হইলে এ বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করা যাইবে। ইতি—পথিক বন্ধু

বিশ্বজিৎ

(৩৫)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম।
হাজারিবাগ
৮।১১৪৭

স্নেহাস্পদেষু—

বাবা, শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদ লও। তুমি লিখিয়াছ অঙ্গার শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি। একথা সত্য। কিন্তু তুমি যে লিখিয়াছ, পোড়াইলে যে কয়লা সেই কয়লাই থাকে, এটা ভুল। তার বহিঃ অবয়বটা কয়লার মত থাকিলেও তার অন্তর হয়ে যায় নির্ম্মল। তেমনি আমাদের অন্তর বিরহ-অনলে দগ্ধ হইয়া সর্ব্বদা প্রিয়তমের চিন্তায় তন্ময় হয়ে যায়। বাহিরের বিষয় তখন আর তাকে আন্দোলিত করতে পারে না। সে তখন গুরুময় হয়ে যায়। তখন তার অবস্থা হয়—যত্র যত্র নেত্র পড়ে, তত্র তত্র গুরু স্ফুরে। তখনই তার প্রকৃত গুরুলাভ হয়। তুমি বলিয়াছ. তোমরা নর্দ্দমার জল। কিন্তু সূর্য্যের রশ্মি সেই জলে পড়িলে তার মলিনত্ব নষ্ট করে। তোমার এই নালাটি যদি বেশ খোলামেলা হয় এবং চালু থাকে, তবে সেখানে পুনঃ ময়লা জমিতে পারে না। ময়লা আসে আবার বহিয়া যায়, তাতে আর পচিতে পারে না। চিত্ত যখন গুরুচিন্তায় বিভোর হইয়া গুরুময় হয়, তখন বাহিরে ভাবরূপ ময়লা আসিলেও তাতে আসক্তি না থাকায় তাকে আর কলুষিত করিতে পারে না।

হাঁ, বাবা, সাধনা মানেই নিজেকে জানা। যখন যে খণ্ডত্ববোধ ত্যাগ ক'রে নিজেকে অখণ্ড, ভূমা বলিয়া বোধ করে তখনই সে নিজেকে শিব বোধ করে। তখন দেখে আমিই বহু হইয়া জগৎরূপে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছি। তখন সে নিজের পদেই ফুল বেলপাতা দেয়। এবং মাত্র তখনই তার চাওয়ার শেষ হয়। সে পূর্ণ হয়। বাবা, তিনি ত কৃপণ নন? "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।" আমরা যে প্রকৃত তাঁকে দেখতে চাই না। তাঁকে সত্য করে দেখতে চাইলে তিনি কি দূরে থাকতে পারেন? ছেলে যখন ব্যাকুল হয়ে সমস্ত খেলা ফেলে 'মা, মা', করে কাঁদে, মা কি তখন আর দূরে থাকতে পারেন? সব কাজ ফেলে ছুটে এসে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে পীযুষধারায় তাঁর শিশুকে পূর্ণ ক'রে দেন। কিন্তু বাবা আমরা তাঁকে ডাকি কই? মনটার এক আনাও ত দিই না। তাতেই বলি, "মাকে ডাকলাম, মা উত্তর দিলেন না ত?" যখন দরদীর টান পড়ে তখন প্রিয়তম না এসে থাকতেই পারেন না। তিনি নিজ মুখে এই প্রতিজ্ঞা করেছেন। তুমি যেমনভাবে তাঁকে চেয়েছ তিনি সেইভাবেই তোমাকে দেখা দিতেছেন। তুমি স্ত্রীরূপে, পুত্ররূপে, কন্যারূপে, সংসাররূপে, 'মাকে' চেয়েছ। মা আমার, তোমার আব্দার রক্ষার জন্য সেই সেইরূপে তোমার কাছে ধরা দিয়াছেন।

তুমি সত্যই বলেছ, আমরা চাই প্রাণনাথকে,— স্বাধ্যকে। কিন্তু বাবা, অগ্নির রূপকে বা তেজকে বাদ দিয়া অগ্নি পাওয়া কি সম্ভব? গন্ধ বাদ দিয়া কি ক্ষিতিকে অনুভব করা যায়? শব্দকে বাদ দিয়া

কি ব্যোমের অনুভূতি কোনদিন হয়েছে? অগ্নির দাহিকাশক্তি বাদ দিয়া অগ্নি কোনদিনই নাই। তোমার প্রেমই প্রেমময়রূপে বর্ত্তমান। তোমার আকাঙ্ক্ষাই আকাঙ্ক্ষিতের রূপ ধ'রে তোমার কাছে আত্মপ্রকাশ করে। এক কথায়, তুমি নিজেই নিজেকে ভালবাস, অন্য কাহাকেও নয়। সেই সেইভাব অন্যত্র আরোপ ক'রে তাকে তুমি ভালবাস। তুমি প্রেমের সাধনা করবে না অথচ প্রেমময়কে পাবে, এ কেমন করে সম্ভব?

তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানবে। এখানে এসে শরীরটা অনেক সুস্থ। তোমাদের কুশলদানে সুখী করিবে। তোমার ভাইভগ্নীদের ভালবাসা জানাবে। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(৩৬)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
২৮।১১।৪৭

পরম স্নেহভাজনেষু—

বাবা, চিদানন্দময় সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীগুরু ভগবানের স্নেহধারায় তোমার অশান্তচিত্ত পরিশ্রুত হইয়া বিমলাশান্তি লাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা করি।

দেখ বাবা, যদি সত্যিকারের কোন জিনষের অভাববোধ আমাদের চিত্তে না জাগে, তা'হলে সেটা পাবার জন্য আমাদের ইচ্ছা বা সাধনা প্রবল হয় না। এবং যদি বিনা আয়াসে তা পাওয়া যায়, আমরা তার যথাযথ মর্য্যাদা দিতে পারি না। তাই সাধকজীবনে সেই অজানাকে পাওয়ার জন্য মন অস্থির হইয়া পড়ে। এতদিন যাদের আমাদের কাম্য ভেবেছিলাম, যারা আমায় সুখশান্তি দিবে বলে আমার বিশ্বাস ছিল, আজ ঘটনাচক্রে বাস্তবে দেখি তারা ঠিক বিপরীত কাজ করছে। শান্তির বদলে সেখানে অশান্তিই পাচ্ছি। এইভাব যখন ঘন হতে ঘনতর হয়ে ঘনতম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই শ্রীগুরু স্থূলে আবির্ভূত হ'য়ে সাধককে 'শিষ্যত্ব' দান করেন 'অমৃতত্ব' লাভের জন্য। তখন চিত্ত সহজেই বৈরাগ্যযুক্ত হয়ে সেই 'আপনজনকে' পাওয়ার জন্য ছট্‌ফট্ করে।

আজ তোমার জীবনে সেই শুভ মুহূর্ত্ত সমুপস্থিত। মাভৈঃ সাধক। শ্রীগুরু স্বয়ং তোমার বিঘ্ননাশ ক'রে তোমায় আনন্দ-ধামের দিকে নিয়ে যাবেন। এখনও দিন কতক এই তাপের মধ্যে কাটাও।

আগামী বড়দিনের ছুটীতে আসবার চেষ্টা ক'রো। তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হবে। তোমার শরীর উপস্থিত কেমন? বৌমা কেমন আছেন? এখানের একপ্রকার কুশল। আশীর্ব্বাদ লও। এই সময়টুকু সৎকথায়, সচ্চিন্তায় অতিবাহিত কর। ক্রমেই চিত্ত প্রিয়তমের স্পর্শ পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে। আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(৩৭)

ওঁ

শান্তিকুটীর
হাজারিবাগ
২৮।১১।৪৭

কল্যাণবরেষু—

বাবা…, জ্ঞানবিজ্ঞানময় সর্ব্বশক্তিমান স্নেহঘন দেবতা শ্রীগুরু ভগবানের আশীর্ব্বাদে তোমার চিত্ত গ্লানিমুক্ত হয়ে প্রেমের নির্ঝরিণীতে স্নাত হয়ে পরমা শান্তি লাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা করি।

সাধন-জগতে একটানা ভাব কোনদিনই নাই। মাঝে মাঝে এরূপ লয় বিক্ষেপ হইবেই। এর জন্য ব্যস্ত হ'য়ে সাধন ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পরন্তু এই সময় যদি আরও অধ্যবসায়ের সহিত শ্রীগুরু প্রদত্ত নাম সাধন করা যায়, তাহলে এই অবস্থা হইতে সহজে ত্রাণ পাওয়া যায়। নচেৎ এইস্থানেই বদ্ধ হইয়া জীবন শেষ হয়। শাস্ত্র ইহাকেই সাধন-ভ্রষ্ট অবস্থা বলেছে। মুনি ঋষিদের জীবনী পর্য্যালোচনা করলে এই অবস্থাই দেখতে পাবে। এই সময় নিয়মিতভাবে নিয়ত গুরু স্মরণ ক'রে অধিক মাত্রায় নাম সাধন কর। আর এটা স্থির জানিও যে-শিষ্য এরূপ-ভাবে অগ্রসর হবার জন্য নিষ্ঠাপূর্ব্বক চেষ্টা করে শ্রীগুরু তাকে

অচিরে কৃপা করেনই। বাবা, ঈশ্বর লাভ করতে হ'লে এই সামান্য পরীক্ষাও সহ্য করবে না? দেখ জীবন-যুদ্ধে অগ্রসর হতে হ'লে কত না বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া অগ্রসর হ'তে হয়। এই অবস্থাও সেইরূপ একটি। ভয় নাই, শীঘ্রই এই অবস্থা কাটিয়া যাইবে। তোমার শারীরিক পরিশ্রম অতি মাত্রায় হওয়াতে, শরীর ও মন দুই-ই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। এ সময় একটু পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজন। যদি সম্ভব হয়, কিছুদিনের ছুটী নিয়া এখানে চলিয়া এস। শরীর ও মন দুইয়েরই বিশ্রাম পাবে। আর গুরুর স্থূল সঙ্গের গুণে সমস্ত দ্বন্দ্বেরও অবসান হবে। পত্রে এর অধিক লেখা যায় না। সাক্ষাতে বিশদভাবে আলোচনা হইতে পারে। আশীর্ব্বাদ লও। আনন্দে থাক। ইতি —

বিশ্বজিৎ

(৩৮)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
১০।১২।৪৭

কল্যাণবরেষু—

বাবা…, সর্বগুণাকর মঙ্গলময় শ্রীগুরুর করুণা তোমার বোধগম্য হউক, ইহাই প্রার্থনা করি।

বাবা, জীব অনাদিকাল হ'তে এই সংসারমায়ায় আবদ্ধ। সেইজন্য সে এই সংসারের প্রকৃতরূপ দেখে যখন তা থেকে ফিরতে চাইল,' তার বহুদিনের অভ্যাস তাকে তখন ছাড়তে চায় না। সেইজন্যই একটা চলতি কথা আছে, "হামতো ছোড়তা হ্যায়, লেকিন কমলি নেহি ছোড়তা"। কিন্তু আর ভয় নাই। যখন শ্রীগুরু একবার কৃপা করে গ্রহণ করেছেন, তখন পার নিশ্চয়ই হবে। তবে প্রত্যেক কার্যেরই তো একটা নিয়ম আছে? যে কোনও কাজ করতে হলে তার একটা সময় লাগবেই, বহু জন্মের সঞ্চিত সংস্কাররাশিও ক্ষয় করবার জন্য তেমনই সময়ের প্রয়োজন। গুরু অনিয়মে কিছুই করেন না। তিনি সমর্থী নিশ্চয়ই, কিন্তু শৃঙ্খলাভঙ্গ তিনি করেন না। তবে যারা নিজের আমিত্ব সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করে, নিজেকে নিঃশেষে শ্রীগুরুতে বিলিয়ে দিতে পারে, শ্রীগুরু তাদের ভোগ নিমেষে নাশ করেন। তথাপি নিমেষও

কালেরই একটা অংশ। এই ভোগের কাল কম বেশী হয়। দেখ, তুমি অপরের সেবা করতে পাচ্ছ না বলে তোমার যে আফ্‌শোষ ইহাও তোমার অহংকারের বা আমিত্ববুদ্ধির লক্ষণ, তোমার ইহার ভিতরও স্বামিত্ব বুদ্ধি রয়েছে। এই স্বামিত্ব বা কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করতে হবে তবেই চিত্ত নির্ম্মল হবে। মাত্র তখনই বুঝতে পারবে যে শ্রীগুরু অহেতুক করুণাময়। তার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবের দোষ দৃষ্টি যায় না। আর দোষ দৃষ্টি না গেলে শান্তি বহু দূরে।

দেখ, কেহ কাহাকেও সুখ বা দুঃখ দিতে পারে না, সকলেই আপন কর্ম্মফল ভোগ করছে। পুত্র আপন কর্ম্মফলে সুখ বা দুঃখ পায়, পিতা তাহার জন্য কোনদিনই দায়ী নন, তুমি তোমার সাধ্য-মত যতদূর সম্ভব তাহার সেবা ক'রে নিশ্চিন্ত থাক।

বাবা, চিত্ত নির্ম্মল হ'লে, দেবদর্শন প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে হ'তে থাকে। দেখ, শ্রীগুরু চিন্তা করতে একটা বিশেষ স্থান বা সময়ের প্রয়োজন হয় না। কারণ, শ্রীগুরু ত সীমাবদ্ধ নন। তিনি যে সর্ব্বব্যাপী। সব নিয়ে যে তিনি। যেটাকে বাদ দিবে সেটাই তুমি গুরুকে বাদ দিবে। অতএব এ বুদ্ধি সব সময়ে রাখবে, "যদ্ যদ্ দৃশ্যতে খলুমেব মাতা।" যা কিছু দর্শন কর, যা কিছু স্পর্শ কর, যা কিছু গ্রহণ কর, এক কথায়, তোমার পঞ্চইন্দ্রিয় সাহায্যে যাহা কিছু গ্রহণ কর– সকলই তোমার গুরু। অতএব আমরা যে বলি, ঠাকুর, তোমায় ডাকবার আমার সময় নাই, এটা একটা মস্ত বড় আত্মপ্রবঞ্চনা। সবাইকে গুরু ব'লে দেখতে শেখ। বাবা

একদিনেই এটা হয় না সত্য, অভ্যাস কর। গীতাতে ভগবান বলেছেন—

অভ্যাস যোগযুক্তেন চেতসা নান্য গামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥

অনুচিন্তা—সবের মধ্যে শ্রীগুরুর সন্ধান, তোমায় একদিন তাঁকে পাইয়ে দেবেই। ওরে তোরা যে অমৃতের সন্তান। তুই আপনজনকে ছেড়ে পরকে ভালবেসেছিস্। তাতেই তো তোর যত দুঃখ। তুই আনন্দময়ের সন্তান হয়ে, আনন্দের উত্তরাধিকারী হ'য়ে ভিখারীর মত ঘুরে বেড়াস? একবার চোখ মেলে দেখ দিকি বাবা, শ্রীগুরু তোদের কত ভালবাসেন। আর তোরা কি কচ্ছিস্! শাস্ত্রে একেই তো আত্মহত্যা বলেছে। যাকে ভালবাসলে অমরত্ব লাভ হয়, তুই তাকে ছেড়ে নামরূপে মুগ্ধ হয়ে রয়েছিস? ওরে যা পরিবর্ত্তনশীল, তা চিরকালই দুঃখদায়ক। "নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্।" আপনাকে বিলিয়ে দে—সেই সর্ব্বময়ের সেবায়। আপনাকে ভুলে বিরাট হ, আনন্দময়ের সেবা ক'রে তুই আনন্দী হ। "রসোবৈসঃ রসংহ্যে বায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।" দেখ শাস্ত্র, গুরু বারবার ক'রে তোদের এই পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন। আর মরীচিকার পিছু পিছু ছুটিস না। এইবার ভোলা মহেশ্বরের মত আত্মস্থ হ।

আশীর্ব্বাদ্ লও, আনন্দে থাক। এ শরীর উপস্থিত কুশলে আছে। আমরা ৬।১।৪৮ তাং রাঁচী হয়ে ঘাটশীলা যাব স্থির করেছি। পরে সমস্ত বিষয় জানতে পারবে। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(৩৯)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ

মান্যবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত…সমীপেষু—
শ্রদ্ধাস্পদেষু—

ওঁ নমো নারায়ণায় ।

আনন্দঘন শ্রীমূর্ত্তির করুণাশীর্ব্বাদ আপনার জীবনের সম্বল হউক এবং সেই অহৈতুকী কৃপা আপনার জীবনের চলার পথে একমাত্র সাথী হউক—ইহাই প্রার্থনা করি।

আপনার পত্রখানি পাঠে পরম প্রীতিলাভ করিলাম। আপনি পণ্ডিতপ্রবর এবং শাস্ত্রজ্ঞ। আপনাকে অধিক লেখা বাতুলতা বলিয়াই মনে হয়। তবে পরম কারুণিক শ্রীগুরু নারায়ণ কৃপা করিয়াই এই ক্ষুরধারাবৎ দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব যাহা যতটুকু অনুভব করাইয়াছেন তদ্দ্বারা আপনার সন্দেহ নিরসন করার মতন দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হইলাম। গুরু বিশ্বনাথ আমার সহায় হউন। সিদ্ধিদাতা গণেশকে, ত্রিকালজ্ঞ ঋষি ব্যাসদেবকে প্রণাম করিয়া বলিতেছি—

মন্ত্র শব্দে মনকে যাহা ত্রাণ করে, ইহাই উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রবাক্য বা গুরুবাক্যই হইতেছে 'মন্ত্র'। অতএব এই মন্ত্র বৈদিকই

হউক আর তান্ত্রিকই হউক, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত অনুশীলন করিতে পারিলে উভয়ই ফলপ্রদ হইয়া থাকে। তন্ত্র শাস্ত্র বেদ বহির্গত নহে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডই হইতেছে 'তন্ত্র', গুরুই হইতেছেন বেদ বা শিব (মঙ্গল), কাজেই বৈদিক মন্ত্রও যেমুখনিঃসৃত তান্ত্রিক মন্ত্রও তাহাই। অতএব এ বিষয় কোনরূপ সংশয় চিত্তে না রাখিয়া শ্রদ্ধা ও প্রেমের সহিত যে কোন মন্ত্রই অনুষ্ঠান করা যাউক না কেন, উভয়ই ফলপ্রদ, তবে এই অনুষ্ঠান-প্রণালী সদ্গুরু প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাবান হৃদয়ে প্রেমযুক্ত হইয়া অনুষ্ঠান করিতে পারিলে মন্ত্র ফলপ্রদ হইয়া থাকে, ইহাই আমার জানা আছে। আপনার হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও প্রেম যথেষ্টই আছে। জীবন ত্যাগ করিবার কোন কারণই নাই। সেই জীবননাথকে, সেই জীবিতবল্লভকে বিশেষরূপে জানিবার পূর্ব্বেই জীবনত্যাগ করিবার বাসনা দুর্ব্বলতারই পরিচায়ক। আপনাদের সেবা করিবার জন্যই এ-জীবন উৎসর্গিত হইয়াছে, আপনি যদি কৃপা করিয়া আপনার সেবার ভার এ দীনের হস্তে অর্পণ করেন তাহা হইলে নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করিবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—শ্রোত্রীয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুসমীপে এই বিদ্যা লাভ করিতে হয়। এই শরীর একনিষ্ঠ কিনা জানি না, তবে এ শরীরকে অবলম্বন করিয়া কৃপা করিয়া যিনি উপদেশাদি দেন, তিনি ব্রহ্মই। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যতীত কেহ আচার্য্য হইতে পারেন না। আচার্য্যবান্ পুরুষঃ বেদ।" পত্র-লিখিত প্রশ্নাদিতে সমস্ত বিষয় সমাধান সম্ভবপর নহে। তবে আপনি যদি দয়া করিয়া একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া,

শরীরটাকে লইয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলে আলোচনাদির দ্বারা আপনার সন্দেহ দূর করিতে সচেষ্ট হইতে পারি।

অধিক আর কি লিখিব, আপনাদের নিত্যকুশল সর্ব্বদা কামনা করি, পত্রোত্তরে আপনার সংবাদ জানিতে পারিলে সুখী হইব।

নিবেদনমিতি— আশ্রব—

শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বজিৎ ব্রহ্মচারী

(৪০)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
২৫।২।৪৮

প্রাণাধিকেষু—

বাবা…, স্নেহঘন অন্তর্দেবতার স্নেহ ও করুণাধারা তোমাকে আজীবন অভিস্নাত করুক, ইহাই কামনা করি। সেই সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীগুরু ভগবানের কৃপাশীর্ব্বাদ তোমার জীবনে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠুক। সেই প্রেমঘন দেবতার প্রেমবারিস্রোতে তোমার জীবন-তরণীখানি ভাসিতে ভাসিতে এমন একটী স্থানে চলিয়া যাউক যেস্থানে অভাবের লেশমাত্র অনুভব হয় না।

বাবা, তোমার পত্রখানি পাইয়া কত যে সুখ অনুভব করিতেছি তাহা ভাষায় লিখিতে পারি না, পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় ৺পিতৃশ্রাদ্ধ সুশৃঙ্খলায় সুসম্পন্ন হইয়া গেল জানিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। যে-সাধক নির্ব্বিচারে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে শ্রীগুরুচরণে অর্পিত বলিয়া অনুভব করিতে সক্ষম হয়, সে প্রতি-মুহূর্ত্তেই উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার জীবনের প্রতিটি কর্ম্মই, তাহার জীবনদেবতা কেমন ক'রে সুনিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। অনন্ত-মুখীন জগৎ অনন্ত ভাবধারা লইয়া অনন্তকাল হইতে আপন গতিতে ধাবিত হইতেছে। সেই উন্মাদগতির ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া জীবনিচয় ও

অনন্তকাল ধরিয়া হাবুডুবু খাইতেছে। যে ভাগ্যবান এই সমুদ্রবক্ষ হইতেই উত্থিত উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রবক্ষস্থিত কোন এক মৈনাককে আশ্রয় করিতে পারে তাহা হইলে সমুদ্রে যতই তরঙ্গ উঠুক না কেন সেই মৈনাকআশ্রিত জীবের কোনই ক্ষতি করিতে পারে না। সেই মৈনাকই সমস্ত তরঙ্গগুলিকে নিজ বক্ষে মিলাইয়া লন, ইহাই দেখা যায়। প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া যখন সমগ্র দেশকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতেছে, সেই সময় যদি কোনক্রমে কোন বট-বৃক্ষকে কেহ আশ্রয় করিতে পারে, তাহা হইলে দেখা গিয়াছে, সমগ্র দেশ বিধ্বস্ত হইয়া গেলেও সেই বৃক্ষাশ্রিত জীবের কোনই ক্ষতি হয় নাই। নদীবক্ষে ভয়াবহ বন্যায় যখন সমগ্র দেশকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে তখন গভীর ভিতযুক্ত কোন এক উচ্চগৃহ প্রাচীরের উপর কেহ যদি আশ্রয় লয় তাহা হইলে সেও রক্ষা পায়। কাজেই যাহা স্বতঃসিদ্ধ তাহাই যে ঘটিয়াছে। হও বাবা এইরূপে শ্রীগুরুতে বিশ্বাসপরায়ণ। কর নিজেকে নিমজ্জিত গুরুপ্রেমে। জীবনের যেটা সর্ব্বাপেক্ষা মূলকামা তাহাই কামনা কর।

এই সংসার সমরাঙ্গনে তোমরা যুদ্ধ করিতে নামিয়াছ, সৈনিক তোমরা, সেনাপতির নির্দ্দেশ নির্ব্বিচারে পালন করাই তোমাদের ধর্ম্ম। সেখানে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা সৈনিকের নহে, তাহার সেনাপতির। সৈনিকের ধর্ম্ম নির্ব্বিচারে সেনাপতির নির্দ্দেশ পালন। নির্দ্দেশের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন প্রশ্নই সৈনিকের বুকে জাগা উচিত হয় না। এইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ সৈনিক হইলে যুদ্ধজয় অবশ্যম্ভাবী।

এইবার তোমার পত্রের উত্তর দিতেছি শোন—বিভূতি বিশুর নামে যাহা কিছু বলিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার বিবেচনায় কাহারও বিরুদ্ধে কোন কিছু শুনিয়া কোনও opinion form করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। নিজ কানে না শুনিয়া, নিজ চোখে না দেখিয়া কোন কিছু মত পোষণ করিলে পরে অনুতাপ করিতে হয়। বিশু সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি বা বুঝি, তাহার দ্বারা বলিতেছি, সে খুবই ভাল ছেলে এবং ইহা আমি জোরগলায় বলিতে চাই যে সে আশ্রম ও আশ্রমাচার্য্যের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা প্রেম ও বিশ্বাস-যুক্ত। অতএব আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি তাহার সহিত তুমি সহোদরাধিক প্রীতিভাবাপন্ন হইবে এবং সে তোমার পরম হিতাকাঙ্খী, প্রাণপ্রিয় বন্ধু ও স্নেহপ্রবণ সহোদর ভাই। তোমাতে এবং উহাতে একপ্রাণযুক্ত হইয়া, একবৃন্তে দুটি ফুলের মতন, আমার বক্ষে বিরাজ কর ইহাই আমি কামনা করি। আশা করি তোমার পত্রের সকল উত্তরই বিশদভাবে দিলাম। ৺শিবরাত্রের সময় যদি আসিতে পার চেষ্টা করিও। সাক্ষাতে সবিশেষ নির্দ্দেশ পাইবে। আমার বলার ইচ্ছা ছিল তোমার যদি চাকুরি করিবার ইচ্ছা থাকে তবে চাকুরি করিবে। নিজকে বেশ করিয়া বিচার করিয়া দেখিও অন্তর কি চায়? মায়ের সেবা দরকার, ইহাই আমার মনে হয়। ৺সরস্বতী পূজা বা অন্যান্য সংবাদ বিশু ও সাধনের কাছে শুনিও। এ শরীর একরূপ। আশ্রমস্থ অন্যান্য মঙ্গল জানাইও। তোমার মার শরীর মোটেই ভাল নয়। পত্রপাঠ পত্র দিও। আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্বজিৎ।

(৪১)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম।
হাজারিবাগ
৩।৩।৪৮

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিশেষ —

স্নেহের..., সচ্চিদানন্দঘন শ্রীমন্নারায়ণের স্নেহ ও করুণাধারায় তোমার জীবনের চলার পথ পরিস্রুত হউক। সেই চিদ্‌ঘন দেবতার চিৎ-জ্যোতিতে তোমাদের অন্ধকারময় চলার পথ আলোকিত হইয়া উঠুক।

তোমার ২৩।২।৪৮ ও ২৫।২।৪৮ তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। একটু ব্যস্ত থাকায় পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। আশা করি, সেজন্য তুমি কিছু মনে করিবে না। তোমার পূর্ব্বপত্র অর্থাৎ ১২।২।৪৮ তাং এর লেখা পত্র আমি আজও পাই নাই। যাক্, এবার তোমার পত্রের উত্তর দিতেছি—

১। তোমার বন্ধুবর শ্রীমান্ মনীন্দ্রনাথ গুহের বিপদ আশা করি তাঁর কৃপায় বহুলাংশে সরল হইয়া গিয়াছে। তাঁর উপস্থিত অবস্থা জানিবার ইচ্ছা আছে।

২। 'উষার' কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে কথঞ্চিৎ পাইলে কি? কিছু পাওয়ার আশা, যৎকিঞ্চিৎ তোমার পাওনা অনুপাতে কিছু পাওয়ার আশা আছে। তাগিদ রাখিয়া যাইও।

৩। তুমি ঠিকই লিখেছ, ইদানীংকালে অর্থ ছাড়া যথাযথভাবে বাস করা অসম্ভব। অর্থ, উপার্জ্জনের দ্বারাই আসিয়া থাকে। এই উপার্জ্জনের ক্ষমতা শিক্ষা ও সামর্থ্য অনুপাতে না হইলেও একদম আসে না এমন হয় না। কিছু না কিছু আসিয়াই থাকে। কাজে কাজেই তোমাদের মতন সঙ্কল্পযুক্ত লোকের পক্ষে misfit কথাটা ব্যবহার ঠিক নয়। কারণ, তোমরা কর্ম্মী। যাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মী, তাঁহাদের কাছে impossible কথাটা, misfit কথাটা একেবারেই Greek হওয়া উচিত। misfitকে fit, impossibleকে possible করতে পারিলেই প্রকৃত কর্ম্মী হওয়া যায়। আমার যতদূর জানা আছে তাহার দ্বারা ইহাই বলিতে চাই তুমি কোনদিনই কাহারও গলগ্রহ হইয়া থাকিবে না। অবশ্য ২।৪ দিনের কথা ছাড়িয়া দাও। চেষ্টা রাখিয়া যাও; শীঘ্রই তোমার জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে।

৪। জীবনের চলার পথে পিতামাতার আশীর্ব্বাদ বর্ম্ম-স্বরূপ হইয়া থাকে। তোমার মা তোমাকে দিয়া অবশ্যই সুখী হইবেন; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ-ই নাই। তোমার উপর যে দায়িত্ব তিনি দিয়াছেন, সেই দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করিবার সামর্থ্যও তিনিই দিবেন।

৫। তুমি তাঁর উপর নির্ভর করিয়া থাক। তোমার মনের অবস্থা তাঁকে জানাও। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাও। তাঁর আশীর্ব্বাদই তোমার হাত ধরে নিয়ে যাবে। অতএব তাঁর উপর নির্ভর করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিবে।

৬। জগতের সকল কাজই তাঁরই কাজ। এই বোধেই যদি বুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পার, এই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জীবনের সকল কর্ম্মধারাকে যদি চালিত করিতে পার, তাহা হইলে আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবেই হইবে।

৭। তোমার ঢাকা প্রসঙ্গ সম্বন্ধে বলিতেছি, তোমার মার কোন একটী positive reply পেলে ঢাকা যাবার ব্যবস্থা করিবে। যাইবার পূর্ব্বে যাহাতে কিছু অর্থ পুঁজি করিতে পার, সে বিষয়ে চেষ্টা করিবে। গুরু কৃপা তোমার সম্বল হউক।

৮। দেখ, ভালবাসা যেখানে খাঁটী উভয়-পক্ষেই সেখানে কোনদিনই কোন ফাঁক থাকিতে পারে না। ভালবাসার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। খাঁটী ভালবাসার প্রমাণ হচ্ছে—'ত্যাগ'। অর্থাৎ তুমি তাহার জন্য কতখানি ত্যাগ করিতে পারিয়াছ এবং সে কতখানি তোমার জন্য ত্যাগ করিতে পারিয়াছে। ত্যাগ—to the sense বাসনা এবং কামনা। আরও পরিস্কার করিয়া লিখি। তোমার ছেলেবেলা হইতে কতকগুলি আশা এবং আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং সেই আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়াই তুমি কাজ কর। এখন তোমাদের মিলিত জীবনে দেখিলে, তোমার যে Partner, তাহার প্রকৃতি কতকাংশে তোমার আশার অনুরূপ নহে এবং ইহা খুবই স্বাভাবিক। কেন না এ জগতে তথা সৃষ্টি মধ্যে কোন দুটী প্রকৃতিই একরকমের হতে পারে না। কিছু না কিছু অমিল থাকিবেই। কাজেই ঐ আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা

উভয়পক্ষেই প্রযোজ্য। অতএব যে জায়গাটায় তোমার অমিল ঠেকে, তাহার প্রীত্যর্থে তুমি প্রকৃতির সেই অংশটা উপেক্ষা করিবে এবং তাহার দিক থেকেও উহা প্রযোজ্য। এইরূপ যদি করিতে পারা যায়, তাহলে কোনদিক থেকেই কোনদিন গোলমাল হ'তে পারে না। তুমি তাহার সম্বন্ধে, তাহার প্রকৃতির যে অংশটি লিখিয়াছ উহা তাহার প্রকৃতির একটা অংশ মাত্র। উহার মধ্যে seriousness বিশেষ কিছুই নাই। উহার মনের ঐ অংশটি তুমি না ধরিলেও পার। তাহা হইলে তোমার দুঃখের কোন কারণই আর থাকিতে পারে না। ইহার স্বপক্ষে তোমাকে আর একটী যুক্তি দিতেছি। দেখ, কেহ কোনদিনই কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালবাসে না। সে ভালবাসে তাহার মনের ঐ ভালবাসারূপ ভাবটিকে। তাহার অন্তরের ঐ ভালবাসা বোধটিকে বাহিরের কোন এক ব্যক্তি বা বস্তুর উপর আরোপ করিয়া সে ভোগ করিয়া থাকে। ইহাই ভালবাসার স্বরূপ। কাজেই তুমি যখন তোমার ভালবাসাটাকেই ভালবাস, তখন বস্তু বা ব্যক্তির প্রকৃতিগত ব্যবহারের সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ? তুমি নিজ ভালবাসায় নিজেই মশগুল হইয়া থাকিবে; ইহাই ত নিয়ম। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে মৌখিক আলোচনা করাই ভাল। ইহার পর তোমার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হইবে তখন বিশদভাবে আলোচনা করা যাইবে। আজ এই পর্য্যন্ত থাক। তোমার জীবনসঙ্গিনী তোমার মনের অনুকূল হউক ইহাই আশীর্ব্বাদ করি।

তোমার দ্বিতীয় পত্রখানি (২৫। ২। ৫১ তাং এর) খুবই সুন্দর।

আমার খুবই ভাল লাগিয়াছে। পত্রখানিতে তোমার অন্তরের ভাবগুলি রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি, পত্র-লেখা ভাবধারার উপর তোমার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হউক। জীবনে কৃতকর্ম্মী হও। শিবমস্তু। জয়গুরু। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(৪২)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
১।৫।৪৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

শ্রীযুক্ত······সমীপেষু—

আপনার ২৫।৪৪৮ তারিখের লিখিত একখানি পত্র ৩০।৪।৪৮ তারিখে আমার হস্তগত হয়। পত্রপাঠে আপনার সংবাদ জানিলাম। আপনার পুত্র শ্রীমান্······এখানে থাকিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেছে। এবং এই উদ্দেশ্যেই সে তাহার কর্ম্মস্থল হইতে কয়েক মাস ছুটি লইয়াছে, ইহাই আমাকে বলিয়াছে। এখানে থাকা বা কর্ম্মস্থল হইতে ছুটি লওয়া সে তাহার পিতামাতার অনুমতিক্রমেই করিয়াছে, ইহাই আমি জানি। সে যাহাতে আপনাদের সহিত নিয়মিতভাবে পত্রাদিদ্বারা সংবাদাদি আদান-প্রদান করে সে সম্বন্ধেও তাহাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং সে নিয়মিতভাবে তাহাই করিয়া থাকে বলিয়াই আমার জানা আছে।

পিতামাতার অসন্তুষ্টি উৎপাদন করিয়া বা পিতামাতাকে কষ্ট দিয়া কাহারও কোনদিন কোন ধর্ম্মজীবন লাভ হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। এ আশ্রমের সকল সন্তানকেই ইহাই উপদেশ দেওয়া হয় যে, পিতামাতা বা অভিভাবকগণের সন্তোষ বিধান

সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আমার মনে হয় বা আমার বিশ্বাস সকল পিতামাতাই চাহেন যেন তাঁহাদের পুত্র সদ্ভাবে থাকিয়া শাস্ত্রীয় নীতি অনুযায়ী ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া জগতে আদর্শ গৃহস্থ হইতে পারে। একজনের জীবন যদি ধর্ম্মের আদর্শ অনুযায়ী গঠিত হয় তাহা হইলে তাহার বংশে অনেকেই সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদের নিজ নিজ জীবন গঠন করিবে বলিয়া আশা করা যায়। আমার এই যুক্তিই যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে প্রথমে নিজ জীবনকে সেই আদর্শের ছাঁচে ফেলিয়া গঠন করিতে হইবে। কোন কিছু জ্ঞানার্জ্জনের জন্য কোন একটী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে হয়, নচেৎ শিক্ষালাভ সম্ভবপর হয় না। সেইকারণেই আমার মনে হয়, ছেলেরা মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া কয়েক দিন করিয়া থাকিয়া নিজ নিজ জীবন গঠন করিবার প্রয়াসী হয়। এই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত পিতা-মাতাগণ অবশ্যই চাহেন যেন তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিগণ ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া সৎপথে থাকিয়া সৎভাবে নিজ নিজ জীবন যাপন করিতে পারে, ইহাই আমার বিশ্বাস। অবশ্য ইহা মনে হয় যে, পিতামাতাকে অবজ্ঞা করিয়া ধর্ম্মজীবন লাভ করুক, যাহা কোন দিনই সম্ভব নয়।

জগতে মানুষ হ'তে গেলে ধর্ম্মজীবন লাভ একান্ত প্রয়োজন। সনাতন হিন্দুর প্রাণই হচ্ছে ধর্ম্ম। ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবৃত্ত হইলে সে সংসারে সুখ এবং শান্তি অবশ্যই বিরাজ করিবে বলিয়া আমার ধারণা।

সন্ন্যাসী হওয়া সহজসাধ্য নয়। আমি নিজেই এখনো সন্ন্যাসী হইতে পারি নাই। সংসারত্যাগ করিলাম বলিলেই ত্যাগ করা সম্ভব নয়। যথার্থ বৈরাগ্য বহু আয়াসসাপেক্ষ। বহু জন্মের সুকৃতির ফলে জীবের বৈরাগ্য আসে। কাজেই তাহার সন্ন্যাসী হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। যাক, এ সম্বন্ধে আর অধিক কি লিখিব। আপনি বহুদর্শী এবং সুবিজ্ঞ, আপনাকে অধিক লেখা বাহুল্যমাত্র।

আপনারা চিন্তিত হইবেন না। শ্রীমান..............কে আমি দুই একদিনের মধ্যেই পাঠাইয়া দিতেছি। সে উপস্থিত একটা ফোঁড়া হইয়া কষ্ট পাইতেছে। একটু সুস্থ হইলেই সে তাহার পিতামাতার শ্রীচরণদর্শন উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবে। আপনাদের নিত্য কুশল কামনা করি। ইতি—

শ্রীবিশ্বজিৎ ব্রহ্মচারী

(৪৩)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
২৪।৭।৪৮

পরমস্নেহভাজনেষু—

মা কল্যাণী আমার, স্নেহঘন শ্রীগুরু ভগবানের স্নেহ করুণাধারায় অভিস্নাতা হও মা, ইহাই প্রার্থনা করি। তোমার কয়েকখানি পত্রই পাইলাম, শরীর বিশেষ অসুস্থ থাকায়, তোমার পত্রের উত্তর দিতে আমার কিছু বিলম্ব হইল। পাছে তুমি দুঃখিত হও, সেই কারণে আমি ফণীকে বলিয়াছিলাম, আমার অসুস্থতার সংবাদ তোমাকে দিতে। এবং সেও তোমাকে পোষ্টকার্ডে-এ সংবাদ দিয়াছিল। আশা করি, তাহা পাইয়াছ।

তোমার পত্রের মর্ম্মে ইহাই বুঝিয়াছি,—তুমি তোমার স্বামী ও সন্তানাদি কর্ত্তৃক যে-জাতীয় সুখের প্রত্যাশা কর তাহা আজও পর্য্যন্ত পাও নাই। এবং সেই কারণে তোমার শরীর ও মন ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ফলে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও জগন্নাথ উভয়ের প্রতি একটা বিদ্বেষভাব তোমার মনে ঘন হইয়া উঠিতেছে।

মা, এ-জগতে জীব ত্রিতাপ জ্বালায় বা ত্রিবিধ দুঃখে অনবরত জ্বলিতেছে। প্রতিটি জীবই এই ত্রিবিধ দুঃখের কোন না কোন

একটির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। এই যে তিনটি দুঃখ ইহা যথাক্রমে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক নামে কথিত হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ দুঃখ সম্বন্ধেই আমি বলিব:— আধ্যাত্মিক দুঃখ—ইহা আত্মা হইতে জাত। অর্থাৎ রোগ, শোক ইত্যাদি। আধিদৈবিক দুঃখ ইহা দৈব হইতে জাত, যথা— বজ্রাঘাত, বন্যা, রেল দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প ইত্যাদি হইতে জাত। আধিভৌতিক দুঃখ—ইহা প্রাণী হইতে জাত, যথা—সংসারে পতি, পত্নী, পুত্রকন্যাদি, আত্মীয় ইত্যাদি, বন্ধুবান্ধব দ্বারা শৃগাল কুকুর ইত্যাদির দংশনজনিত প্রভৃতি দ্বারা জীব যে-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। এখন জীব এই ত্রিবিধ দুঃখের কোন না কোন একটির দ্বারা অহর্নিশি কষ্ট পাইতেছে। ইহা তো বুঝিলাম, এখন এই দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় কি? ইহার উত্তরে হয়ত এইরূপ উপদেশ আসিতে পারে ভগবানের স্মরণ লও; ভগবৎ সাধনা, উপাসনা কর ইত্যাদিরূপ বড় বড় কথা; শ্রুতিমধুর উপদেশাবলী বলিতে বেশ, শুনিতে ভাল, কিন্তু পালন করিতে শক্ত যাহা তাহাই আমাদের উপর বর্ষিত হইয়া থাকে। আমি কিন্তু এইরূপ উপদেশ দিই না। আমার বিশ্বাস, এই দুঃখের মূল তত্ত্বটীকে অর্থাৎ কোথা হইতে এই দুঃখ আসে, ইহা যদি বুঝা যায় বা জানা যায়, তাহা হইলে দুঃখ যত জোরেই আমাদের কাছেই আসুক না কেন, আমাদিগকে খুব বেশী উদ্বিগ্ন করিতে পারিবে না, ইহা আমাদের কাছে তীব্র বেদনারূপে আবির্ভূত হয় তখনই, যখনই আমাদের বুদ্ধি মূলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া আগার দিকে ধাবিত হয়। শোন, আর একটু খুলে

বলি,—মনে কর, তুমি তোমার স্বামীর কাছ হইতে দুঃখ বা বেদনা পাইলে, এখন তুমি ভাবিলে, তোমার স্বামী তোমায় দুঃখ বা বেদনা দিল এবং তজ্জনিতই তোমার দুঃখ হইল, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা কি হইল দেখ। তুমি স্বামীর কাছ থেকে যেরূপ-ভাবের ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তাহারই বিপরীতভাবে তোমার কাছে আসে যখনই, তখনই তোমাকে দুঃখ বা বেদনা দেয়। এখন এই যে তুমি একটা ব্যবহারের আশা করিলে—এই ব্যবহারটী পাইবার আশা তোমার প্রকৃতিগত হইবে। কিন্তু সে হয়তো ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই দিয়াছে এবং তাহা তাহারই প্রকৃতি অনুযায়ী হইয়াছে। এখন তোমার প্রকৃতিতে ইহা মানিয়া লইল না, কাজেই তুমি দুঃখ পাইলে। এখন কোন একটি প্রকৃতি অপর একটি প্রকৃতির সমান কখনই হইতে পারে না,—"ভিন্নরুচি হি মানবাঃ।" তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি কি, এই দুঃখের মূল কারণ আমাদের "আশা।" শাস্ত্রে আছে—"আশাহি পরমং দুঃখং, নৈরাশ্য পরমং সুখম্" এজগতে সকল আশা কাহারও কোন দিনই পূর্ণ হয় না, এবং এই আশাও আমার নিজ প্রকৃতি-সঞ্জাত। অতএব আমার প্রতিটি চাহিদাই আমার প্রকৃতিগত হয় এবং আমার প্রতিটি গ্রহণও আমার প্রকৃতিগত হয়। আরও পরিস্কার করিয়া বোঝ। আমার চাহিদা অন্যের প্রকৃতিগত হইবে না এবং গ্রহণও অন্য প্রকৃতিগত হইবে না। রবিবাবু ঠিক জীবের অন্তরের এই অবস্থাটী লক্ষ্য করিয়াই একটী কথা লিখিয়াছেন—

"জেনো এই সুখে দুখে আকুল সংসারে,
মেটে না সকল তুচ্ছ আশা ;
(তা বলিয়া) অভিমানে, অনন্ত তাঁহারে,
ক'রো না ক'রো না অবিশ্বাস।
সুখ ব'লে যাহা চাই সুখ তাহা নয়,
কি যে চাই জানি না আপনি ;
আঁধারে জ্বলিছে, ঐ ওরে ক'রো ভয়
ভুজঙ্গের মাথার মণি!"

এই যে মণি ও ভুজঙ্গ, এই দু'টি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং ইহাকেই ভয় করিতে বলিতেছেন। এটির তাৎপর্য্য হইতেছে কি যে, ইত্যাদিরূপ চাহিদা ও গ্রহণ উভয়ই নিজ নিজ প্রকৃতিগত হইয়া থাকে এবং এই উভয় অবস্থাই অজ্ঞানতাপ্রসূত। আমরা যে কি চাইছি তা আমরা নিজেরাই জানি না, অথচ আমরা চেয়ে আছি। যে জিনিষটা আমাদের চাহিদার বস্তু সেটা যে কি জিনিষ তাহা আমরা নিজেরাই জানি না।

অতএব যাহা কিছু সমস্তই আমাদের অজ্ঞানতাপ্রসূত। সেই কারণেই কবি বলিতেছেন যে, ঐ আঁধাররূপ অজ্ঞানতার ভিতরেও যে জ্ঞানরূপ আলো আছে, অশুভের মধ্যেও যে শুভ লুক্কায়িত আছে, সেইটুকু লক্ষ্য করিলেই মিটে যায়, ইহাই আমার মনে হয়। দেখ মা, আমরা সুখ চাই, শান্তি চাই, আনন্দ চাই—এ-বিষয়ে কোন ভুল নাই। চাই বটে কিন্তু কেমন ক'রে চাইলে পাওয়া যায়, তাহা আমাদের জানা নাই। সেই কারণেই আমাদের প্রতিটি

আশা আমাদের ইচ্ছামত মেটে না। দেখ, একটু বুদ্ধি খরচ করে চাইলেই সব মিটে যায়। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, কাজেই তোমার কাছে আমি এই সব যুক্তি দেখাইতেছি, তুমি নিশ্চয়ই বুঝিবে। শোন--

"সুখ শুধু পাওয়া যায়, সুখ না চাহিলে
প্রেম দিলেই প্রেমে পুড়ে প্রাণ ;
নিশি নিশি আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাহি অবসান।"
"অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে
মানে না বাহুর আক্রমণ ;
একটী আলোক শিখা সমুখে ধরিলে
নীরবে করে সে পলায়ন।"

অতএব মা, ইহাই যদি ভালভাবে বোঝা যায়, যদি ভালভাবে চিন্তা করা যায়, তবে দুঃখ বলিয়া কিছু থাকে না। সংসার সুখময়, শান্তিময় হইয়া যায়। আশা করি, এই চিঠিখানিতেই তোমার প্রত্যেক চিঠির উত্তর হইয়া গেল।

তোমার মেয়েদের বিবাহ না দেওয়া পর্য্যন্ত লেখাপড়া করানই ভাল। কারণ, তাহাদের বয়স হইয়াছে। কেবল গৃহস্থালী কর্ম্মে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে অন্যরূপ ফল হইতে পারে। অতএব...... সম্বন্ধে ইহাই বলিতে চাই Matric পাশ করিয়া তাহার ডাক্তারী পড়া হইবে না। কাজেই তাহাকে বছর দুই এক আরও কলেজে পড়িতে হইবে। অতএব উহাকে কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলে

ভাল হয়। অবশ্য, তুমি মা, তুমি তাহাদের সম্বন্ধে যতটা ভাল বুঝ, তাহাদের পিতাও তাহাদের সম্বন্ধে ততটা ভাল বুঝে না। অতএব, তুমি যাহাই ভাল বিবেচনা করিবে, তাহাই করিবে। তোমাকে আর একটি কথা লিখিতেছি। আশাভঙ্গজনিত অতটা রেগে যাও কেন? একটু ধৈর্য্য ধরা উচিত। আমি মানি যে তুমি সহ্য ক'রে ক'রে এখন সীমা অতিক্রম করিয়াছ। উপরন্তু তোমার শরীর ও মন উভয়ই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কাজেই এখন আর তুমি সহ্য করিতে পার না। কিন্তু মা, একটি জিনিষ জানিও, ধৈর্য্যের কোন সীমা নাই, সীমাবদ্ধ সত্তা ধৈর্য্য নামে উক্ত হইতে পারে না। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পৃথিবী। ধৈর্য্য ধরিতে পারিলে একটা মস্ত বড় উপকার আছে। ধৈর্য্যের দ্বারা ঘটনার ভাল মন্দ উভয় দিকই পরিস্ফুট হইয়া উঠে; এবং অধৈর্য্যতার ফলস্বরূপ যে ক্রোধরূপ চণ্ডাল জীবকে আশ্রয় করিয়া মনুষ্যত্ব হইতে পশুত্বে পরিণত করে, তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়।

"ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ, ক্রোধে কুলক্ষয়
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয়, ক্রোধে অপচয়।"

অতএব মা, এই ক্রোধের দ্বারা তোমার কর্ম্ম ভাল কি মন্দ ইত্যাদি বিবেচনাশক্তি হ্রাস পায়। ফলে, জীব (পুরুষ কি স্ত্রী) একটা অবাঞ্ছনীয় কর্ম্ম করিয়া বসে। ফলে, তাহার জীবনটা জগতের সামনে একটা bad example হইয়া দাঁড়ায়। অতএব সংসারে থাকিতে গেলে উভয়েরই উভয়ের পক্ষে কতকটা ত্যাগ ও কতকটা গ্রহণ—এইভাবে চলিলেই কতকটা সামঞ্জস্য হয়

বলিয়া আমার মনে হয়। জোর করিয়া কাহারও কাছ থেকে ভালবাসা আদায় করা যায় না। যদি ভালবাসা পাইতেই হয়, তাহা হইলে নিজ প্রকৃতির কতকটা অন্যের প্রকৃতির সঙ্গে মিলাইয়া দিতে হয় এবং অন্যের প্রকৃতির কতকটা নিজ প্রকৃতির সঙ্গে মিলাইয়া কাজ করিলেই কতকটা শান্তি স্থাপন হয়। ইংরাজীতে একটী কথা আছে—"Two lions cannot live in a cage." -দুই সিংহ এক খাঁচায় বাস করিতে পারে না। "তোম্‌ভি মিলিটারী, হাম্‌ভি মিলিটারী" হইলে ঝগড়াই অবশ্যম্ভাবী। আর অধিক কি লিখিব। পত্রোত্তরে তুমি আমার কাছ থেকে যাহা পাইতে চাও, তাহা পাইতেছ কি না জানাইলে সুখী হইব। ইতি—

বিশ্বজিৎ।

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম।
হাজারিবাগ
২৫।৭।৪৮

কল্যাণীয়াষু —

ভাই..., দাদুর স্নেহাশীষ লও। তোমার কয়েকখানা পত্রই পেয়েছি, আবার পত্রের উত্তরও দিয়েছি। আশা করি এতদিনে তা পেয়েছ। এ বৎসর থেকে সমস্ত Medical School উঠে গিয়ে Medical Collegeএ পরিণত হয়েছে এবং তাতে পড়তে হলে lowest standard হচ্ছে I. Sc. with Biology. এজন্য আমার ইচ্ছা তুমি দুই বৎসর I. Sc. পড়ে নাও। তোমার বাবা ও মাকেও আমি সেইমত ব'লে দিয়েছি। বর্দ্ধমানের Medical School টা abolished হয়ে তাতে এ বৎসর থেকে Health Visitor এবং Nursing শিক্ষা দেওয়া হবে।

তুমি শেষ পত্রে যে বিষয়ের উল্লেখ করেছ তা জানলাম। আমি কলিকাতায় নিশ্চয়ই যাব, তবে কোনও বিশেষ কারণে এ সপ্তাহে হয়ে উঠবে না। যত শীঘ্র সম্ভব যাব। মনে রেখো ভাই, ভগবান মাত্র একস্থানেই আবদ্ধ নন। স্মরণে রেখো তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান। তিনি সতত্ই তোমাদের সাথে সাথে রয়েছেন এবং তোমাদের রক্ষা করছেন। তোমরা একলা কোন সময়েই নও। সকলে আপন আপন বৃত্তিরূপ কথা বলে।

ভাষা ভাবেরই বাহন। সাধারণ সকলে ঐরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন। তাই বলে বস্তু কি কোনদিন পরিবর্ত্তিত হয়? সে যা, ঠিক তাই থাকে। তোমরা আমার হাতে তৈরী সৈনিক। বীরের মত সমস্ত ঘটনার সম্মুখীন হও। আজ তোমাদের সামনে যেরূপ ঘটনা উপস্থিত হয়েছে, তাতে বীরের মত জয়ী হওয়াই হবে শ্রীগুরু আশ্রমের সৈনিকের উপযুক্ত। মা ভৈঃ। ঐ শোন ভগবান পাঞ্চজন্যের গভীর নিনাদে তোমাদের জাগিয়ে বলছেন, "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ! নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।" তুমি ক্লীব নও - তুমি মহান্। তোমার মধ্যে এই ঘটনা অতিক্রম করার শক্তি রয়েছে। মাত্র জাগো, নিজকে চেনো, শ্রীগুরুর প্রকৃত সন্তান বলে নিজকে জগতের সামনে প্রমাণিত কর।

এ শরীর উপস্থিত ভালই আছে। আশ্রমস্থ অন্যান্য কুশল। একটু চেষ্টা করলেই তুমি আমার উপস্থিতি অনুভব করবে। আনন্দে থাক। ইতি—

আঃ

'দাদু'

(৪৫)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
৩১।৭।৪৮

পরম প্রীতিভাজনেষু—

শ্রী......মহাশয়, সমীপেষু—

প্রিয়............বাবু, সর্ব্বমঙ্গল-আকর সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবানের মঙ্গলাশীর্ব্বাদে আপনাদের সর্ব্ববিধ মঙ্গল হউক, ইহাই প্রার্থনা করি।

কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া আপনি আমাকে একখানি পত্র দিয়াছিলেন। অন্যান্য প্রশ্নগুলি আমি পাই নাই, সেগুলি আপনার কাছেই ছিল। আপনার পত্রখানি পাইবার কিছুদিন পরে আমি আপনাকে আপনার পত্রের উত্তর দিয়াছিলাম। পরে জানিলাম, ঠিকানা ভুল হওয়াতে আপনি আমার সে পত্র পান নাই, ইহা আমারই অসাবধানতাবশতঃ হইয়াছিল এবং সেজন্য আমি আপনার কাছে অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত। পরে শ্রীমান্ সত্য-ভূষণের সহিত আপনাকে পত্র দিব, ইহাই স্থির করিয়াছিলাম; কিন্তু হঠাৎ আপনার অসুস্থতার সংবাদ আসায় পত্র দেওয়া হয় নাই। এইবার আপনার পত্রের উত্তর দিতেছি।

যে সমস্ত প্রশ্নগুলি আপনার অন্তরে প্রতিনিয়তই উঠিতেছে, তাহার সুসমাধান সাক্ষাৎভাবে আলোচনা দ্বারাই সম্ভব। পত্রের

দ্বারা সবিশেষ মীমাংসা সম্ভব নয়। যাহা হউক, আমি যথাসাধ্য একটু একটু লিখিতেছি। পরে যদি ভাগ্যবলে আপনার সহিত স্থূলে সাক্ষাৎ হয়, তখন আপনার সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইবে।

(১) দেখুন, জীব সাধারণতঃ সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী। প্রতি জীবই চায় জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী যেন তাহার প্রকৃতির অনুকূল হয়। কিন্তু ইহার প্রতি-কূল একটুখানি পাইলেই তাহার দুঃখ হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতির অনুকূলে সুখ এবং প্রতিকূলে দুঃখ। এই সুখ এবং দুঃখের সংঘাতই হচ্ছে সংসার। কোন দুটী প্রকৃতি এক হইতে পারে না। কিছু না কিছু পার্থক্য থাকিবেই। এই প্রকৃতি হইতেছে গুণগত। সৃষ্টির মূলে তিনটী গুণ আছে। এই তিনটী গুণ যথাক্রমে সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি নামে অভিহিত হয়। এবং এই তিনটি গুণকে আশ্রয় ক'রে প্রকৃতি ত্রিবিধভাবে প্রকাশিত হয় এবং তদনুসারে কর্ম্ম হইতে থাকে। কাজেই যে গুণাশ্রয়ী যে জীব তাহার প্রকৃতি তদনুসারে হইয়া থাকে। এই যে কর্ম্মের, ভাবের, চিন্তাধারার পার্থক্য দৃষ্ট হয় ইহা মাত্র গুণগত বিভেদ। কাজেই কোন কিছু ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া সুখী বা দুঃখী হওয়া উচিত নয়। আমাদের অন্তরের একটা চাহিদা থাকে এবং ঐ চাহিদার উপরই আমাদের একটা মোহ জন্মায়। কাজেই সেই চাহিদা পরিপূরণজনিত সুখ বা দুঃখ অনুভব হইতে থাকে। সুখ বা দুঃখ এই দুইটি মনেরই ভাব মাত্র। মনকে যদি Control করিতে পারা যায় তাহা

হইলেই এই সুখ দুঃখের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে।

এই যে এতবড় একটা সৃষ্টি আমার সামনে রহিয়াছে, ইহার স্রষ্টা একজন আছেই, অর্থাৎ এই সৃষ্টিরূপ কর্ম্ম যখন সাধিত হইতেছে তখন স্রষ্টারূপ কর্ত্তা তাহার আছেই। তাহা হইলে আমরা পাইলাম কি—এই সমগ্র সৃষ্টি অর্থাৎ আমার নিজ হইতে আরম্ভ করিয়া আমার সম্মুখস্থ যাহা কিছু দৃশ্য পদার্থনিচয়, জীবনিচয়, সমস্তেরই মালিক সেই স্রষ্টা বা ঈশ্বর। ইহাই যদি ঠিক হয় তাহা হইলে কোন কিছু ঘটনার সংযোগ বা বিয়োগেতে আমাদের সুখ বা দুঃখ হওয়া উচিত নয়। মালিক যে যে কর্ম্মগুলি করিবার জন্য আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন সে সমস্ত কর্ম্মগুলি যথানিয়মে (প্রতিটি কর্ম্মেরই একটি বাঁধা নিয়ম বা শৃঙ্খলা আছে) করিয়া যাইতে পারিলেই আমার ছুটি। আমরা এই রূপরসাদির উপর মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ি বলিয়াই আমাদের বিভিন্ন বাসনা কামনার উদ্ভব হয়, এবং আমাদের মন মূলটি ছাড়িয়া দিয়া বাসনা হইতে বাসনান্তরে ছুটাছুটি করিতে থাকে। কাজেই জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্তনে পড়িয়া যায়। আমার কথা হইতেছে, মনটি সেই জগন্নাথের কাছে রাখিয়া দিয়া তাঁর এই জগৎ সেবায় আত্মনিয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। নিজের চাহিদা কিছু না রাখিয়া মাত্র তাঁর বিভিন্নরূপের সেবা করিয়া যাইতেছি, আমি মাত্র সেবক, এই বুদ্ধিতে কাজ করিতে পারিলেই বহুলাংশে শান্তি পাওয়া যায়। উপরোক্ত এই তথ্যগুলির ভিতরে আপনার দুটি প্রশ্ন নিহিত

আছে। একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

আপনার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে যাহা জানিবার বাসনা আছে তাহা চিঠির মধ্যে আলোচনা উচিত বিবেচনা করিলাম না। সাক্ষাতেই আলোচনা হইবে। জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তাহাও সাক্ষাতভাবে আলোচনা করিব। আপনার অন্তরের যে প্রশ্নগুলিই আমি ধরিতে যাইতেছি, তাহার সবগুলিই আপনার সহিত একান্তে আলোচনা করা দরকার, পত্রে এইগুলি আলোচনা করা উচিত নয়। যদি শ্রীভগবানের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই একবার কলিকাতা যাইবার ইচ্ছা আছে। তখন আপনার সহিত সাক্ষাৎ-ভাবে আলোচনা করিব।

উপস্থিত আপনার শরীর কেমন আছে? পত্রোত্তরে জানাইলে সুখী হইব। অত্রস্থ মঙ্গল। আপনাদের নিত্য কুশল কামনা করি। ইতি—

আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বজিৎ ব্রহ্মচারী।

(৪৬)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ,
১৩।৮।৪৮

স্নেহাস্পদেষু—

শ্রীভগবানের মঙ্গলাশীষ গ্রহণ কর। তোমার পত্র ও কবিতা পাইলাম। কবিতাখানি সুন্দর হইয়াছে। জন্মোৎসবের পর-সংখ্যাতে উহা দিবার ইচ্ছা করি। তোমার কোন সংবাদ এতদিন পর্য্যন্ত না পাইয়া তোমার বিষয় চিন্তাই একটু করিয়াছিলাম, পত্র-পাঠে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম।

জীবমন সংস্কারাচ্ছন্ন থাকে বলিয়াই অজ্ঞানযুক্ত হয়। এই অজ্ঞান বা অবিদ্যা জীবের দুঃখ ঘটাইয়া থাকে। অবিদ্যাজনিত দুঃখ দূরীকরণার্থেই জীব সদ্‌গুরুর আশ্রয়প্রার্থী হয়। সেই সদ্‌গুরুর কৃপালাভ হইলে জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলবিধান হইয়া থাকে। এই যে আধ্যাত্মিক শক্তি, ইহা শক্তিমানের ধন বা ঐশ্বর্য্য বিশেষ।

"এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে,
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।"

অতএব তিনি যদি শক্তিমানই হন, তাহা হইলে তাঁহার শক্তির অপচয় কোনদিনই হইবে না। যত বড় দুরাচারই হও না কেন, তাঁহার নিজ আচারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই, দূর আচারকে

সন্নিকটবর্ত্তী করিবার জন্যই, দুষ্ট আচারকে সুষ্ঠ করিবার জন্যই কৃপা প্রয়োজন। দুষ্ট ঘোড়াকে বাগ মানানই চালকের কৃতিত্ব। অতএব তাঁহার শক্তির অপচয় হইতেছে কি সঞ্চয় হইতেছে, তাঁহার শক্তি নষ্ট হইতেছে কি বাড়িয়া যাইতেছে এ সব বিষয় চিন্তা করিয়া সময় নষ্ট না করিয়া, নিজে কতদূর কি লাভ করিলে, নিজের কতটুকু পরিবর্ত্তন হইল, সেইদিকে লক্ষ্য রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। কি করিলে, কেমন করিয়া চালাইলে তোমার উপকার হইবে, সে চিন্তা চালকের, তোমার নয়। অতএব ঐ সব চিন্তায় বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত।

দেখ, আমাদের একটা ধারণা আছে ভগবান বুঝি আমাদের স্তুতি নিন্দা দ্বারা সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট হয়েন এবং কখন আমি স্তবাদি দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব ইহার অপেক্ষায়ই তিনি বসিয়া আছেন। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তাঁহার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি কিছুই নাই। তিনি স্তুতি নিন্দার উপর। তিনি সদানন্দময় পুরুষ। এই যে দেবতাদিকে আমরা স্তবাদি করি, প্রার্থনাদি জানাই, ইহার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে আত্মনিবেদন করা অর্থাৎ অহংকারের নাশ হওয়া। এই অহংকারই হইতেছে মূল অবিদ্যা। ইহাই জীবের পতন বা দুঃখ ঘটায়। এই অহংকারের দ্বারাই চিত্তদর্পণ অপরিস্কার থাকে। ফলে, জীবের দুঃখ ঘটে। অতএব মনটিকে যদি সেই এক জায়গায় ফেলিয়া রাখিতে পার, তোমার ঐ বহুমুখীন লক্ষ্যধারা যদি একমুখীন করিতে পার, তোমার অন্তরের বহুমুখীন ভাবধারাকে যদি একইভাবে সন্নিবেশিত করিতে পার, বিভিন্ন

প্রকারের চাহিদা ছাড়িয়া যদি সেই একেকেই চাহিতে পার তাহা হইলে ঐ বস্তু হইতে যে সুখ দুঃখাদি উৎপন্ন হয় তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পার।

ভালকে ভাল করার কৃতিত্ব কিছুই নাই। ভাল যে সে চিরকাল ভাল থাকিবেই। খারাপকে ভাল করাই কৃতিত্ব। যে জ্ঞানবান, যে বিদ্বান তাকে আবার কি জ্ঞান কি বিদ্যা দিবে? যে অজ্ঞান, যে অবিদ্যাগ্রস্ত তাহাকে জ্ঞান দেওয়া, তাহাকে বিদ্যা দেওয়ার জন্যই ঠাকুরের প্রয়োজন। অতএব বাবা, ঐ সব বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে চেষ্টা কর। তিনি যথাকর্ত্তব্য বিধান করিবেন।

প্রভবের সংবাদ কি? সে কোথায় ও কেমন আছে? সুধীরের অসুস্থতার সংবাদে চিন্তিত হইলাম। আশা করি, ৺ভগবৎ কৃপায় সে ক্রমেই সুস্থ হইতেছে। হাজারিবাগস্থ জনৈক ভক্ত টাইফয়েড রোগে কষ্ট পাইতেছে। সেই কারণেই কলিকাতায় যাইতে দেরী হইতেছে। সে একটু সুস্থ হইলেই আমি কলিকাতায় যাইব। তোমাদের কুশল দিও। অত্রস্থ মঙ্গল, আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(৭১)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
২৫।১১।৪৮

প্রাণাধিকেষু—

বাবা, পরম কারুণিক, চিরমঙ্গলময় শ্রীগুরু নারায়ণের করুণাশীষ তোমার শিরে নিত্য বর্ষিত হউক। তোমার টাকা ও পত্র পাইলাম। পত্রপাঠে সবিশেষ অবগত হইয়া বিশেষ সুখী হইলাম। তোমার ছবিখানি তোমার মার কাছে সযত্নে সুরক্ষিত আছে।

তুমি তোমার ঠাকুরের কাছ থেকে গিয়া এমন কতকগুলি ঘটনার সম্মুখীন হইয়াছ যে, ঘটনাগুলিতে জীবস্থূলদৃষ্টিভঙ্গিতে এইগুলি দেখিলে এবং চিন্তা করিলে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে এবং স্বতঃই তাহার বুকে একটি প্রশ্ন জাগে, "ঠাকুর আমার চিরমঙ্গলময়, আমি আমার মঙ্গলময় দেবতার কাছ থেকে আসিয়াই এমন কতকগুলি ঘটনার সম্মুখীন হইলাম যাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অমঙ্গলজনক, ফলে দুঃখদায়ক বলিয়া অনুমিত হয়। কেন এমন হয়?" উত্তর দেই:—শোন, জীব ইহজগতে সাধারণতঃ ত্রিবিধ দুঃখে প্রতিনিয়ত উৎপীড়িত হইতেছে, এবং এই দুঃখের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্যই জীব ভগবৎ চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। এখন এই দুঃখ হইতেই মুক্তি—মানে কি? এই দুঃখগুলি কি

আর আসিবে না ? তাহা নহে। দুঃখ বা সুখ কর্ম্মফল অনুপাতে আসিবেই। কর্ম্ম যতদিন আছে তাহার ফলও ততদিন আছে। কর্ম্ম দুই প্রকার। শুভ ও অশুভ। কাজেই ইহার ফলও দুই প্রকার। সৃষ্টি শব্দ কর্ম্মকেই বুঝায়। অতএব সৃষ্টি যতদিন আছে, কর্ম্ম ততদিন আছে, কর্ম্মের ফলও আছে। ব্যাপারটা কি হয় শোন,— জীব সাধারণতঃ এই কর্ম্মের ফলের উপর মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে, ফলে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। দেখা যাইতেছে, কর্ম্ম আমাদের সুখ দুঃখের কারণ নহে। ফলের প্রতি যে মোহ বা আসক্তি ইহাই আমাদের সুখ দুঃখের কারণ। কাজেই ইহা হইতে বোঝ, দুঃখের নাশ মানে মোহ বা আসক্তির নাশ। এখন প্রশ্ন হইবে, "শক্তিমান সাক্ষাৎ মূর্ত্ত ভগবানস্বরূপ শ্রীগুরু" আশ্রয় বা কৃপা লাভ করিয়াও জীবকে কেন ইত্যাদি প্রকার ঘটনাগুলির ভিতর মধ্যে মধ্যে সম্মুখীন হইতে হয় ? ইহা দ্বারা শ্রীগুরু স্বয়ং তোমাদের কাছে পরীক্ষা দেন যে, তোমরা কতটুকু পরিমাণ এই ঘটনাগুলি তোমাদের মধ্যে সামাই খাওয়াইয়া লইতে সক্ষম হইতেছ। অর্থাৎ তোমরা কতটুকু পরিমাণ মোহ বা আসক্তিশূন্য হইতে চেষ্টা করিতেছ, ইহা তোমরা নিজেরাই বুঝিতে চেষ্টা কর। দেখ, আমি যদি মুখে বলি, তোমাদের মোহ বা আসক্তি বা কাম ক্রোধাদি রিপুনিচয় অনেকখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইহাদ্বারা তোমাদের বিশ্বাস খুব দৃঢ় হয় না বা হইতে পারে না। কিন্তু ইত্যাদি প্রকার ঘটনাদ্বারা যখন তোমরা Practical test পাইবে, তখনই বুঝিবে তোমরা কতটুকু

পরিমাণ অগ্রসর হইতেছে। এই সমস্ত ঘটনা মধ্যে মধ্যে আসার কারণ ইহাই।

অত পরিশ্রমের পর তোমার শরীর সুস্থ আছে তো? মিনা মা, তোমার ছেলেমেয়েরা কে কেমন আছে? আশ্রম-সংবাদ এক প্রকার। আমার শরীর ভাল আছে কিন্তু মন ক্রমশঃ অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে, আর যেন কিছু ভাল লাগিতেছে না। মধ্যে মধ্যে তোমাদের কুশলাদি সংবাদ দিও। আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(৪৮)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
২৬।১১।৪৮

পরম স্নেহভাজনেষু—

বাবা, করুণাময় শ্রীশ্রীগুরু ভগবানের স্নেহকরুণাধারা নিত্য তোমার শিরে বর্ষিত হউক। পত্রপাঠে সবিশেষ অবগত হইলাম।

শরীরের জন্য একটু যে হাঁটাচলা করিব তার উপায় নাই। প্রত্যহ মেঘ করিতেছে এবং ঝির ঝির করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। আজ ৭।৮ দিন যাবৎ এ অবস্থা চলিতেছে। যাক্, আকাশটা একটু পরিষ্কার হইলে বেড়াইতে চেষ্টা করিব।

এইবার তোমার কথার উত্তর দিই।

১। যে সাধক বা যে ভক্ত শ্রীগুরুতে মনপ্রাণ অর্পণ করিতে চেষ্টা করে, করুণাময় শ্রীগুরু ভগবান তাঁহাকে ঐভাবেই কৃপা করেন। ঐরূপ অবস্থার উদ্দেশ্যই হইতেছে, তিনি যে তোমার নিত্য সাথী, তোমার প্রতিটি কর্ম্মের একমাত্র দ্রষ্টা, ইহা যাহাতে তুমি জানিতে পার বা বুঝিতে পার সেইজন্যই ঐরূপ অবস্থা হয়।

২। ঐ যে তোমার ভিতরে দুইটি ভাবের খেলা এক সঙ্গে হইতেছিল, ঐ যে মনে হইতেছিল দুইটি আমি, উহার একটি হচ্ছে Inner self আর একটি হচ্ছে Outer self. বাংলা কথায় একটি

হচ্ছে 'শুদ্ধ আমি' অপরটি হচ্ছে 'জীব আমি'। ঐ যে শুদ্ধ আমি উনিই হচ্ছেন গুরু বা জ্ঞানসত্ত্বা নাম হয় ঐ 'শুদ্ধ আমি'তে কেবল অনুভব করে 'জীব আমি'। ঐ নাম জীবহৃদয়ে প্রতিনিয়তই ধ্বনিত হইতে থাকে তুমি যে দিনদিন গুরুকৃপা পাইতেছ, করুণাময় শ্রীগুরু ভগবান তোমাকে যে-কৃপা করিয়া নিজ অঙ্গে ধারণ করিয়া লইয়াছেন, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তুমি যে তাঁহার কৃপা অনুভব করিতে সক্ষম হইতেছ ইহা জানিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম।

গুরুতে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইলে শ্রীগুরু ভগবানের ঐ যে নিত্যবর্ষী কৃপাশীষ, উহা জীব সহজেই অনুভব করিতে সক্ষম হয়।

দেখ বাবা, কৃপা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ষিত হইতেছে। যে স্থান দিয়ে এই কৃপা জীব অনুভব করে, সেই স্থানটী অভিমানে এমনই আবৃত থাকে যে জীব ইহা ধরিতে সক্ষম হয় না। গুরু-কৃপা উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, পবিত্র-অপবিত্র ইত্যাদি কিছুই বিচার করে না। বর্ষার বারিধারার ন্যায় সে অবিশ্রান্তভাবে বর্ষিত হইতে থাকে। ইহা স্বচ্ছ হৃদয়মাত্র অনুভব করিতে পারে। কাজেই তোমার অবস্থা জানিয়া আমার বড় আনন্দ হচ্ছে। আশীর্ব্বাদ করি বাবা, তুমি গুরুলাভ কর, তাঁর অকৃত্রিম স্নেহের পূর্ণ অধিকারী হও। শিবমস্তু।

তোমার জন্য আমারও মাঝে মাঝে মনটা খুবই অস্থির হয়। কেবলি ভাবি, বড়দিন কবে আসবে। কবে তোমাদের দেখতে

পাব। উপস্থিত আশ্রমে বিশেষ কেহ নাই। দু-চারটি ছেলে ও দু-চারটি মেয়ে আছে। এখানে বর্ষাকালের মত বৃষ্টি হইতেছে। কাজেই ভাল লাগছে না। কল্যাণীয়া শ্রীমতী রাধা মা ও ছেলে-মেয়েরা সব কে কেমন আছে? আমার দ্রৌপদী সুন্দরী (কৃষ্ণা) খুব গান টান করছে শুনছি। রাণীভাই কেমন আছে? সে সেরকম কাঁদে তো? আর Champion foot-ball player খুব খেলছে তো? সকলকে আশীর্বাদ দিও; পত্রোত্তরে তোমাদের সংবাদ দিয়া সুখী করিও, আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্ব জং

(৪৯)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
৬।১২।৪৮

পরম স্নেহাশীর্ব্বাদ বিশেষ—

বাবা…, স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার পত্রখানি পাঠে সবিশেষ জানিলাম এবং তোমার মনোবেদনার কারণও বুঝিলাম। দেখ বাবা, তুমি যখন এখানে আমাকে বলিয়াছিলে, তখন কেন এরূপ হয় তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। তুমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছ। আমি তোমাকে আবার বলিতেছি। তুমি বেশ বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। আশা করি বুঝিতে পারিবে।

দুঃখ বা বেদনা যে-কোনরূপ ধরেই আমাদের সম্মুখে আসিয়া আমাদিগকে পীড়া দিউক না কেন, ইহা অর্থাৎ এ-পীড়া আমরা অনুভব করি আমাদেরই অজ্ঞানতার ফলে। একটু খুলিয়া বলি,—মনে কর, একটি ঘটনা হইল। ঐ ঘটনাটির সহিত আমি ওতঃপ্রোত-ভাবে সংশ্লিষ্ট। এখন আমি স্বতঃই চাই, ঐ ঘটনাটি আমার অনুকূলে ঘটিতে থাকুক। কিন্তু ঘটনা স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে রূপ ধারণ করে। তাহা যদি আমার অনুকূলে হয়—আমি সুখানুভব করিব—আমার প্রতিকূলে হয় তবে দুঃখানুভব করিব,

এখন ঘটনাটি ঘটে আর অনুভব হয় আমার মন এবং বুদ্ধিতে। অতএব দেখ, আমার মনের যেমন গতি আছে, ঘটনারও তদ্রূপ গতি আছে। এই মন তাহার অনুকূলে ধাবিত হয়, ঘটনাও তাহার অনুকূলে ধাবিত হয়, যদি ইহা আমার মনের সহিত মিলিয়া গেল তবেই সুখ, যদি মনের বিপরীত দিকে চলিয়া গেল তবেই দুঃখ। এখন বুঝিয়া দেখ, এই যে সুখ বা দুঃখ অনুভব করি এ অপরাধটি কার? আমার? ঘটনার কর্ত্তার? না ঘটনার? এখানে কর্ত্তা হচ্ছে ঘটনার উপলক্ষ্য, ক্রিয়া হচ্ছে ঘটনা আর লক্ষ্য হচ্ছে যে অবস্থাটাকে উপলক্ষ্য করিয়া ঘটিতেছে। তাহা হইলে দোষটি কার?

আচ্ছা এইবার তোমার প্রশ্নের উত্তর দিই,—

তোমার প্রশ্ন:—(১) কর্ম্মফল ভোগ করার সময় শ্রীগুরু যেখানে নীরব দ্রষ্টা মাত্র, সেখানে তাঁর কাছে প্রার্থনার কি প্রয়োজন?

উত্তর: দেখ, পূর্ব্বে আমি তোমাদের বহুবার বহুবিধ যুক্তি তর্কদ্বারা ইহার মীমাংসা দিয়াছি, এবং যখন আমি ইহার মীমাংসা করিয়াছি, তোমাদের ভাব, ব্যবহার এবং বাক্যাদির দ্বারা বেশ পরিষ্কার বুঝা গিয়াছে, তৎকালীন অর্থাৎ যখন এর আলোচনাদি হয় তখন বেশ বুঝিতে পার কিন্তু পরেই তাহা ভুলিয়া যাও, এবং অনুরূপ ঘটনার মধ্যে পড়িয়া তোমাদের মনের এরূপ অবস্থা আসে। ইহারই ফলে মনে হয় গুরু যখন সর্ব্বশক্তিমান এবং তিনি ইচ্ছা করিলে যখন সবই করিতে পারেন, তখন আমরা কষ্ট পাইতেছি কেন? বা আমাদের কর্ম্মফল, যেজন্য আমরা কষ্ট পাইতেছি, তাহা এই মুহূর্ত্তেই দূর হইবে না কেন?

দেখ, জীবের সাধারণতঃ কর্ত্তৃত্ব অভিমানটা অত্যন্ত প্রবল এবং জীব সাধারণতঃ সকল কর্ম্মে, সকল অবস্থায়, সকল ব্যবস্থায় এই অভিমানের পরিপোষণ করিতেই সচেষ্ট হয় এবং যেখানেই ইহা বাধাপ্রাপ্ত হয় সেইস্থানেই মন উপরোক্ত প্রকার বিদ্রোহ করে। গুরু যদি মঙ্গলময় স্বীকার কর, তিনি সর্ব্বদাই তোমার মঙ্গলবিধান করিতেছেন, ইহা যদি মান, তাহা হইলেই বিচারের প্রবৃত্তি আসিবে এইরূপ দুঃখ কষ্ট বা ব্যথাদ্বারা আমার কি মঙ্গলবিধান হইতে পারে? এ অভিমান তো অন্য উপায়েও দূর হইতে পারে? শোন কি হয়। এই কর্ত্তৃত্ব অভিমান হইতে আসক্তি বা মোহ আসে, এবং এই আসক্তি বা মোহ হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়। অমঙ্গল বা দুঃখ একই কথা বলিয়া আমার ধারণা। এখন যদি তোমাকে শান্তিই দিতে হয়, তাহা হইলে দুঃখের মূল কারণ যে অভিমান, তাহা আগে নাশ করিতে হইবে। এখন এই অভিমান বহুরূপ নিয়াই প্রকাশ পায়, কাহারও অর্থে, কাহারও সামর্থ্যে, কাহারও রূপে, কাহারও যশে ইত্যাদি। যখনই তুমি শ্রীগুরু সন্নিধানে আসিলে তোমার দুঃখ দূরীকরণের জন্য, তখনই চক্ষুষ্মান, সর্ব্বশক্তিমান গুরু প্রথমেই দেখিবেন এর উক্তপ্রকার অবস্থাগুলির মধ্যে কোনটী প্রবল আকারে ঐ অভিমানের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। তখন তিনি করেন কি, ঐ অভিমানমূলক অবস্থাটি ধীরে ধীরে নষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। কখনও ব্যথা দিয়া, কখনও সুখ দিয়া, এইরূপ নানাবিধ উপায়ে তাহাকে রক্ষা করিতে প্রয়াস পান। কখনও ইহা তাহাকে জানান, আবার কখনও তাহা নীরবেই

ব্যবস্থা করেন। একটী ছোট্ট উদাহরণের দ্বারা তোমাকে ইহা আরও পরিস্কারভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। একটি রোগী কোন চিকিৎসককে রোগের ইস্তাহার যাহা দিল, তাহাতে একখানা মোটা Exercise Book পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অর্থাৎ হজম হয় না, অম্বল হয়, দুর্ব্বলতা, অনিদ্রা, হাত পা ফোলা, মাথা-ঘোরা ইত্যাদি ইত্যাদি বহুপ্রকার। এখন চিকিৎসকটী যদি সুবিজ্ঞ হন তাহা হইলে তিনি কি করেন? তিনি বলেন, "বাবা, ভয় নাই ভাল হয়ে যাবে, ঔষধ দিচ্ছি।" এই তো বললেন রোগীকে। আর তিনি নিজে তাহার ঐ symptoms গুলির মধ্যে খুঁজিতে থাকেন রোগের মূল কোথায় এবং ঔষধের দ্বারা ঐ মূলটি নষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। কি ভাবে নষ্ট হয়, কখনও রোগটী বাড়িয়ে তোলেন, কখনও মাঝামাঝি অবস্থায় রাখেন, কখনও তাহা কমাইয়া দেন, এইভাবে ক্রমে ক্রমে তাহার রোগীটীকে সম্পূর্ণ নীরোগ করেন। চিন্তা করিয়া দেখ, ইহা ঠিক নয় কি? গুরুশক্তি ওতঃপ্রোতভাবে তোমার সঙ্গেই আছে এবং সে তার কাজ করেই যাচ্ছে। অভিমান-অন্ধ জীব ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না বলেই ইত্যাদি প্রকার মনোভাব হয়। অভিমানের পর্দ্দা সরিয়া গেলেই জীব বুঝিতে পারে, অন্য কথায় অনুভব করিতে এই শক্তিকে। তোমার প্রশ্নের উত্তরে আর একটী যুক্তি দিই শোন দেখ, জীব সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তুর সুখকেই তার চিরন্তন সুখ বলিয়া মনে করে, এবং এর পরেও সে পারমার্থিক সুখ বলে যে একটা সুখ আছে--তাহা কল্পনাও করিতে পারে না এবং ইহাই যে তার একমাত্র কাম্য

তাহা সে অনুভব করিতে পারে না। কারণ, সাধারণ জীবের দৃষ্টি ইহার বাহিরে যায় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ, মোহ বা আসক্তিরই বৃদ্ধি করে। এই আসক্তিই বন্ধনের কারণ হয়। করুণাময় শ্রীগুরু তার এই বন্ধনের মূল কারণ আসক্তিটিকে বিনষ্ট করিয়া তাহাকে (জীবকে) তাহার চিরন্তন সেই ইন্দ্রিয়াতীত সুখকে আস্বাদ করাইবার জন্যই প্রয়াসী হন। এই আসক্তিকে বিনষ্ট করিবার জন্যই তিনি তাহার অর্থাৎ জীবের আসক্তি উৎপাদনের মূল বস্তুগুলির নগ্নরূপ তাহার সম্মুখে ধরিয়া দেন, এবং ফলে তাহার (জীবের) সেই বস্তুগুলির সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ হয় এবং সে তাহার প্রকৃত সুখের বস্তুকে চাহিতে থাকে এবং তাহাকেই তাহার চরম সুখের বস্তু বলিয়া বুঝিতে পারে এবং তখনই সর্ব্বশক্তিমান শ্রীগুরুর মঙ্গলময়ত্বের এবং নীরবতার কারণ উপলব্ধি করিতে পারে।

আশা করি, তুমি আমার এ পত্রখানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া ইহার মর্ম্মার্থ বুঝিতে চেষ্টা করিবে। বড়দিনের সময় যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে দু'একদিনের জন্য যদি আসিতে পার সুখী হইব। সাক্ষাতে তোমার সহিত বিশদভাবে এ বিষয় আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। শরীরটা বিশেষ সুবিধা নয়। অত্যধিক ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। তোমার কথামত আশ্রমবাড়ীর যথেষ্ট addition & alteration করিয়াছি। তোমরা আসিয়া দেখিলে সুখী হইবে বলিয়াই মনে হয়। তোমার বাড়ীর সংবাদ কি? কুশলাদিসহ তোমার উপস্থিত মনোভাব জানাইলে সুখী হইব। আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(৫)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
৪।১২।৪৮

পরম স্নেহভাজনেষু—

বাবা···, স্নেহঘন অন্তর্দেবতা পরম কারুণিক শ্রীগুরু নারায়ণের করুণাশীর্ব্বাদ তোমার শিরে নিত্য বর্ষিত হউক। সেই নিত্যস্থির চিরউজ্জ্বল জ্যোতিতে তোমার জীবনের চলার পথ আলোকিত হইয়া উঠুক, ইহাই কামনা করি।

তোমার দীর্ঘ পত্রখানি পাঠে পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। বাবা, গুরু শব্দের অর্থ জ্ঞান, অর্থাৎ যিনি অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যান। তাঁহাকে অতি নিবিড়ভাবে পাইতে হইলে, যে কোন সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে অতি আপন করিয়া লইতে পারা যায়। অপর কথায়, ভালবাসিতে পারা যায়—তাহাই প্রয়োগ করিতে পারা যায়। তাঁহাকে 'তুমি' 'আপনি' 'ভাই' 'বন্ধু' 'পিতা' 'মাতা' যাহাই সম্বোধন কর, তাহাতে ক্ষতি নাই। কারণ, সবের মধ্যেই তিনি, সব ভাষার মধ্যেই তিনি, এক কথায় তিনি ছাড়া কোথাও কিছু নাই। দেখ, শাস্ত্রকার ঋষি ইহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"ত্বমেবভান্তমনুভাতিসর্ব্বম্, তস্যভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি" বাবা, এই গুরু বা জ্ঞানসত্ত্বা সর্ব্বব্যাপী, ইহা যে শরীর বা আধারকে

অবলম্বন করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার সর্ব্ববিধ দুঃখের নাশ করিতে আজ দণ্ডায়মান, তাঁর মত আপন, তাঁর মত দরদী বন্ধু এ জগতে আর কে আছে বল? ওরে! তাঁর কাছে আবার অধিকারভেদ, অযোগ্যতা, অবাগ্মিতা ইত্যাদির প্রয়োজন কি রে? ডাক বাবা তাঁকে যে-কোন ভাষায়, খুলে দে তোর ঐ তাপদগ্ধ হৃদয়খানি তাঁর কাছে, জড়িয়ে ধর তাঁকে আপন বলে, বন্ধু বলে, প্রিয়তম বলে, এগিয়ে চল তাঁকে বুকে করে।

ঐ দেখ, তোর ঐ মাতৃবিরহ-সন্তপ্ত হৃদয়ের জ্বালা দূর করবার জন্য তাঁর ঐ নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কৃপা করে তোর সামনে মাতৃমূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, ওরে মাতৃস্নেহান্ধ সন্তান, তোর দুঃখ করবার কিছু নেই। তুই মাতৃহারা ন'স্। সন্তানবৎসলা স্নেহান্ধ পাগলিনী মা সব সময়ই তোর কাছে আছেন। তুই আমার মধ্যেই সেই মাকে পাবি। মনেকর বাবা, চণ্ডীর সেই শ্লোক 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।" তাই বলি বাবা, বুঝতে চেষ্টা কর তাঁকে, আপন বলে ভালবাসতে শেখ সেই কাঙ্গাল ঠাকুরকে।

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, "ঠাকুর তো সবই জানেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আবার চিঠিতে জানাইয়া কি হইবে?"

উত্তর- বুঝলাম, ঠাকুর সব জানেন। তিনিও তোমার মত চিঠিতে না জানাইয়া নিজে নিজে তোমার ব্যবস্থা করিবেন। অবশ্য একথা ঠিক জানিও, তিনি তোমার জানানোর অপেক্ষা রাখেন না। তবে চিঠিতে জানাইলে তুমিও তাঁর উত্তর পাইয়া কতকটা

শান্তিলাভ করিতে পার। শাস্ত্র স্থূলেও জানানোর নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

তোমার নিজের অবস্থা ও ব্যবসা ইত্যাদি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, তাহার বিষয় ইহাই বলিতে চাই, বাবা, যখন তুমি তোমার দায়িত্ব আর একজনের হাতে তুলিয়া দিয়াছ বলিয়া মনে কর, তখন তোমার চিন্তা করিবার কিছুই থাকিতে পারে না। দেখ না তিনি তোমার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করেন। মেঘ দেখিলেই ভয় পাইবার কিছু নাই।

আশা করি, তোমার পত্রের উত্তর পাইলে। পত্রখানি পাঠে তোমার বর্ত্তমান মনের অবস্থা জানাইও। বড়দিনের সময় দু'এক-দিনের জন্য আসিতে চেষ্টা করিও। তোমার শ্বশুরালয়ের যদি কেহ ঐ সময় আসিতে চান, তবে লইয়া আসিও। পত্রোত্তরে তোমাদের কুশল সংবাদ দিও। এ শরীর একরূপ। আশ্রমস্থ মঙ্গল জানিও, আনন্দে থাক। ইতি

বিশ্বজিৎ

(৫১)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম।
হাজারিবাগ
১২।১২।৪৮

প্রাণাধিকেষু—

স্নেহের......, শ্রীগুরু ভগবানের প্রাণভরা স্নেহাশীর্ব্বাদ লও। বাবা, তোমার খামের পত্রখানি পাইয়া আমি পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেছি। তুমি যে কথাগুলি লিখিয়াছ, এগুলি সত্যই যদি তোমার আন্তরিক বলিয়া তুমি নিজে অনুভব কর, তাহা হইলে আজ আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, সত্যই তুমি আজ শিষ্যত্ব লাভ করিয়াছ, আর ইহা যদি তা না হইয়া, মাত্র তোমার মৌখিক কথা হয় এবং মনের একটা সাময়িক উচ্ছ্বাস হয়, তাহা হইলে সাধারণের চক্ষে তুমি একটা ভণ্ড, জুয়াচোর এবং সুবিধাবাদী প্রতীয়মান হইলেও আমার কাছে তুমি মহৎ এবং প্রকৃত গুরুকৃপাকাঙ্ক্ষী বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কারণ, পত্রে লেখা বাক্যগুলি যেভাব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সেই ভাবটী তোমার অন্তরে সাময়িক হইলেও ঐ পবিত্রভাব মনে একটি ছাপ মারিয়া দিয়া যায়। পরে প্রয়োজন অনুসারে ঐ সংস্কারই মনকে সাত্ত্বিকীভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে এবং জীবকে তার ঐ ছড়িয়ে-পড়া বুদ্ধিবৃত্তিগুলিকে একত্র করিতে

প্রয়াস পায়। সাধারণ ভাষায় যুক্তি-"ধর্ম্মের ভানও ভাল।" শাস্ত্রীয় যুক্তি "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

যাক্, এইবার তোমার পত্রের উত্তর দিই শোন—দেখ, সাধকের মনে গুরুকে প্রীত করিবার যখন একটা প্রবল আগ্রহ জন্মে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজ অক্ষমতাজনিত একটা জ্ঞান অনুভব হইতে থাকে, এবং তাহার অন্তরের দুর্ব্বলতাগুলি তাহার মনের চোখে ধরা পড়িয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইত্যাদিরূপ দুর্ব্বলতা থাকা সত্ত্বেও তাহার প্রতি গুরুর কৃপা ও ভালবাসার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, তখন তাহার নিজ অক্ষমতাজনিত অনুতাপ এবং তৎসত্ত্বেও তাহার প্রতি গুরুর কৃপা ও ভালবাসা তাহার বুকে গুরুর প্রতি একটা কৃতজ্ঞভাবকে জাগিয়ে তোলে। এবং এই কৃতজ্ঞতার ফলেতেই সেই সাধক অগ্রসর হইতে থাকে ধীরে ধীরে সেই সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবানের দিকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইতে থাকে তাহার মনের অসৎবৃত্তিগুলি এবং ক্রমেই সে অধিকতর আকৃষ্ট হয়ে পড়ে তাহার জীবনের সহিতকারের বন্ধু প্রকৃত দরদীর এবং অচ্যুতসারথির প্রতি।

দেখ পত্রে লেখা কথাগুলি হইতে আমার আর একটি অভিজ্ঞতা হইয়াছে। দেখ, উপরোক্ত অক্ষমতা আসিবার আর একটি বিশেষ কারণ আছে বলিয়া আমার মনে হয় জীব সাধারণতঃ যেস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া আশ্রমে আসার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সমস্ত ভাবধারায় লালিত পালিত ও গঠিত, যেরূপ ব্যবহারে নিত্য অভ্যস্ত থাকে, অভ্যাসবশে সেইরূপ অবস্থায় চলিতে চলিতে তাহার মনের

মধ্যে তদনুরূপ একটা ছাপ পাওয়া যায়, ফলে তাহা সংস্কারে পৌঁছায়। এখন তাহার অন্তরের উচ্ছ্বাসের ফলে এবং জন্মার্জ্জিত সৎকর্ম্মের ফলস্বরূপ সে কোন মহাপুরুষের আশ্রয় পাইল এবং তৎসন্নিধানে বাসেরও অধিকার পাইল। প্রথম প্রথম তাহার অন্তরের যে সৎগুণাবলী থাকে, সেইগুলিকে উচ্ছ্বাসবায়ু তাহার মনের সামনে নিয়ে এসে ধরে, এবং সেই গুণাবলীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সেই জীবটীর চিন্তাধারা, কর্ম্মাবলী প্রকাশিত হইতে থাকে এবং ফলে সে আশ্রমাচার্য্যের কতকটা প্রীতি ও স্নেহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, এবং যখনই সে ইত্যাদি প্রকার স্নেহ বিশেষভাবে আকর্ষিত করে, তখনই তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত স্বভাবরাশি তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় এবং ঐ যে অযাচিত স্নেহ ও অহৈতুকী কৃপা সে পাইতে থাকে তাহার অমর্য্যাদা করিতে সুরু করিয়া দেয়। কেন না কর্ত্তৃত্বাভিমানান্ধ জীব মনে করিতে থাকে, "আমি কি হনু রে।" মার্জ্জার-মূষিকের গল্পের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহা আমার ইদানীন্তন অভিজ্ঞতালাভ হইয়াছে। এক্ষেত্রে তোমরা আমার গুরু। আমি এই এতটুকু জ্ঞানলাভের জন্যও তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

তখন সে নিজেকে এতবড় বুদ্ধিমান বলিয়া ভাবিয়া বসিয়া থাকে যে তাহার কাছে গুরু, শাস্ত্র ইত্যাদি সমস্ত যুক্তিই অতি হেয় ও ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়। যেমন জোনাকি পোকার কাছে লণ্ঠনের আলো ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়।

এইবার তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব।

উত্তর ১নং প্রশ্ন—মন্ত্রার্থ স্মরণপূর্ব্বক মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা

দেবীর চিন্তনের সহিত পুনঃ পুনঃ উচ্চারণই হচ্ছে প্রকৃষ্ট জপ। জপের উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি ও ইষ্ট উপলব্ধি। ২য় প্রশ্ন—মনে প্রাণে শরণাগতের লক্ষণ কি? উহা হইতে হইলে সাধকের কি কি আচরণীয় ও পালনীয়? উত্তর—জীব যখন নিজেকে আর্ত্ত ও দীন বলিয়া মনে প্রাণে প্রতিনিয়ত অনুভব করিতে থাকে এবং গুরুকেই তাহার একমাত্র পরিত্রাতা বলিয়া সে সর্ব্বতোভাবে মনে বুদ্ধিতে স্বীকার করিতে সক্ষম হয়, তখনই তাহার বুকে শরণাগতের ভাব জাগ্রত হয়। এই শরণাগত হইতে হইলে গুরু সন্নিধানে সকল সময় বাসপূর্ব্বক শ্রীগুরুর প্রতিটি ক্ষুদ্র আদেশও সভক্তিতে, প্রেম-পূর্ণ চিত্তে ও সানন্দে প্রতিপালনের আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। এক কথায়, ঠিক ঠিক কৃতজ্ঞতার ভাব হৃদয়ে জাগ্রত হইলেই শরণাগতি-ভাব আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। ৩নং প্রশ্ন (উত্তর) আত্মহত্যা প্রারব্ধ কিংবা উৎকট পাপের ফলভোগের দরুণই ঘটে।

তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর পত্রে সংক্ষেপেই দিলাম, পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা হইবে। এবারে বড়দিনের সময় তুমি কি আসিবে? বিজয় এসেছিল। বড়দিনের সময় দু'দিনের জন্য আসিতে চেষ্টা করিবে বলিয়া সে বলিয়া গিয়াছে। সে বোধ হয় খড়গপুরেই posted হইবে। তোমার নিজের শরীর ও বাড়ীর সব সংবাদ কি? সকলকে আশীর্ব্বাদ দিও। এ শরীর একরূপ। আশ্রমস্থ মঙ্গল জানিও। আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্বজিৎ।

(৫২)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
১১।১।৪৯

কল্যাণবরেষু—

বাবা……, স্নেহঘন অন্তর্দেবতার শ্রীগুরু নারায়ণের করুণাশীষ তোমার শিরে নিত্যবর্ষিত হউক, ইহাই প্রার্থনা। তাঁর সেই নিত্যাস্থির চিরউজ্জ্বল জ্যোতিতে তোমার হৃদয়াকাশ উদ্ভাসিত হইয়া তাঁর অনন্তলীলা অনুভব করিবার যোগ্যতা লাভ কর, ইহাই কামনা করি।

তোমার দীর্ঘ পত্রখানা কয়েকদিন পূর্ব্বেই পাইয়াছি। শরীরটা বিশেষ অসুস্থ থাকায় উত্তর দিতে একটু দেরী হইয়া গেল। তোমার পত্রপাঠে যাহা বুঝিলাম, তাহার উত্তর সংক্ষেপেই দিতেছি। পত্রে এর চেয়ে বেশী সমালোচনা সম্ভব নয়, সাক্ষাৎ আলোচনার প্রয়োজন।

১নং—তুমি রীতিমত সন্ধ্যা-আহ্নিক করিয়া যাইতেছ, কখনও বেশ আনন্দ পাও বলিয়া মনে কর, আবার কখনও সে আনন্দ পাও না। ফলে, মনে একটা হতাশভাব আসে। "Failure is the pillar of success." এই কথাটাও তুমি স্বীকার কর না, কেন না, বার' বার failureএ উৎসাহ কমিয়া যায় এবং পরে সেই কাজ ছাড়িয়া দিতে হয়।

উত্তর -শুন বাবা, জীব মাত্রই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এই সংস্কার সকল মোহ বা আসক্তি হইতে জাত। ইহজীবনও তার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের ফলস্বরূপ (ঐ আসক্তি বা মোহ পরিপূরণের জন্য) লাভ হইয়া থাকে। এখন সে যেস্থানে জন্মগ্রহণ করিল, সে ক্ষেত্রও সে তার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের বাসনা কামনাগুলি ভোগ করিবার অনুকূলেই পাইল। এবং তদনুযায়ী ইহজীবনেই তাহা ভোগ হইতে লাগিল। কিন্তু এই ভোগের দ্বারা যখন সে তৃপ্তি পাইল না, উপরন্তু তাহা হইতে অনন্ত দুঃখই পাইতে লাগিল, তখন তাহার হৃদয় ব্যাকুলিত হইয়া পড়িল এবং সে মনে মনে আকুল হইয়া ভাবিতে লাগিল—"এমন কে আছে কোথায় যে আমায় রক্ষা করে।" ঠিক সেই শুভ মুহূর্ত্তেই দীন দয়াল কাঙ্গালের ঠাকুর তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন শ্রীগুরু মূর্ত্তিতে এবং বলিতে থাকেন—"বাবা, ভয় নাই, আমি তোর সব জ্বালা ঘোচাব।" তিনি তখন আস্তে আস্তে ঐ সংস্কারবদ্ধ জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের সংস্কারগুলি তার (জীবের) অজ্ঞাতে ক্ষয় করাইতে থাকেন তাকে শান্তির পথে লইয়া যাইবার জন্য, এখন এই সংস্কারগুলি ক্ষয় করিতে কিছু সময় তো লাগিবেই। যেমন ধর, তোমার একখানা বাড়ী তৈয়ার করিতে ছয়মাস লাগিল। এখন পুনরায় সে বাড়ীখানি ভাঙ্গিতে গেলে একমাসও তো লাগিবে? তারপর দেখ, একখানা দর্পণের উপর যদি পুঞ্জীভূত ময়লা জমিয়া থাকে তাহা পরিস্কার করিবার সময় পরিস্কৃত স্থানে একটু একটু প্রতিচ্ছবি দেখা যাইতে পারে মাত্র, কিন্তু সেই দর্পণটি সম্পূর্ণ পরি-

স্কার না হইলে তাহাতে পুরোপুরি প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। এখন যদি দর্পণের কিয়দংশ পরিস্কার করিয়া তোমার প্রতিবিম্বটি তাহাতে পুরোপুরি দেখিতে না পাও এবং তাহার জন্য ব্যথিত হইয়া হতাশ হইয়া পড়, তাহা হইলে আর কি করিয়া ঐ দর্পণটিতে তোমার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে? সেইরূপ অসংখ্য সংস্কাররাশিযুক্ত জীবের চিত্ত দর্পণটি পরিস্কার করিতে শ্রীগুরুকেও (এখানে শ্রীগুরু পরিস্কারকারী) কিছু সময় ব্যয় করিতে হয়। এই চিত্তদর্পণ পরিস্কার করা কালীন তাহার অর্থাৎ জীবের যে পরিমাণ সংস্কার ক্ষয় হইতে থাকিবে, সেই পরিমাণই সে আনন্দ অনুভব করিতে থাকিবে। কিন্তু তাহাকে অর্থাৎ জীবকে বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে সেই পরিস্কারকারীর (অর্থাৎ শ্রীগুরুর) নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে হইবে। তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে তিনি তার (জীবের) চিত্তদর্পণ পরিস্কার করাইয়া তাহাকে (জীবকে) তার স্বরূপে (যাহা প্রতিবিম্ব) প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন। কিন্তু সে যদি ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা না করে বা আশু ফল পাইতেছে না বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার চিত্তদর্পণ কোনদিনই পরিস্কার হইবে না এবং তজ্জনিত দুঃখকষ্টরূপ ফলভোগ তাহাকে করিতেই হইবে। সুতরাং আমার মনে হয়, failure বলে কোন কথা থাকিতে পারে না। আমি failure বলে কোন কথা আছে বলে বিশ্বাস করি না। failure বলতে যদি কিছু থাকে, তাহা অন্ততঃ আমার অভিধানে নাই। কারণ, দেখ তুমি যে কাজটা দু'দিনে করিতে পার, আমার উহা করিতে হয়ত দশদিন লাগিবে; কিন্তু কাজ আমার করা হইবেই।

সুতরাং আমার কথা হচ্ছে সংকল্প যদি দৃঢ় থাকে তাহা হইলে কোন দিনই failure আসতে পারে না। বরং বার বার failureএর ফলে সংকল্প আরও দৃঢ় হইয়া যায় এবং চেষ্টাও দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়। কবির একটি শিশু কবিতা হইতে দেখ, "হাঁটিতে শিখে না কেহ না খেয়ে আছাড়।" এই শিশুরাই তার জ্বলন্ত উদাহরণ। নয় কি বাবা?

২নং—তুমি গীতোক্ত "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" উল্লেখ করিয়া বলিয়াছে যে "কর্ম্মের ফলের জন্য একান্ত স্পৃহা না থাকিলেও কর্ম্মের কৃতকার্য্যতায় একটা আনন্দ আছে, ইহা অস্বীকার করিতে পারি না বা ঐ আনন্দ না পাইলে সে কর্ম্মের স্পৃহা কমিয়া যায়।"

উত্তর—দেখ বাবা, আনন্দ বা নিরানন্দ দুইটিই মনের অবস্থা মাত্র। এখন, এই যে স্পৃহা কথাটি বলিলে, দেখিতে হইবে উহার উৎপত্তি কোথায়? তোমার মনের অনুকূল অবস্থা বা ফললাভের ফলে যে আনন্দ এবং স্পৃহা জন্মিল তাহাতেই তুমি মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িলে এবং তাহাই পাইবার জন্য ব্যাকুল হইলে, কিন্তু যদি উহার অর্থাৎ কর্ম্মের ফল তোমার মনের প্রতিকূল হইত, তাহা হইলে তুমি তাহাতে বীতস্পৃহ এবং নিরাশ হইতে। তাহা হইলে দেখা গেল কি, তুমি বাস্তবিকই ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করিলে না। যদি করিতে তাহা হইলে তাহার ফল—আনন্দ বা নিরানন্দ যাহাই আসুক তাহাতে তুমি মোহগ্রস্ত হইয়া বিচলিত বা আনন্দিত হইতে না। দেখ, শ্রীভগবান এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে পুনরায় বলিলেন—

"সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ,
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।"

—সুতরাং আমার বক্তব্য, কর্ম্মের যাহা ফল আসুক, তাহাতে অতিরিক্ত আনন্দ বা দুঃখিত হইবার কিছুই নাই। যিনি তোমায় কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার উপরই ছাড়িয়া দাও। তুমি মাত্র কর্ম্মী হিসাবে কর্ম্ম করিয়া যাও। তাহা হইলেই কর্ম্মের কোনপ্রকার ফলই তোমায় স্পর্শ করিতে পারিবে না।

বাবা, জগৎ যখন সৃষ্টি হইয়াছে তখন জগৎপতিও রহিয়াছেন, কর্ম্ম যখন সৃষ্টি হইয়াছে তখন কর্ম্মকর্ত্তাও রহিয়াছেন। অতএব সেই কর্ম্মকর্ত্তার উপর বিশ্বাস রাখিয়া আপ্রাণ চেষ্টায় কর্ম্ম করিয়া যাও, আর মনে মনে বলিতে থাক—

"প্রাতঃ প্রভৃতি সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎকরোমি জগন্নাথস্তদেব তব পূজনম্॥"

—হে ঠাকুর, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, পুনরায় সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত, আমি যাহা কিছু বলিতেছি তাহা তোমারই পূজার নিমিত্ত করিতেছি ; তুমি গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হও। শিবমস্তু।

আশা করি তোমার পত্রের উত্তর পাইলে। অধিক কি লিখিব। এ শরীর একরূপ। পত্রোত্তরে তোমাদের কুশল দিও। আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্বজিৎ।

(৫৩)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
১০।২।৪৯

পরম স্নেহভাজনেষু—

বাবা…, শান্তিময় শ্রীগুরু ভগবান তোমাদের শোক সন্তপ্তচিত্তে শান্তিবারি বর্ষণ করুন ইহাই প্রার্থনা করি। আজ ২।৩ দিন হইল তোমার একখানি পত্র পাইয়াছি। কিন্তু ৺সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে সন্তানগণের আগমন ও নিষ্ক্রমণে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় ঠিক সময়মত উত্তর দিতে পারি নাই। আশা করি তজ্জন্য তুমি দুঃখিত হইবে না। তোমার পিতৃবিয়োগের সংবাদ আমাকে অত্যন্ত দুঃখিত করিয়াছে। আমার এ দুঃখ যিনি চলিয়া গিয়াছেন তাঁহার জন্য নহে, দুঃখ এই শোকসন্তপ্ত পরিবারটীর জন্য।

শোন, এ সম্বন্ধে তোমায় ২।৪টি কথা বলিতে চাই। এ জগৎ কর্ম্মক্ষেত্র। জীব এ জগতে কর্ম্ম করিতে আসে, যতদিন তার কর্ম্মের মেয়াদ থাকে, ততদিন সে ইহজগতে থাকে। তাহার মেয়াদ ফুরাইয়া গেলে সে তাহার স্থানে ফিরিয়া যায়। এই জন্ম মৃত্যুর দার্শনিক তথ্য অনেক বড়, পত্র দ্বারা ইহা ঠিক বুঝান যায় না। সাক্ষাতে আলোচনা করিলে ইহার একটা সুমীমাংসা হইয়া যায় এবং আমার মনে হয় প্রত্যেক সংসারী জীবেরই এ বিষয়ে

আলোচনা করা কর্ত্তব্য এবং এই তথ্য সম্যকরূপে অবগত হইয়া সংসারে বিচরণ করিলে সংসারের দুঃখ কষ্ট ও জ্বালা বহুলাংশে লাঘব হয় বলিয়াই আমার ধারণা। অজ্ঞান বা মোহ হইতে মমত্ব-বুদ্ধির সৃষ্টি হয় এবং এই মমত্ব-বুদ্ধি শোক ও দুঃখ আকারে জীব-মনে প্রকাশ পায়। অতএব অজ্ঞানতা নাশই দুঃখের নাশ। এই অজ্ঞানতা নাশ করিতে হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন। আলো দ্বারা যেমন অন্ধকার দূর হয়, জ্ঞানালোকের দ্বারা সেইরূপ অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়। এই জ্ঞান বিচারসাপেক্ষ। নিত্যানিত্য বিবেকের দ্বারা বিচারে প্রবৃত্ত হইলে অজ্ঞানতা বহুলাংশে ক্ষয় হয়। গুরু সন্নিধানে বাসপূর্ব্বক পরিপ্রশ্নাদির দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করিতে হয়। পত্রেতে সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা শোক নিবারণ হয় না। অতএব বাবা, যদি ২।৩ দিনের জন্যও এখানে আসিতে পার, তাহা হইলে আমি সাধ্যমত তোমার সেবা করিতে চেষ্টা করিব।

গুরুর concrete realisation নিশ্চয়ই হয়। তাঁর concrete realisation পাইতে হইলে, সেই গুরু বা জ্ঞানসত্ত্বার যে concrete figure বা স্থূল বিকাশ, তৎসন্নিধানে বাসপূর্ব্বক ঐকান্তিক প্রেম ও নিষ্ঠা সহকারে গুরুসেবা দ্বারাই concrete realisation হইয়া থাকে এবং ইহাই ঋষিবাক্য বলিয়া আমার জানা আছে।

সত্য চিরকালই সত্য। ইহা চিরন্তনী—ইহার পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন কোনদিনই নাই। ইহা নিত্য শাশ্বত এবং একই ভাবে সর্ব্বগ। ইহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই। ইহা

নিত্য ও সনাতন। এবং এই সত্যই আত্মা বা ভগবান। এই সত্যকে লাভ করিবার প্রচেষ্টাই হইয়েছে সাধনা। আমার অনুরোধ, তুমি ২।১ দিনের জন্য আসিয়া তোমার অন্তরের সন্দেহ বা সংশয় পরিপ্রশ্নাদির দ্বারা গুরুর নিকট সমস্ত মীমাংসা করিয়া লইতে পারিলে অধিক শান্তি বা আনন্দ পাইবে। তোমাদের নিত্য কুশল কামনা করি। আশ্রমস্থ মঙ্গল। খুসীমা কেমন আছে? তাহাকে আশীর্ব্বাদ দিও। আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(৫৪)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
২২।২।৪৯

পরম স্নেহভাজনেষু—

বাবা…, পরম করুণাময় শ্রীগুরু ভগবানের স্নেহ ও করুণাধারা তোমার শিরে নিত্য বর্ষিত হউক। মা বেবীকেও আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ দিও। মিন্টুকে স্নেহাদর দিও।

তোমার পত্রখানি পাঠে পরম পরিতৃপ্ত হইলাম। পত্রটি অতি সুন্দর এবং ইহার প্রতিটি ছত্রে তোমার অন্তরের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীভগবান তোমাদের অশেষবিধ কল্যাণ প্রদান করুন।

আমারও তোমাদের একবার দেখিতে ইচ্ছা হয়। অনেক দিন তোমাদের দেখি নাই। যাক্ অধীর হইয়া লাভ নাই। সময়ে সকলই হইবে। ভগবানের নিকট জীব যাইতে চাহিলে কোন কিছুই তাহাকে বাধা দিতে পারে না। কেবল চাই প্রবল ইচ্ছা ও একান্ত ভক্তি। ইহাই তাঁহার নিকট পৌছিবার পথ সুগম করিয়া দেয়।

এই সংসার শিক্ষা ও পরীক্ষার স্থল। যেমন যেমন শিক্ষা হয় তেমন তেমন পরীক্ষাও হয়। ভগবান নিজেই পরীক্ষা করিয়া জীবকে তাহার শিক্ষার ফলাফল বুঝাইয়া দেন। জীব যতক্ষণ না শিক্ষায় পরিপক্কতা লাভ করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত শিক্ষা চলিতে থাকে। অনেক সময় বিরহের মধ্য দিয়া, ব্যথা ও বেদনার ভিতর দিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়া তাঁহার সঙ্গের মাধুর্য্য ও উপকারিতা তাহাকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। বিশ্বাস দৃঢ় করিবার উপায় সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করা এবং জীবনের প্রতিটি কর্ম্মে তাঁহার মঙ্গল হস্ত কিরূপভাবে আমাদিগকে কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তরে নিয়োজিত করিতেছে, জীবনের চলার পথে সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, শান্তিতে অশান্তিতে, সকল সময়ে সাথীরূপে থাকিয়া আমাদের অন্তরে বিচার শক্তি জাগাইয়া দিয়া নিত্যানিত্য বিবেক ফুটাইয়া তুলিতেছেন, ইহা সম্যক প্রকারে অনুভব করিতে পারিলে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ও প্রেম গাঢ় হয় বলিয়া আমার জানা আছে।

শ্রীগুরু ভগবান নিত্য মঙ্গলময়, তিনি আমাদের জন্য যাহাই কিছু করুন না কেন, তাহা অবশ্যই আমাদের মঙ্গলের জন্য, ইহা সকল সময় স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করিবে।

বাবা হতাশ হইবার কিছুই নাই। জীবনের প্রতিটি কার্য্যই তাঁহার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইতেছে এই বিশ্বাসটুকু লইয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইয়া চল, শান্তি অবশ্যই পাইবে। মনকে সকল সময়ই তাঁর চিন্তায় পরিপূর্ণ রাখিতে চেষ্টা করিবে।

এ শরীর একরূপ। মধ্যে মধ্যে পত্র দিয়া সুখী করিও। তোমাদের নিত্য কুশল কামনা করি। আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(৫৫)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
৪।৩।৪৯

পরম স্নেহভাজনেষু —

বাবা..., স্নেহঘন অন্তরদেবতার স্নেহ ও করুণাধারা তোমার শিরে নিত্য বর্ষিত হউক। পরম স্নেহময় প্রিয়তম ঠাকুরের শুভেচ্ছা ও কৃপা তোমার জীবনের মূলকেন্দ্র হউক। তোমার ২৮।২ তারিখের লেখা পত্রখানি গতকল্য ৩।৩ তারিখে পাইলাম এবং পত্রপাঠে সবিশেষ অবগত হইলাম। ইতিপূর্ব্বে তোমার নিকট হইতে কোন পত্র না পাইয়া, তোমার সবিশেষ সংবাদ জানিবার জন্য তোমাকে খামে একখানি পত্র দিয়াছি, আশা করি তাহা পাইয়াছ। তোমার এই পত্রটী আমার পত্রের সহিত cross করিয়াছে।

৺শিবরাত্রির সময় তোমাকে আমার কাছে পাইবার জন্য খুবই আশা করিয়াছিলাম। তুমি তোমার মেজ মামাকে লইয়া দ্বিজেশের ওখানে গিয়াছিলে, সে সংবাদ দ্বিজেশের পত্রে জানিয়াছি, কিন্তু details কিছু জানি নাই। হরিসাধনের ওখানে দেখা করিতে গিয়াছিলে, সে সংবাদও পাইয়াছি। কিন্তু কোন জায়গারই details কিছু পাই নাই। আমি অত্যন্ত আশা করিয়াছিলাম, তুমি হয়ত এই সুযোগে আমার সহিত একবার দেখা করিয়া তবে ফিরিবে।

যাক, এবারে তোমার পত্রটীর উত্তর দিতে চেষ্টা করি।

১। সংসারে স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি লইয়া বাস করিয়া কোন কিছুর আয়ের চেষ্টা করা যে অন্যায়, ইহা আমার জানা নাই। পরন্তু কোন জীব এইরূপ কতকগুলি প্রাণীর ভরণ-পোষণের ভার তুলিয়া লইয়া চাকুরী বা ব্যবসা ইত্যাদি কোন একটি পন্থা অবলম্বন না করিয়া চুপচাপ ঘরে বসিয়া থাকিবে বা চক্ষু বুঁজিয়া বসিয়া ধর্ম্ম করিবে, ইহা আমার মতে অত্যন্ত রুচিবিরুদ্ধ এবং খুবই অন্যায়। ইহাতে ভগবান সন্তুষ্টের পরিবর্ত্তে অসন্তুষ্ট অধিক পরিমাণে হন, কারণ, তিনি তোমাকে ঐ প্রাণীগুলির সেবার ভার দিয়াছেন। শাস্ত্রমতে সেবা একটী বিশেষ ধর্ম্ম এবং তপস্যার একটি বিশেষ অঙ্গ। তুমি যদি 'আমার পুত্র', 'আমার কন্যা' 'আমার স্ত্রী' ইত্যাদি বোধ নিয়ে সেবা করিতে থাক তাহা হইলে সেটা সেবা করা নয়। কিন্তু যদি মনে কর, তোমার অধীনস্থ প্রাণীগুলির মালিক ভগবান স্বয়ং এবং তুমি শ্রীভগবান বা শ্রীশ্রীঠাকুরের কর্ম্মচারীরূপে ঐ প্রাণীগুলির সেবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছ এবং বেশ নিষ্ঠার সহিত তাহাদের সেবা করিতে চেষ্টা করিয়াছ, তাহা হইলে তোমার অন্যায় হইবে না। অতএব হয় ইহারা আমার সামনে হইতে সরিয়া যাক, নয়ত আমার বুক থেকে সরিয়া যাক ইত্যাদি চিন্তা অন্যায়। তুমি হয়তো বলিবে, তিনি যখন সেবা করিবার ভার দিয়াছেন, তখন তিনি তাহাদের সেবার বস্তু অর্থাৎ অর্থ সেই পরিমাণ দিলেন না কেন বা তৎপরিমাণ অর্থ উপার্জ্জনের জন্য আমাকে কষ্ট করিতে হইবে কেন? ইহার উত্তর অর্থ

উপায়ের দ্বারাই উহাদের সেবা করিতে হইবে অর্থাৎ উহাদের সেবা করিবার জন্য অর্থ ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে যে পরিশ্রম, সেই পরিশ্রমটাই হচ্ছে তপস্যা। মাত্র বুদ্ধিটি রাখিতে হইবে যে আমি ভগবানেরই বিভিন্নরূপের সেবা করিতেছি এবং তাহাদের সেবার জন্যই অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছি। অতএব ভগবান বা গুরু বা ঠাকুর যদি তোমার প্রিয়তম হন এবং এই সংসার ও সংসারস্থ জীবনিচয় যদি তাঁহারই হয় এবং তাহাদের পরিতুষ্টি যদি ঠাকুরের পরিতুষ্টি বিধান করে, ইহা যদি যুক্তিসঙ্গত হয় তাহা হইলে তাহাদের জন্য যে পরিশ্রম করিতে হয় তাহার জন্য কোন দুঃখ বোধ হয় না; পরন্তু আনন্দ হয়, ইহাই আমি জানি।

এইবার তোমার চাকুরীস্থলের কথা। তুমি ঠিকই লিখিয়াছ, তোমাদের পক্ষে উহাই হিমালয়ের গুহা। স্মরণ রাখিও, যাহা কিছু করিতেছ, উহা তপস্যাই। যাক, তোমার কর্তৃপক্ষের ব্যবহার সত্যই মর্ম্মন্তুদ। তোমার পদোন্নতি বা আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ সচেতন এবং আশা করি তিনি অচিরাৎই কৃপা করিয়া তোমাকে স্থানান্তরিত করিবেন। শ্রীগুরু নারায়ণ তোমার সহায় হোন, তোমার অক্লান্ত পরিশ্রমের যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করুন। আমি খুবই ভাল বুঝি এবং এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত যে S.D.O. প্রভৃতি হওয়ার আসক্তি তোমার ভিতর কোনদিনই ছিল না, আজও নাই। তোমার চাহিদা খুব বেশী নয়। তুমি চাও, এমন একটি কাজের ব্যবস্থা হয় যাহাতে

তোমার অধীনস্থ প্রাণীগণের খাওয়া থাকার অসুবিধা ও কষ্ট না হয় এবং তুমি তোমার প্রিয়তম দেবতার সঙ্গে অন্ততঃপক্ষে মানসিক ভোগ করিতে পার, অর্থাৎ তাঁর চিন্তায় তোমার প্রতিবন্ধক না আসে। আশা করি, করুণাময় ঠাকুর তোমাকে এ অবস্থা শীঘ্রই দিবেন।

২। মেয়ের বিবাহ—দেখ, এই বিবাহ জিনিষটা জন্মান্তরীণ ব্যবস্থা। পাত্রীর পাত্র এবং পাত্রের পাত্রী ইহা পূর্ব্বজন্ম হইতেই স্থিরীকৃত থাকে। ইহার ব্যতিক্রম কেহ কোনদিন করিতে পারে নাই, কোনদিন করিতে পারিবে বলিয়াও আমার আশা নাই। ইহার সময় আছে, স্থান আছে, ব্যবস্থা আছে। পাত্রী বা পাত্রের বিবাহের সময় উপস্থিত হইলেই অভিভাবকদের মনে একটি প্রচেষ্টা জাগ্রত হয় এবং তখন তাহাদের উপযুক্ত জীবনসঙ্গীরা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ব্যবস্থাও প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী হইয়া যায়। ইহাই যদি শাস্ত্রবাক্য বা গুরুবাক্য হয় তখন আমাদের হাঁকপাঁক করিয়া কোন লাভ নাই। আর হাঁকপাঁক করিলেও কোন ফলই হইবে না। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার ভগ্নির বিবাহে আমি পাইয়াছি। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব যে সমস্ত ব্যঙ্গোক্তি বা তথাকথিত খেদোক্তি বা গতানুগতিক সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, ইহা তাঁহাদের সংস্কার ও কর্ত্তৃত্বাভিমান প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তুমিতো বাবা, এই সমস্ত উক্তি কোনদিনই গ্রাহ্য কর নাই তবে আজ কেন অধীর হইতেছ? বিশ্বাস রেখো, শ্রীভগবান মঙ্গলময়, তিনি তোমার পিতামাতা, গুরু, বন্ধু, আত্মীয় সবই। তাঁহার ব্যবস্থায়

অধীর হইতে নাই বা দুঃখ করিতে নাই। তোমার পক্ষে যেরূপ-ভাবে থাকিলে, যেরূপ ব্যবস্থা করিলে ভবিষ্যতে অনন্ত সুখ নিশ্চিত হইতে পারিবে, তোমার জন্য কৃপা করিয়া তিনি সেই ব্যবস্থাই করিতেছেন। লোকের কথায় চঞ্চল হইয়া খেয়ালের মাথায় হঠাৎ কোন কিছু করিয়া ফেলিলে পরে দুঃখই ভোগ করিতে হইবে। যাক, আমি তোমার সম্বন্ধে যতদূর দেখিয়াছি বা জানিয়াছি তাহার দ্বারা তোমাকে ইহাই বলিতে চাই, তোমার সবদিক দিয়াই শুভদিন আসিয়াছে। আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা কর, নিজেই ইহার সত্যতা বুঝিতে পারিবে।

আশ্রমে উপস্থিত ২।৩ জন আছে। বেশী কেহ নাই। মুরলী ডাক্তার সম্বন্ধে তাহার পত্রেই জানিতে পারিবে। সে এই সঙ্গে তোমাকে পত্র দিল। এ শরীর একরূপ। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি। পত্রোত্তরে কুশল দিও। সকলকে আশীর্ব্বাদ দিও। আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(৫৬)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
৩।১।৪৯

স্নেহাস্পদেষু—

বাবা…, শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদ লও। তোমার পত্রপাঠে সবিশেষ অবগত হইলাম।

দাদামণির নিকট হইতে গ্রন্থখানি পেয়েছি। পাঁজি দু'খানিও কলিকাতা থেকে পেয়েছি। তোমার আর উহা কিনতে হবে না। রাঁচি এখনও যাওয়া হয় নাই। একের পর এক ছেলেরা আসছে। আমি যেখানেই থাকি, আশ্রমের ঠিকানায় পত্র দিলেই আমি যথাসময়ে পাব। বাহিরে কোথাও গিয়ে বেশী দিন থাকলে, তোমাদের সংবাদ দিব।

দেখ বাবা, মহাপুরুষরা কেন যে অন্যমনস্ক থাকেন তা, তাঁর অন্তরঙ্গ ২।১টি ছাড়া অপরে বুঝতে পারে না। তারা আপন আপন রুচি অনুযায়ী তার ব্যাখ্যা করে। তাঁদের চিত্ত সকল সময় জগতের উপকারে নিয়ত থাকে। কোথাও কাহারও—বিশেষতঃ কোন সন্তানের যদি কোনও ভাবী অমঙ্গল তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিতে পড়ে, তবে কেমন ক'রে সেটাকে কাটিয়ে দেওয়া যায় সেজন্য তাঁরা সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন। অথচ দৈনন্দিন জীবনও

তাঁদের যাপন করতে হয়। সে সময় মনটা স্বভাবতঃই অন্তর্ম্মুখীন থাকায়, বহির্বিষয়ে কিছু এলোমেলো ভাব হয়। দোলের সময় সেইরূপ একটী ব্যাপার হয়েছিল। ছেলেরা ঠাকুরের ভাব বুঝতে না পেরে, যা তা আপন রুচি অনুযায়ী বলেছে। এখন তাকে বাঁচাতে হলে একটা ঘটনার অবতারণা করতেই হবে। কারণ, কিছুটা ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ একেবারে ক্ষয় হয় না। সন্তানকে সেই কঠিন প্রারব্ধের ভোগ থেকে বাঁচাতে গিয়ে, মহাপুরুষদের নিজেকে কিছু ভোগ করতে হয়। নচেৎ আশ্রিত সন্তান সেই ঘটনার স্রোতে একেবারে তলিয়ে যাবে। ঠাকুরের ত আর আপন পর ভেদ থাকে না। অপরের দুঃখ দেখলে, কঠিন প্রারব্ধ ভোগ চোখের সামনে পড়লেই তাকে উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করেন। তাতে তাঁর যত কষ্টই হোক।

তোমার কলমের বিষয় যা বলেছ, তা তোমার বিশেষভাবে সন্ধান নেওয়া উচিত। ঠাকুরের আশ্রয় পেয়েছে বলেই ত আর একদিনে সকলের স্বভাব বদলাইয়া যায় না। কত চরিত্রের লোক আসে ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর যদি তার বিন্দুমাত্রও সদ্‌গুণ দেখেন তবে তাকেই আশ্রয় দেন এবং নানাভাবে তার চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করেন।

তোমার সাধন-জীবন সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ, তাতেও তোমার ব্যস্ত হবার কিছু নাই। দেখ, বহু বহু জন্মের কর্ম্মসংস্কার পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। তাদের নাশ না হলে, কেমন ক'রে তুমি উন্নতি বুঝবে? সময় তো লাগবেই কিছু। দেখ, তোমার এই বর্ত্তমান

বয়সে পৌঁছাতে তোমার কতদিন লেগেছে। আর তুমি কতদিনই বা ঠাকুরের সঙ্গ করেছ যে এর মধ্যে কিছুই হল না বলে ব্যস্ত হয়ে পড়ছ। শাস্ত্রও বলেছেন—"নশ্বরমানেন লভ্য।" সাধন-জীবনের প্রধান সম্বল ধৈর্য্য। ধৈর্য্য মানেই গুরুতে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস। যার এই সম্পদ যত বেশী, সে তত শীঘ্র গুরুর করুণা অনুভব করে।

যাক, পত্রে আর বিশেষ কিছু লেখা সম্ভব নয়। Good Fridayর ছুটিতে যদি আসতে পার তো ভাল হয়, সে সময় এ সব বিষয়ে বিশদ আলোচনা চলতে পারে। এ শরীর উপস্থিত ভালই। আশ্রমস্থ অন্যান্য মঙ্গল। আশীর্ব্বাদ লও। আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(৫৭)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
৮।৪।৪৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

মাষ্টার মহাশয়, আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রীতি আলিঙ্গন গ্রহণ করুন। দীর্ঘদিনপরে পুনরায় আপনাকে আমার কাছে পাইয়া বড় তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলাম। আপনি যে এই বৃদ্ধ বয়সে এতখানি রাস্তা, আপনার এই বয়সে যাহা একরূপ দুর্গম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এবং অত কষ্টস্বীকার করিয়া আমার মত একজন নগণ্য ব্যক্তির সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, এই চিন্তাটাই আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিতেছে। কিন্তু এমনই একটা কর্ম্ম-ব্যস্ততার সময় আসিলেন, যেসময় আপনার সহিত আলাপ-আলোচনায় কাটাইব, সে সুযোগ আমার অদৃষ্টে ঘটিল না। কতদিন পরে আপনাকে পাইলাম, কিন্তু খোলাখুলিভাবে আলাপ করিতে পারিলাম না; ইহাই আমার দুঃখ। যাক, অতদিন পরে যে আপনাকে কাছে পাইলাম, ইহাই আমার আনন্দ।

এইবার আপনার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। আপনার সাধন-জীবনের অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা সম্বন্ধে বহুবারই আমার সহিত আলোচনা করিয়াছেন এবং আপনার সমস্ত শুনিয়াই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছি। অথচ কেন যে আপনার মনঃপুত

হইতেছে না তাহা বুঝতে পারিতেছি না। যাহা হউক, এখন আপনাকে কতকগুলি কথা বলিব,—

(১) সাধনকালীন ঐ যে একটা তন্দ্রাভাব হয় লিখিয়াছেন এবং উহা আপনার বিশেষ প্রতিবন্ধক বলিয়া লিখিয়াছেন, আমার মনে হয়, উহা তন্দ্রা নয়, একটা আবেশময় অবস্থা। সাধকদের অনেক সময় ঐরূপ একটী আবেশময় অবস্থা আসে। ঐ অবস্থাটিকে উপেক্ষা করা উচিত নয় বা উহাকে সাধনার অন্তরায় বলিয়া বিচার করা ঠিক নয়। আমার মনে হয়, এখন হইতে ঐ অবস্থাটিকে উপেক্ষা না করিয়া, ***যখনি ঐরূপ অবস্থা আসিবে, তখনই ঐ অবস্থার স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিতে চেষ্টা করিবেন এবং ঐ অবস্থায় কি লাভ হয় তাহা আমাকে জানাইবেন।***

(২) আপনার দ্বিতীয় কথা হইতেছে, "সাধনকালীন মন ইষ্ট চিন্তা ছাড়িয়া নানাবিধ সাংসারিক চিন্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়, এটি হয় কেন?" আগে তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করা যাক,—২৪ ঘণ্টার মধ্যে মন বেশী সময়ই সাংসারিক চিন্তায় সাংসারিক আলোচনায়, সাংসারিক ভাবধারায় ভাবিত হইয়া থাকে। তাহা হইলেই আমরা দেখিতে পাইতেছি, আমাদের প্রীতি ভগবৎবুদ্ধি ছাড়া সাংসারিক বুদ্ধিতেই অধিক। কাজেই মন তাহার প্রীতিকর চিন্তায় অধিক ব্যস্ত থাকিতে চায় এবং উহাই একরূপ তাহার অভ্যস্ত হইয়া যায়, ফলে তাহাকে যখন শান্ত করিতে চেষ্টা করা হয় বা কেন্দ্রীভূত করিতে চেষ্টা করা হয়, সে তখন ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাহার স্বভাবমত কার্য্য

করিতে থাকে। এ ক্ষেত্রে উচিত হইতেছে, সাধকদের সাধনকালীন অবস্থায় বৈষয়িক সঙ্গ ছাড়িয়া ভগবৎবিষয়ক চিন্তা, শাস্ত্রাদি গ্রন্থপাঠ ও সৎ আলোচনায় অধিক সময় ব্যয় করা। এই কারণেই শাস্ত্র যোগীদের যোগাভ্যাসকালীন আহার, বিহার, স্থান, কাল প্রভৃতির নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের মনের স্বভাব ঐরূপ চঞ্চলতা; তাহার উপর যদি আমরা নানারূপ চিন্তাধারায় ঐরূপ চঞ্চলতার প্রশ্রয় দিই, তাহা হইলে সে কোনদিনই স্থির হইতে পারিবে না। কাজেই সাংসারিক কার্য্য ও চিন্তা যতটুকু না করিলে নয়, মাত্র ততটুকু করিয়া বাকী সকল সময় শাস্ত্রাদি আলোচনা ও আত্মবিচার ইত্যাদির দ্বারা সময় অতিবাহিত করিলে অধিকাংশে সুফল পাওয়া যায়।

(৩) আপনি ঈশ্বর সম্বন্ধে মনে যে ভাব পোষণ করেন, সে ভাব আমার বিবেচনায় একদেশদর্শীর ভাব। জগৎ একদিকে যেমন দুঃখময়, অপরদিকে তেমনি সুখময়। সৃষ্টি কেবলমাত্র দুঃখ হয় নাই, সুখও হইয়াছে। আপনি লিখিয়াছেন ক্ষুদ্র শক্তি ও ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানবকে বিধাতা কর্ম্মফলে বদ্ধ করিয়া নানাপ্রকার দুঃখ-ভাগী করিতেছেন। আচ্ছা, এইবারে আলোচনা করা যাক। তাঁহাকে যখন বিধাতা বলিয়া অভিহিত করিলেন, তিনি যে মাত্র দুঃখই বিধান করিয়াছেন এমত নয়, সুখও বিধান করিয়াছেন। সৎ কর্ম্মের ফল সুখ, এবং অসৎ কর্ম্মের ফল দুঃখ। সুখ এবং দুঃখ কর্ম্মের ফলমাত্র, কাজেই সুখ, দুঃখ সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি হয় মাত্র কর্ম্ম। কর্ম্মের স্বভাব ফল প্রসব করা। কাজেই সে যে মাত্র

দুঃখরূপ ফল প্রসব করিয়াছে এরূপ নয়, সুখরূপ ফলও প্রসব করিয়াছে। সুখ ও দুঃখ বিধাতা সৃষ্টি করেন না, ইহা কর্ম্ম হইতে জাত হয়।

শাস্ত্র উক্তি—

"সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা
অহং করোমীতি বৃথাভিমানম্
স্বকর্ম্মসূত্রৈ গ্রথিতাহি লোকাঃ।"

কাজেই এ ক্ষেত্রে দেখা গেল জগৎমাত্র দুঃখময় নয়, সুখময়ও। এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছে কিরূপ কর্ম্ম হইতে সুখ বা দুঃখ আসিতে পারে। আমরা আগেই শুনিলাম, সৎকর্ম্মের ফল সুখ এবং অসৎ কর্ম্মের ফল দুঃখ। এই সৎ ও অসৎ কাহাকে বলে? নিত্য, স্থিতিশীল অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া যে কর্ম্ম তাহাই হইতেছে 'সৎ', আর অনিত্য বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া যে কর্ম্ম তাহাই হইতেছে 'অসৎ'। অনিত্য শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তন, একভাব থেকে অন্যভাবে গমন, আর নিত্য শব্দের অর্থ অপরিবর্ত্তনীয় অর্থাৎ একই ভাবে স্থিতি। অন্য কথায় বলা যায়, মনের শান্তভাব সুখ আর অশান্তভাব দুঃখ সৃজন করে। অতএব যিনি নিত্য, যিনি শাশ্বত, যিনি চিরশান্ত তাঁকে লক্ষ্য করিয়া যে কর্ম্ম হয়, তাহাই সুখদায়ক হয়; আর যাহা অল্পক্ষণ স্থায়ী, যাহা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল, তাহাই দুঃখদায়ক। শাস্ত্রীয় প্রমাণ— "নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্।" আপনি আপনার

পত্রতেই বলিয়াছেন, 'ক্ষুদ্র শক্তি' ও ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব।' অতএব যেখানে মানবের বুদ্ধি ক্ষুদ্র বা অল্প, সেই অল্প বা শান্ত বুদ্ধির দ্বারা, সেই বৃহৎ বা অনন্ত বুদ্ধিকে ধরা যায় না। কাজেই তাহা দুঃখময় হয়। অতএব বলুন, ঈশ্বরের দোষ কোথায়? ভগবান গীতাতে "অনিত্য অসুখং লোকম্......" বাক্য দ্বারা অর্জ্জুনকে ইহাই বুঝাইয়াছেন যে, "হে অর্জ্জুন তুমি এই অনিত্য ও দুঃখায়তন মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া আমারই আরাধনা কর।" অতএব ইহার দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, দেহ যখন অনিত্য তখন তাহা দুঃখময় হইবেই। কেন না, অনিত্য বা পরিবর্ত্তনশীল বস্তুতে কখন সুখ হইতে পারে না। কাজেই ভগবান ঠিকই বলিয়াছেন। আপনি নিজেই বলিয়াছেন যে, আপনি স্বীকার করেন যে, একটি অসীম জ্ঞানময়ী শক্তি "আমার ভিতরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া আমাদের ক্রমাভিব্যক্তির পথে চালিয়ে নিতেছেন।" আচ্ছা যে শক্তিকে আপনি জ্ঞানময়ী বলিলেন– জ্ঞানময়ী শক্তি অর্থাৎ তার সম্পূর্ণটাই জ্ঞান— যিনি চালাইতেছেন, তিনি নিশ্চয়ই প্রভু বা মালিক। যদি কোন বস্তুকে কেহ চালিত করেন, যদি নিয়মিত করেন, নিয়ন্ত্রিত করেন, পালন করেন, সংহার করেন, তিনি সেই বস্তুর প্রভু বা মালিক। অতএব এত বড় একটা বিশ্ব-জগৎকে যিনি চালাইতেছেন, রক্ষা করিতেছেন এবং সংহার করিতেছেন, সেই শক্তি এই জগতের চালক, প্রভু, মালিক, নিয়ন্তা বা ঈশ্বর। "গতির্ভর্ত্তা প্রভু সাক্ষী নিবাস শরণং সুহৃদ।" তাহা হইলে যিনি এত বড় একটা সৃষ্টি চালিত করিতেছেন, মাত্র

দুঃখের মধ্য দিয়েই চালনা করা তাহার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত নয়। অতএব দেখা যায়, এই চালনার মধ্যে সুখ এবং দুঃখ উভয় অবস্থাই আছে। সুতরাং তিনি কেবল দুঃখময় নন এবং পথও কেবল দুঃখময় নয়। অন্য দিক দিয়ে বিচার করা যাক। আপনি নিজেই বলিয়াছেন, এক জ্ঞানময়ী অসীম শক্তি। তিনি যদি জ্ঞানময়ী, অসীম হন, তাহা হইলে শাস্ত্রীয় উক্তিতে বা সাধারণ বুদ্ধিতে তাঁহাকে ভূমা বলা চলে। অতএব যিনি অসীম, যিনি ভূমা, তিনিই সুখস্বরূপ। অতএব দেখা যায়, সৃষ্টি ক্ষুদ্র নয়, অনন্ত বা ভূমা। ইহার মধ্যে অল্প, সান্ত বা অনিত্য, নাম ও রূপ। কাজেই শাস্ত্র উক্তি "নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্", ইহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি দুঃখময় জগৎ সৃষ্টি করেন নাই, সুখময় জগৎই সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সুখের মধ্যে নামরূপটুকু যে অল্প বা পরিবর্ত্তনশীল, তাহাই মাত্র দুঃখের। অতএব শাস্ত্র উক্তি যে—"সর্ব্বমেব দুঃখ বিবেকীনাম্।" বিবেকীর চক্ষে সর্ব্ব দুঃখময়ই এ কথা অস্বীকার্য্য নয়। কেন না যাহা সর্ব্ব-সর্ব্ব শব্দে খণ্ড খণ্ড ভাব সমন্বয় বুঝায়- এগুলি অল্প এবং ক্ষুদ্র; কাজেই ইহা দুঃখময়। দেখা যায়, জ্ঞানী ব্যক্তি, বিবেকবান ব্যক্তি জগৎকে ব্রহ্মময়ই অনুভব করিয়া থাকেন। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তত্ত্বে যিনি প্রতিষ্ঠিত তিনি বিবেকবান। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই জ্ঞানে যাহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তিনিই যথার্থ বিবেকবান। অতএব জগৎ দুঃখময় কোথায়? কাজেই অবিবেকীর কাছে ইহা দুঃখময় হইতে পারে কিন্তু বিবেকীর কাছে কখনই দুঃখময় নয়। কারণ তাঁহারা জগৎকে

জগৎ বলিয়া দর্শন করেন না, জগৎকে ব্রহ্মময়ই দর্শন করিয়া থাকেন এবং তাঁহারাই বলিয়া গিয়াছেন বা ইহাই মাত্র অনুভূত হয় যে, নামরূপই ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবকে মোহগ্রস্ত করিয়া ফেলে। ফলে, মানব দুঃখভাগী হয়, এই মোহ অজ্ঞানতাপ্রসূত, জ্ঞান কাহাকে বলে—যে বুদ্ধি অনন্তে প্রতিষ্ঠিত তাহাই জ্ঞান আর যে বুদ্ধি সান্তে প্রতিষ্ঠিত তাহাই অজ্ঞান। অতএব ইহাই দেখা যায়, যাহা ভূমা তাহাই জ্ঞান, যাহা সান্ত তাহাই অজ্ঞান। যাহা ভূমা তাহাই সুখ যাহা শান্ত তাহা অসুখ বা দুঃখ। তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধ হয় যে অজ্ঞানতাই দুখ এবং জ্ঞানই সুখ।

(৪) দেখুন, আর একটী কথা ভক্তরা তাহাদের ভগবানকে তাহাদের মনের মধ্যে নানারূপ সৌন্দর্য্যভোগ করিতে প্রয়াসী হয়। একদিক থেকে আপনি ইহাকে কল্পনা বলিতে পারেন। কিন্তু আমার মনে হয়, ভক্তের ভগবানের উপর সৌন্দর্য্য আরোপ, স্থূল সীমাবদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা কল্পনা মনে হইলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে কল্পনা নয়। কেন না যিনি অর্থাৎ আমার যে প্রভু, যে চালক, যে নিয়ন্তা, এই প্রকৃতি সাজে সেজে খণ্ড খণ্ড ভাবধারার ভিতর দিয়ে এই অল্পক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হয়ে অনন্ত ঐশ্বর্য্য বা জ্ঞানের দিকে আমাকে ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন তাহার প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতার ভাব প্রকাশ মাত্র। এখন কথা হইতেছে আপনি যেটিকে হত্যা বলিতেছেন, আমার বিবেচনায়, সেটি হত্যা নয়। আপনার প্রশ্ন—দুর্ব্বল হরিণকে সবল বাঘের দ্বারা হত্যা করান'কে দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার। এ স্থলে আমার

বক্তব্য এই যে, পুত্র যদি কোন অন্যায় কাজ করে, তাহা হইলে তাহার সেই অন্যায় সংশোধন করিবার নিমিত্ত পিতা যদি তাহাকে শাসন করেন তাহা হইলে পিতার কি পুত্রের প্রতি অত্যাচার করা হয়? জগতে আমরা এই যে ত্রিবিধতাপে তাপিত হইতেছি, বেশ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখুন এগুলি আমরা আমাদের কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছি মাত্র। আমাদের কর্ম্মের ফল স্বরূপই ভোগ হইয়া থাকে। কাজেই আমাদের সেই অন্যায় সংশোধন করিবার নিমিত্তই ভগবান আমাদিগকে শাসন করেন। আপনি হয়ত বলিবেন একজন দুর্ব্বল ব্যক্তি অর্থাৎ দরিদ্র ব্যক্তি ধনী ব্যক্তির দ্বারা উৎপীড়িত হইতেছে, অথচ তাহার কোন প্রতিবিধান হইতেছে না। এ ক্ষেত্রে উত্তর হইতেছে, যে দরিদ্র সে তার কর্ম্মের জন্য দারিদ্র্যরূপ ফলভোগ করিতেছে; আর যে ধনী, সে তাহার কর্ম্মের সুখরূপ ফলভোগ করিতেছে। শুভ কর্ম্মের ফল স্বরূপই ধনীর গৃহে জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকে। গীতায় উক্ত হইতেছে "শুচিনাং শ্রীমতাং গেহে।" কাজেই বলুন কোথায় দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার? একজন শুভ কর্ম্মের ফলে শাসন করিতেছেন আর একজন অশুভ কর্ম্মের ফলের জন্য শাসিত হইয়াছে। ইহাই সৃষ্টির নিয়ম। আর একটি দিকে আমরা দেখিতে পাই এমন কতকগুলি অবস্থার মধ্যে পড়িয়া আমরা যখন দুঃখ পাইতে থাকি, তখন সেই দুঃখকে আমাদের প্রতি ভগবানের নিষ্ঠুরতা বলিয়াই অনুমিত হয়। কিন্তু আমরা চিরকাল সাধু গুরুর মুখে শুনিয়া আসিতেছি, ভগবান চির মঙ্গলময়, অনন্ত কৃপাময়। তিনি কখন নিষ্ঠুরের মত কার্য্য করিতে

পারেন না। হয়ত সেই কার্য্যের দ্বারা আমরা আপাততঃ দুঃখ ভোগ করি কিন্তু কয়েকটী দিন ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করিলেই দেখা যায়, ঐ নিষ্ঠুরতারূপ কার্য্যের ভিতর কি অপূর্ব্ব কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। এই দেখুন, আমি ছোট একটী উপমা দেই। আপনার পায়ে একটি ফোঁড়া হইয়াছে এবং সেই ফোঁড়ার যাতনায় আপনি অস্থির হইয়া অনাহারে অনিদ্রায় দিন যাপন করিতেছেন। একদিন আপনার দু'টি বন্ধু আপনার সাথে দেখা করিতে আসিলে একজন আপনার ঐ ফোঁড়াটির চতুষ্পার্শ্বে হাত বুলাইয়া ফুঁ দিয়া অন্যান্য বাহ্যিক উপসর্গ লাঘব করিল। আর যিনি অধিক অভিজ্ঞ, তিনি আপনাকে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া ফোঁড়াটির উপর অস্ত্রোপচার করিয়া দিলেন। ঐ অস্ত্রোপচারকালীন আপনার অব্যক্ত যন্ত্রণার ভোগ হইতে লাগিল কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই আপনার সমস্ত যন্ত্রণা লাঘব হইয়া গেল। আপনি সম্পূর্ণ মুক্ত হইলেন।

এখন বিচার করুন নিষ্ঠুরতা কাহার? শেষোক্ত ব্যক্তির না পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির? এক্ষেত্রে তো ঠিক তাই। পরম কারুণিক কৃপাময় ভগবান মোহগ্রস্ত জীবগণকে এই দুঃখের মধ্য দিয়ে সুখের দিকে এগিয়ে নিচ্ছেন। অজ্ঞানের ভিতর দিয়ে জ্ঞানের আলোক দিতেছেন। নিরানন্দের ভিতরেও অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করাইতেছেন। সাধকের চক্ষে, ভক্তের চক্ষে ভগবানের যখন এই অপূর্ব্ব করুণাময় রূপটি ফুটিয়া উঠে, তখনি সে আত্মহারা হইয়া গিয়া কৃতজ্ঞতা বুদ্ধিতে তাঁহাকে আপনাভাবে নানাভাষায়, নানারূপে স্তুতিগান করিয়া থাকে। ইহা কল্পনা নয় মাষ্টার মহাশয়, নিছক সত্য।

(৫) গুরু সম্বন্ধে আপনার যে মনোভাব, সে বিষয় কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। দেখুন, গুরুতে ভগবানবুদ্ধি জীবের সহজসাধ্য নয়, কেন না ভগবানে কি গুণাবলী আছে না আছে, সমস্তটাই জীবের অনুমান মাত্র। ও সম্বন্ধে জীবের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। কাজেই Idols idealism ঠিক না। আপনি যে লিখেছেন আপনার গুরুকে অশ্বিনী দত্ত বা গৌরীশঙ্করের পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন অর্থাৎ অশ্বিনীবাবু আপনার নৈতিক জীবনের উৎকর্ষতা লাভের পক্ষে সহায়ক ছিলেন, কাজেই সেই সম্বন্ধে আপনি তাঁহাকে আপনার অপেক্ষা কিছু শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। গৌরীশঙ্কর দে গণিতশাস্ত্রে অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন, সেই কারণে তিনি আপনার শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। আর আপনার মতে, গুরু অধ্যাত্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ সেজন্য আপনি তাঁকে সেই সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠত্ব দিতে চান, অন্য বিষয়ে নহে। এই যে অধ্যাত্মশাস্ত্রের কথা বলিলাম, এই অধ্যাত্ম শব্দে আমরা কি বুঝি? আমাদের সাধারণজ্ঞান অধ্যাত্ম সম্বন্ধে ধর্ম্মবিষয়ক। কিন্তু অধ্যাত্ম শব্দের অর্থ হইতেছে যাহা আত্মাকে অধিকার করিয়া আছে। এখন আত্মা মাত্র সূক্ষ্ম ও কারণেতেই পর্য্যবসিত নয়, ইহা স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ত্রিবিধ শরীরেই পরিব্যাপ্ত। কাজেই গুরু সূক্ষ্মজ্ঞানেও যেরূপ অভিজ্ঞ হন, স্থূলজ্ঞানেও সেইরূপ অভিজ্ঞ হন। অন্তর্বিষয়ক এবং বহির্বিষয়ক উভয় জ্ঞানেই তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ। কাজেই তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে বাধা হওয়া সমীচিন নয় বলিয়া আমার মনে হয়। যাক, এ সম্বন্ধে আপনাকে অধিক লেখা বাহুল্য। আপনি এ সমস্ত বিষয় অনেক

জানেন, আমি আর এ সমস্ত আপনাকে কত বলিব। করুণাময় শ্রীভগবান কৃপা করিয়া গুরুমূর্ত্তিতে আপনার সম্মুখে উপস্থিত, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করুন। তাঁর নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য করিতে থাকুন, জীবনে অবশ্যই কৃতকৃত্য হইবেন। এখানে গুরু শব্দে আমি কোন বিশেষ শরীরকে লক্ষ্য করিতেছি না। আমার বক্তব্য, করুণাময় শ্রীভগবান যখন আপনার পক্ষে যে জ্ঞানের প্রয়োজন তখনই আপনার সম্মুখে সেই জ্ঞানাভিজ্ঞের মূর্ত্তি ধরিয়া উপস্থিত হইতেছেন ও তত্তৎ বিষয়ে জ্ঞানদানে আপনার মন ও বুদ্ধিকে পরিপুষ্ট করিতেছেন। তাহা হইলে বুঝিয়া দেখুন, ভগবান কত দয়াময়, কত করুণাময়। এমন দয়াল যিনি তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া কেমন করিয়া থাকা যায় তাহা আমি বুঝি না। আমার হইতেছে না, আমার হইল না, ইত্যাদিবোধে চিত্তের বিক্ষেপই আনয়ন করে। অতএব, আমার এই পত্রের মধ্যে সাধনার সকল অবস্থারই কি করিয়া সমাধান হইতে পারে, তাহার সমস্ত ইঙ্গিতই আছে। আপনি দয়া করিয়া চিঠিখানি ভাল করিয়া পড়িবেন, তাহা হইলে সকল ইঙ্গিতই বুঝিতে পারিবেন এবং সকল বিষয়ে উপকৃত হইবেন বলিয়া আমার মনে হয়।

(৬) আশা করি, আপনার চিঠিখানির যথাযথভাবে আলোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছি। এইবার আপনার সাংসারিক বিষয়ে যে সমস্ত প্রশ্ন আছে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমার বিবেচনায়, আপনার শেষজীবন কোন তীর্থস্থানে অর্থাৎ বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থানের মত স্থানে কাটানই ভাল। যদি একান্ত অসুবিধা

হয় তাহাহইলে পশ্চিমবঙ্গের কোন স্থান অপেক্ষা ফরিদপুরে নীলুর কাছে থাকা অধিক সমীচিন বলিয়া বোধ হয়। Pension এর টাকা ফরিদপুরে কোন Bank এর সঙ্গে ব্যবস্থা করিতে পারিলে সেইখান হইতে টাকা লইবার সুবিধা হইবে বলিয়া বোধ হয়।

ক্ষেপুর স্ত্রীর অবস্থা জানিয়া আন্তরিক ব্যথিত হইলাম। শ্রীভগবান তাহাকে সুমতি দিন। এমত অবস্থায় কাঁচড়াপাড়ায় সমগ্র পরিবারের বাস করা সঙ্গত হইবে না। আমার বিবেচনায়, ক্ষেপু কার্য্যোপলক্ষে কাঁচড়াপাড়ায় থাকিতে চায়, থাকুক। আপনারা সকলে ফরিদপুরে যেমন নিজ বাটীতে ছিলেন তেমন থাকুন।

সুশীল সম্বন্ধে ইহাই বলিতে চাই, উহাকেও ফরিদপুরে কোন ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়, কেন না পশ্চিমবঙ্গে জমি অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য। কাজেই সুশীলের জন্য নূতন কিছু করিতে কিছুদিন অপেক্ষা করিলে ভাল হয়। যদি আপনারা কাঁচড়াপাড়ায় না থাকেন, তাহা হইলে অরুণেরও ওখানে কোন বাড়ী করা সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই সমস্ত চিন্তা লইয়া আপনি মাথা ঘামাইবেন না। আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রদের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত। যাহাই হউক, ক্ষেপু ও নীলুর জন্য একটা স্থান করিয়া দিয়াছেন, এখন সুশীলের জন্য, যাহা তাঁহাকে দিবার মনস্থ করিয়াছেন, তাহা কোন Bank এ রাখিয়া দিবেন। সে তাহার ইচ্ছামত বাটী করিয়া লইবে।

অরুণকে যাহা দিবেন তাহাও তাহার নামে রাখিয়া দিন, সেও তাহার ইচ্ছামত জায়গা ঠিক করিয়া লইবে। আমার বিবেচনায়, এইরূপে প্রত্যেককে independently নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার অবসর দিন। আপনি আর ওসব লইয়া মাথা ঘামাইবেন না। এবং আমার বিবেচনায়, জীবনের শেষ ক'টা দিন নীলুর কাছে ফরিদপুরে থাকিলে ভাল হয়।

আশা করি, আপনার পত্রের যথাযথ উত্তর দিলাম। কিমধিকমিতি। আপনাদের নিত্য কুশল কামনা করি। অত্রস্থ মঙ্গল। আপনি আমার সশ্রদ্ধ আলিঙ্গন গ্রহণ করুন। নিবেদনমিতি—

বিশ্বজিৎ।

(৫৮)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
২৯।৪ ৪৯

শ্রীচরণকমলেষু

বাবা, আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদলিপি মস্তকে ধারণ করিলাম। আপনাদের প্রাণখোলা আশীর্ব্বাদ এ দীন সন্তানের জীবনের চলারপথের একমাত্র সহায় ও সম্বল। এ দীন সন্তানের ঐ সামান্য পূজাতে আপনি পরিতৃপ্ত হইয়াছেন জানিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম এবং আমার জীবনে আপনার পত্রের উত্তরে মাত্র এইটুকুই বলিতে চাই, "তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ"। আমার কেবলই মনে হয়, আমার পিতৃপিতামহের শুভ আশীর্ব্বাদেই এ জীবন কৃতকৃত্য হইতে সক্ষম হইয়াছে, নচেৎ ইহার কোন গুণ নাই। আপনার আর আমাকে দিবার কিছুই নাই, আপনাদের কাছে আমি চাইও না কিছু, মাত্র ঐ একটী জিনিষ ছাড়া, যাহা আপনি আমাকে প্রতিনিয়তই দিতেছেন। আমাকে বিশ্বাস করুন, এ জগতে উহার চেয়ে মূল্যবান জিনিষ আমার কাছে আর কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না এবং আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আপনাদের আশীর্ব্বাদে বঞ্চিত না হই। আপনার আশীর্ব্বাদপূর্ণ চিঠিখানি পড়িয়া আমি

চোখের জল রাখিতে পারি নাই এবং যাঁহারা যাহারা শুনিয়াছে, তাহারাও অত্যন্ত সুখানুভব করিয়াছে। আপনার শরীর কেমন আছে? আপনার যখন যাহা প্রয়োজন আমাকে নিঃসঙ্কোচে জানাইবেন, আপনার সেবা করিতে এ সেবক নিয়ত প্রস্তুত আছে বা থাকিবে।

মঞ্জু ভাল আছে। সে আপনার ও মার চিঠি নিয়ে খুব আনন্দ করছে। উৎসব আসিয়া পড়িয়াছে; সেই কারণে একটু ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। মাকে উৎসবের সময় পাঠাবার কি কোনরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে না? দানুকে আসিবার জন্য তো অনেক করিয়া লিখিয়াছি। আমার তো মনে হয় সে আসিবে। তারপর জানি না সে কি করিবে।

পত্রোত্তরে শ্রীচরণের কুশলদানে সুখী করিবেন। অত্রস্থ মঙ্গল জানিবেন।

শ্রীচরণে নিবেদনমিতি—

বিশ্বজিৎ

(৫৯)

ওঁ

ঝাড়গ্রাম

২৭.৬।৪৯

কল্যাণীয়াষু মা,

শ্রীগুরু ভগবানের স্নেহাশীর্ব্বাদ লও। পত্রপাঠে সবিশেষ অবগত হইলাম। জীব যখন সত্যই ভাল হইতে চায়, জীব যদি সত্যই এ সংসারে আনন্দে থাকিতে চায় তাহা হইলে তাহার পক্ষে, তাহার প্রকৃতির মধ্যে যেগুলি দোষ, অর্থাৎ যাহা তাহার ভাল হইবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায়, সেগুলির দিকে বিশেষ নজর দিতে হইবে এবং সেই প্রকৃতির দোষগুলি যাহাতে অন্তর্হিত হয় বা সরিয়া যায় সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। নিজ প্রকৃতিতে যে সমস্ত দোষ থাকে, নিজের পক্ষে তাহা দেখিয়া সংশোধন করা সম্ভব-পর নয়, কেন না, তাহা যদি হইত, তাহা হইলে সকলেই নিজ দোষ সারিয়া লইতে পারিত। অতএব, কেহ যদি ভাল হইতে চায়, তাহা হইলে সে সকল সময়ই খোঁজে যে তাহার প্রকৃতিতে যে সমস্ত দোষ আছে, তাহা যদি কেহ দয়া করিয়া দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে তাহার পক্ষে সেই দোষগুলি সংশোধন করা বিশেষ সুবিধা হইবে। যদি কোন ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী পূর্ব্ব কর্ম্মফলে কোন সদগুরুর আশ্রয় পাও এবং তাহার যদি ভাল হইবার বাসনা থাকে বা প্রকৃত আনন্দ ও শান্তি পাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রকৃতির যে সমস্ত দোষ আছে তাহা

সংশোধন করিয়া জীবনকে নূতন ছাঁচে ফেলিয়া গঠন করিতে চেষ্টা পায়। তোমাকে আমি বহুবারই তোমার প্রকৃতির দোষগুলি দেখাইয়া দিয়াছি এবং তাহা সংশোধন করিতে বলিয়াছি, কিন্তু তুমি কোন কথাই শুন নাই; নিজ ইচ্ছামত চলিয়াছ। কাজেই তাঁর কৃপা পাইয়াও কৃপা হইতে বঞ্চিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। সকল সময়ই যদি মনে করিতে পার, "ঠাকুর ঠাকুরই", তিনি তোমায় যেরূপ ব্যবহারই করুন তাহা তাঁহার তোমার প্রতি কৃপা ছাড়া কিছুই নয়। তাই বলিযা, তুমি কোন ব্যবহারই তাঁহার কাছে দাবী করিতে পার না, সে অধিকার তোমার নাই। তিনি কৃপা করিয়া তোমাকে যে ব্যবহারই দিন তাহা তাঁহার করুণারই দান বলিয়া যদি হাসিমুখে গ্রহণ করিতে পার তাহা হইলে জীবন ধন্য হইবে। সকল সময় মনে রাখিতে হইবে, তুমি আশ্রমে বাস করিতেছ, আশ্রমোচিত মনোবৃত্তি লইয়া আশ্রমে থাকিতে হইবে নচেৎ আশ্রমে থাকিতে পারিবে না। যাঁহারা আশ্রমে বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে ঐরূপ মনোবৃত্তি থাকা উচিত।

(১) আশ্রমে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক আসেন, অতএব সমস্ত প্রকৃতি তোমার মনের মত হইবে না বা হইবার আশা করিতে পার না। নিজেকে তাঁহাদের মনের মত করিয়া গঠন করিতে হইবে, কেন না আশ্রমে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদের সকলেরই মনে সেবা বুদ্ধি থাকা উচিত। সেবকোচিত বুদ্ধি লইয়া আশ্রমে বাস করিলে যথার্থ আশ্রমোচিত প্রকৃতি হয়। সেবকের একটা প্রধান লক্ষণ হচ্ছে—আত্মত্যাগ অর্থাৎ নিজের চাহিদা বলিয়া কিছুই থাকিবে না।

যাঁহার বা যাঁহাদের সেবা করিতেছ তাঁহাদের চাহিদা মেটানই তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। ত্যাগই একমাত্র শান্তির পথ। নিজের বাসনা, কামনা যতই ত্যাগ করিতে পারিবে, ততই শান্তির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

(২) আশ্রম বা আশ্রমবিরুদ্ধে কাহারও সহিত আলাপ আলোচনা করিবে না।

ফণীবাবু আসেন কি? তোমার সহিত কোনরূপ কথাবার্ত্তা হয় কি? সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত কখন কি কাজ কর সমস্ত বিস্তারিত জানাইবে। বিভা কেমন আছে যদি জান লিখিবে। রোহিণী আসিয়াছিল, তাহার সহিত কি কথা হইল লিখিবে। এক কথায়, সবিশেষ সমস্ত কথা নির্ব্বিকার নিঃসন্দেহে জানাইবে। কোন কিছু গোপন করিবে না। ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, সমস্ত নির্ব্বিচারে আমাকে জানাইয়া দিবে। কোনরূপ কিছু গোপন করিবে না। তুমি তো জান, গোপন আমাকে কিছু করিতে পার না, গোপন করা সম্ভব নয়; আজ পর্য্যন্ত কিছু গোপন করিতে পার নাই। অনন্ত কেমন আছে? প্রতুল কেমন আছে? তারাপদ কেমন আছে? পিসিমা কেমন আছে? তোমার নিজের শরীর কেমন আছে? আশ্রমের সকল সংবাদ দিবে। অত্রস্থ মঙ্গল। তোমাদের নিত্য কুশল কামনা করি। সকলকে আশীর্ব্বাদ দিবে। আনন্দে থাক। ইতি—

পুঃ—অপরাজিতা মা তোমাকে পরে পত্র দিতেছেন। ইতি—

বিশ্বজিৎ।

(৬০)

ওঁ

ঝাড়গ্রাম
১।৭।৪৯

কল্যাণীয় শ্রীমান .....

করুণাময় শ্রীগুরু ভগবান তোমার চিত্তের ভগবৎ বিরোধী ভাবধারাগুলিকে বিদূরিত করিয়া সাধকোচিত মনোবৃত্তি প্রদান করুন ইহাই তাঁর শ্রীচরণে প্রার্থনা রাখি। পত্রখানি পাঠ করিয়া তোমার মনের অবস্থা আমার বুদ্ধি অনুযায়ী বুঝিলাম।

আমার যতদূর জানা আছে, সাধকের বুদ্ধি সেবামুখীন হওয়া উচিত। এই সেবক হইতে গেলে চিত্তের বহুবিধ সংস্কার ত্যাগ করা প্রয়োজন। আমাকে কে সম্মান দিল না দিল, আমাকে কে আদর করিল বা অনাদর করিল, আমি ব্রহ্মচারী সাধক, আর একজন গৃহী ইত্যাদিরূপ ভাব সাধকের উর্দ্ধগতি পথের বিশেষ অন্তরায় বলিয়া আমার জানা আছে। সাধক জীবনে, যোগীর জীবনে, ব্রহ্মচারীর জীবনে, সাধন অভ্যাস কালীন, যোগাভ্যাস-কালীন, আত্মবিচার অভ্যাসকালীন, তিতিক্ষা প্রথম প্রয়োজন। উপরোক্ত ভাবগুলি তিতিক্ষা বিরোধী। সাধক যদি নিজেকে নিয়েই সকল সময় ব্যস্ত থাকে, কে আমাকে কি বলিল, কে আমার কি করিল, কে আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিল ইত্যাদি চিন্তা লইয়াই ব্যস্ত থাকে, তাহা হইলে ভগবৎ চিন্তা করিবে কখন? বিশেষ ক'রে যাঁহারা ব্রহ্মচারী, তাঁহারা, আমি যতদূর জানি, অনুক্ষণ

ব্রহ্ম চিন্তাতেই মনকে নিযুক্ত রাখিতে প্রয়াসী হন। ইহাই যদি ব্রহ্মচারীর definition হয়, তাহা হইলে অন্যান্য চিন্তা তাহার চিত্তে স্থান পায় কিরূপে তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। যে সাধক বাক্যে এবং ব্যবহারে নিজ সত্তাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, প্রকৃত সত্য-লাভ তাহার পক্ষে কেমন করিয়া হইতে পারে ইহা আমার জানা নাই। কথা বলিয়া মানুষকে কয়েকটা দিন ভুলাইয়া রাখিতে পারা যায়, চিরকাল পারা যায় না। যাঁহারা প্রকৃত ব্রহ্মচারী, আমি যত-দূর জানি তাহাদ্বারা ইহাই বলিতে পারি যে, তাঁহারা অনুক্ষণ প্রতি ব্যক্তিতে (স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিচারে), প্রতি বস্তুতে, প্রতিটি অবস্থায়, প্রতিটি চিন্তাধারায় আত্মানুচিন্তনে রত থাকেন। একদিকে আমি আত্মানুচিন্তন করিতেছি বা প্রতি ব্যক্তি বা বস্তুতে সত্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছি এবং অন্যদিকে কোন কোন বস্তুতে বা ব্যক্তিতে অন্যরূপ ভাব পোষণ করিতেছি, ইহা অসম্ভব।

তুমি লিখিয়াছ, "আপনার আশ্রমে" আমি যতদূর জানি, তাহাদ্বারা ইহাই বলিতে পারি যে আশ্রম আমার নয়, আমি তোমাদেরই মত আশ্রমের একজন সেবক মাত্র। আশ্রম শ্রীগুরুর, শ্রীগুরুই একমাত্র মালিক, আমরা সকলেই সেবক। এই কথা আমি বহুবার তোমাকে বলিয়াছি এবং এ আশ্রমের সকল সন্তান ইহা জানে।

যাক, অধিক আর কি লিখিব। করুণাময় ভগবান তোমার কল্যাণ করুন—ইহাই আমি কামনা করি। তুমি সেখানে গিয়া আদরে ও শান্তিতে আছ জানিয়া পরম প্রীতি অনুভব করিয়াছি।

আমার মত একজন অকৃত ও অনুপযুক্ত ব্যক্তির কাছে এসে তোমার একটি বছর বৃথায় ব্যয় হ'ল, ইহাই আমার অনুতাপ। যেখানে তুমি শান্তি পাও, যে স্থান তোমার পক্ষে অনুকূল সেখানেই তুমি অবস্থান করিবে, ইহাতে কাহার কি বলিবার আছে? জীবনে যদি কৃতকৃত্য হইতে পার, সত্যই যদি জীবনলাভ করিতে পার তাহা শুনিয়া আমিই প্রথমে সুখী হইব।

বাবা, বৃথা চিন্তায়, বৃথা আলোচনায়, বৃথা গবেষণায় চিত্তকে কলুষিত না ক'রে, মনে প্রশান্তভাব যাহাতে রক্ষা হয় তাহার জন্য প্রয়াসী হইলে ভাল হয়। আর কি লিখিব। তোমার নিত্য কুশল কামনা করি। অত্রস্থ মঙ্গল। ইতি

বিশ্বজিৎ

(৬১)

ঝাড়গ্রাম
১।৭৪৯

স্নেহাস্পদেষু—

বাবা……,

স্নেহাশীর্ব্বাদ লও। তোমার পত্র পাইলাম। বাবা গুরু কোন এক শরীর বিশেষে আবদ্ধ নন্। তিনি সর্ব্বত্রই আছেন। মধ্যে মধ্যে স্থূল হইতে দূরে অবস্থান করা ভাল। ইহার দ্বারা তোমার চিত্ত কতটা শ্রীগুরুর প্রতি আকৃষ্ট হইযাছে তাহা তুমি নিজেই বুঝিতে পারিবে। শ্রীগুরুর সহিত স্থূলের বিরহ অনুমিত হইলেও, অন্তর্জগতে নিত্যমিলন উপলব্ধি করিতে প্রয়াসী হও। অনুক্ষণ শ্রীগুরুর ভক্ত সঙ্গে লীলা অনুচিন্তন, শ্রীগুরুর উপদেশাবলী নিদিধ্যাসন প্রভৃতির দ্বারা চিত্তকে বিষয় বল হইতে বিমুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে। মন যাহাতে বিভিন্ন বিষয়বস্তু ছাড়িয়া মাত্র প্রিয়তমের চিন্তাতেই ডুবিয়া থাকে, সে বিষয় চেষ্টা করা সাধকোচিত কর্ম্ম। কখনও সৎ-গ্রন্থাদি পাঠ, কখনও ভগবৎ বিষয়ক কীর্ত্তন, কখনও ভগবৎলীলা আলোচনা, কখনও ভগবৎলীলা অনুচিন্তন, কখনও ভগবন্নাম জপ ইত্যাদিতে মনকে নিমগ্ন রাখা সাধকোচিত কর্ত্তব্য। নামে যাহাতে রুচি আসে, নামে যাহাতে প্রেম উপজায়, নামে যাহাতে রতি বর্দ্ধন হয় সে বিষয়ে চেষ্টা রাখিও। গুরু কোনদিন দূরে থাকেন না, তিনি নিত্য শিষ্য-হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে নিত্য বাস করেন। যে সাধক গুরুকৃপা লাভ করিতে

সমর্থ হয়, তাহার সাধনায় সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করিও, গুরু তোমাদের নিত্য সাথী। সর্ব্বান্তঃকরণে প্রসন্ন-চিত্তে তাঁর আদেশগুলি সুচারুরূপে প্রতিপালন করিতে পারিলে মনের ক্রমোন্নতি হয়, ইহাই শাস্ত্র নির্দ্দেশ ও মহাজনবাক্য। বুদ্ধিমান সাধক মহাজনবাক্য হৃদয়ে গ্রহণ করিতে সচেষ্ট থাকে, কেন না শাস্ত্র উক্তি আছে—

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।
মহাজনো যেন গতো স পন্থাঃ॥

তুমি সমর্থরতি হও বাবা—ইহাই আশীর্ব্বাদ করি। তোমাদের নিত্য কুশল কামনা করি। অত্রস্থ মঙ্গল। আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্বজিৎ

পুঃ—······সহিত কিরূপ কি আলোচনা হয় খামেতে আমায় নির্ব্বিচারে জানাইবে।

(৬২)

ওঁ

ঝাড়গ্রাম
১৬।৭।৪৯

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

বাবা.......,

শ্রীগুরু ভগবানের স্নেহাশীর্ব্বাদ লও। আজ কয়েক দিন হইল তোমার চিঠিখানি পাইয়াছি। সময় অভাবে উত্তর দিতে দেরী হইল।

একটা জীবনে কৃতকার্য্য হইতে গেলে অর্থাৎ পরিপূর্ণ একটি জীবন লাভ করিতে গেলে অনেক ধৈর্য্যের প্রয়োজন। বিফলতাজনিত নৈরাশ্য পুরুষের লক্ষণ নহে। বিফলতাই সফলতা আসিবার পূর্ব্বাভাস। অধৈর্য্য দুঃখের মূল কারণ। বাধাবিঘ্ন ইত্যাদি জীবন-লাভের প্রতিবন্ধক নহে, সহায়ক। একটা জীবন যদি পুরোপুরি বিফল হইয়া যায় তাহা হইলেও তাহার লোকসান কিছু নাই। কেন না, এই লোকসানের মধ্যে যে লাভ থাকে, সে লাভটি অমূল্য। বহু আয়াসেও তাহা পাওয়া যায় না। সেই লাভটি হইতেছে অভিজ্ঞতা। একটি জীবনের মেয়াদ ৫০।৬০ বৎসর নহে। ইহা অনাদি, অনন্ত। একটি পরিপূর্ণ জীবন হইতে বহির্গত হইয়া অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড জন্মমৃত্যুর ফটক পার হইয়া সেই অনন্ত জীবনে জীব পুনরায় মিলিত হয়। অতএব দুঃখের কিছু নাই। আনন্দে থাক। এ শরীর একরূপ। আশ্রমস্থ মঙ্গল। তোমাদের নিত্য কুশল কামনা করি।

ইতি— বিশ্বজিৎ

(৬৩)

ওঁ

ঝাড়গ্রাম

২৪।৭।৪৯

পরমস্নেহভাজনেষু –

করুণাবরুণালয় সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীগুরু নারায়ণের স্নেহ করুণাধারা তোমার শিরে নিত্য বর্ষিত হউক। সেই চির করুণোজ্জ্বল জ্যোতিঃতে তোমার চলার পথ আলোকিত ও নিরূপিত হউক, ইহাই কামনা করি।

লিখিত পত্রখানি পাইয়া পরম প্রীতি অনুভব করিলাম। তুমি পত্রাবলী পাঠে আনন্দ পাইতেছ জানিয়া সুখী হইলাম।

খুবই আশা করিয়াছিলাম যে, এখান থেকে যাইবার পূর্ব্বে আর একবার তোমাকে দেখিব, আশা করিয়া থাকিয়া যখন তুমি আসিলে না, তখনই বুঝিলাম যে নিশ্চয় কোন কাজের জন্য তুমি আমার সঙ্গে দেখা না করিয়াই চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছ এবং ইহা সত্য যে তোমার এই না-আসা তোমার ইচ্ছাকৃত নহে, কার্য্যানুকূল ঘটনাতে ইহা করিতে বাধ্য হইয়াছ।

ইহা সত্য কথাই লিখিয়াছ, সৎসঙ্গ, সদালোচনা, সৎচিন্তা, সদ্‌-গ্রন্থাদি পাঠ সমস্তই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সৎকর্ম্মের ফলস্বরূপ। সাত্ত্বিকী কর্ম্মের ফলেই জীব ইহজীবনে সাত্ত্বিকী কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং পূর্ব্বজীবনে সাত্ত্বিকী কর্ম্মের ফলে ইহজীবনে তাহার সাত্ত্বিকী প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়া থাকে। পূর্ব্বজীবনে রজতম গুণাত্মক কর্ম্মের

ফলে, ইহজীবনে নীতিবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলেও বা নীতিবিরুদ্ধ পথে চলিলেও জন্মার্জ্জিত সাত্ত্বিকীভাবসমূহের দ্বারা তাহাকে সাত্ত্বিকী পথে আনয়ন করিবেই। অতএব বাবা, হতাশ হইবার, নিরুৎসাহ হইবার কোন যুক্তিসিদ্ধ কারণ দেখি না। জীবের এই জীবন-নাটিকা বিভিন্ন অঙ্কে সম্বলিত। কোন জীবন-নাটক পঞ্চম অঙ্কে অভিনীত হয়। কোন জীবন চতুর্থ, কোনটা আবার তৃতীয়, দ্বিতীয় ইত্যাদি। কাজেই জীবনের পিছনে-থাকা দিনগুলির জন্য বৃথা চিন্তা করিয়া বা তজ্জনিত দুঃখ করিয়া হতাশা আনিবার কোন যুক্তিপূর্ণ কারণ দেখি না। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। অতীতের যাহা তাহা অতীত থাকুক, ভবিষ্যতের চিন্তা ভবিষ্যতে নিমজ্জিত হোক। বর্ত্তমানকে সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হও। Act act in the living present, heart within and God overhead.

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলির দ্বারা আমরা জীবনে সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে থাকি। ওগুলি কিছুই নয়, এক একটি বুদ্বুদ্ মাত্র। কিছুক্ষণ ওঠে আবাব মিলাইয়া যায়। কাজে কাজেই জীবনের চলার পথে সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতনের দ্বারা অভিভূত না হইয়া ওগুলিকে উপেক্ষা করাই ভাল, কেন না কর্ম্ম অনুসারে ইহারা আসিয়া থাকে এবং কর্ম্ম অনুসাবে ভোগ হইয়া থাকে। অতএব জীবনের চলারপথে সাথী এগুলি, ওগুলি অবশ্যম্ভাবী। আমার সুখ হোক, শান্তি হোক, এরূপ চাহিদার দ্বারা কেহ কোন দিন সুখ শান্তি পায় নাই, সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা কোনদিন সুখ দেয় না।

ত্যাগেই সুখ, ত্যাগেই শান্তি। এই ত্যাগদ্বারা আমি বস্তু ত্যাগ করিতে বলিতেছি না, ব্যবহার ত্যাগ করিতে বলিতেছি না, আকাঙ্ক্ষা বা আসক্তি ত্যাগ করিতে বলিতেছি। কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—

"সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে,
প্রেম দিলে প্রেমে পুরে প্রাণ
নিশিদিন আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাহি অবসান॥"

কর্ম্মের ফলের উপর কোনরূপ আসক্তি বা মোহ না রাখিয়া, মাত্র করণীয় হিসাবে কর্ম্ম করিয়া গেলেই কর্ম্মের ফল যাহাই হোউক, তোমাকে উহা স্পর্শ করিতে পারিবে না।

আজ এই পর্য্যন্তই থাক্। তোমাদের নিত্য কুশল কামনা করি। আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(৬৪)

ওঁ

ঝাড়গ্রাম
২৭।৭।৪৯

প্রাণাধিকেষু,—

বাবা…, স্নেহঘন অন্তর্দেবতার সান্নিধ্য উপলব্ধি কর। পত্রপাঠে পরম প্রীতিলাভ করিলাম। আজ আমি সত্যই বলিতেছি, বাবা, তুমি আজ অদ্ভুত ধৈর্য্যের, অদ্ভুত স্থৈর্য্যের প্রমাণ দিয়াছ। আজ দীর্ঘ দিবস ধরে কত দুঃখ, কত কষ্ট, কত অভাব-অভিযোগ, রোগ-শোক ইত্যাদির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছ। এত ঝঞ্ঝাপাতেও, এত উত্থান-পতনের মধ্যেও, তুমি তোমার আদর্শ হইতে একতিলও বিচ্যুত হও নাই, ইহাই তোমার মহত্ত্ব। ধন্য তোমার গুরুভক্তি। যার গুরুতে এইরূপ অবিচলিত বিশ্বাস, অটুট শ্রদ্ধা, অনন্ত প্রেম থাকে, তার জীবন কখন দুঃখময় হইতে পারে না।

স্নেহের সাধক, আজীবন যুদ্ধ করিয়া চলিতেছ—জীবনলাভের জন্য। ভয় নাই, চিন্তা নাই, যুদ্ধজয় অবশ্যম্ভাবী। আজ তুমি যুদ্ধ করিতে করিতে এমন একটা স্থানে আসিয়া পড়িয়াছ, যেস্থানে আসিয়া আজ তোমার দেহরথ অচল, মন-অশ্ব শত্রুশরাঘাতে বিকল, ইন্দ্রিয়সকল শ্লথ। রথী তুমি, জীব তুমি, সাধক আজ ক্লান্ত অবসন্ন। আজ কুরুক্ষেত্ররণস্থিত অর্জ্জুনসারথির মত আমারও বলিবার ইচ্ছা হইতেছে :—

প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে বাণ না ধরিব।
না ধরিলে আজি রণে পাণ্ডবে হারাব॥

দাও, সাধক, আজ তোমার হৃদয়-রথস্থিত মনরূপ অশ্বের বল্গা অচ্যুতসারথি শ্রীগুরুর হাতে ছেড়ে। আর ঐ শুন, তোমার হৃদিস্থিত সারথির রণহুঙ্কার—"আরাধ্য, আরাধ্য।" ঐ শোন নির্দ্দেশ—

"কর যুদ্ধ হবে জয় জীবাত্মা অনিত্য নয়
ওহে জীব কর আকিঞ্চন।"

চল, এগিয়ে চল, আরও দৃঢ় ক'রে শ্রীগুরুচরণকে জড়িয়ে ধর, আর কাতরপ্রাণে বলিতে থাক—

"হে নাথ অবজ্ঞা করি যাও নাই ফিরে,
আমার সে ধূলাস্তূপ খেলাঘরে দেখে।
খেলাঘরে শুনিতে পেয়েছি থেকে থেকে
যে চরণধ্বনি,
আজও শুনি তাই বাজে জগৎসঙ্গীত সাথে
চন্দ্র সূর্য্য মাঝে।"

শ্রীভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তোমাদের শরীরগুলি সব সুস্থ হইয়া উঠুক। মেমারিতে পত্র দিয়াছ কি? সেখান হইতে কোন সংবাদ আসিল কি? সকল সংবাদ দিও। অত্রস্থ মঙ্গল। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(৬৫)

ওঁ

ঝাড়গ্রাম
২৭।৭।৪৯

পরমস্নেহভাজনেষু—

বাবা……,

প্রেমঘন অন্তর্দেবতার স্নেহ ও করুণাধারা তোমার শিরে নিত্য বর্ষিত হউক। আজ কয়েকদিন হইল তোমার পত্রখানি পাইয়াছি এবং পত্রপাঠে পরম প্রীতি অনুভব করিয়াছি।

বাবা, গুরু কোনদিন সন্তানের উপর রুষ্ট হইতে পারেন না, কেন না, গুরু রুষ্ট হইলে শিষ্যের আর নিস্তার নাই। অপরাধের নিলয় আমি', করুণার আলয় তিনি। অজ্ঞান অন্ধ আমি, মোহাচ্ছন্ন জীব আমি,—জ্ঞানময় তিনি, বিজ্ঞানময় তিনি। আমার অপরাধের বিরাম নাই। তাঁহারও ক্ষমার শেষ নাই। এত করুণা যাঁর বুকে, এত দয়াল যিনি, তাঁকে ভুলে থাকা কি আমার পক্ষে স্বাভাবিক? ইত্যাদি ভাবটি যদি বুকে জাগিয়ে রাখিতে পার, তাহা হইলে শত দুঃখের ভিতরেও সুখ পাইবে, শত অশান্তির ভিতরেও শান্তি পাইবে। আমি যদি বুঝি যে—আমি অপরাধ করিতেছি এবং সেই বুঝিয়া যদি ক্ষমা প্রার্থনা করি তাহা হইলে ক্ষমা তিনি করিবেনই, কেন না ক্ষমা করা তাঁহার স্বভাব। যাক, প্রেমময় তিনি, প্রেম দিয়েই তাঁর শরীর গড়া। ওগো সেই ভগবৎ বিগ্রহ, সেই ভগবৎ শরীর যে শরীরের উপাদান প্রেম, নিমিত্ত প্রেম, সবটাই প্রেম।

প্রেমাম্বধিং প্রেমরসায়নঞ্চ
প্রেমপ্রদানং ভবদুঃখহানং
শ্রীগুরুদেবং নিত্যং নমামি ॥"

বাবা, মন যত বেশী তাঁতে সংলগ্ন রাখিতে পারিবে, তাঁর রূপ চিন্তায়, তাঁর লীলাকথা কীর্ত্তনে, তাঁর মন্ত্র স্মরণে নিজেকে যত বেশী ডুবিয়ে রাখতে পারবে ততই বুকখানি শান্তিতে তৃপ্তিতে ভর উঠবে। এই বিষময় সংসার মধুময় —অমৃতময় হয়ে উঠবে। ঐ দেখ, প্রেম-পূরিতনেত্রে শ্রীগুরু, তোমার প্রেমময় দেবতা। এই জগৎমূর্ত্তিখানির দিকে একবার তাকাও বাবা, দেখ—

"অনলে অনিলে, জলে, মধুপ্রবাহিনী চলে
ওরে মধুময় হয় ত্রিভুবন।"

শুন, সাধক গাহিতেছেন —

ওরে আজ মধুময় হয়েছে আমার প্রাণ বঁধুর আগমনে
আজ বিশ্ব মধুময় হয়েছে,
আজ সকলি মধু, যা দেখি তাই সকলি মধু
যা শুনি তাই সকলি মধু।

যাক্, সে অন্য কথা। ঠিক এই রকমই হয় গোপাল। নিজেকে যতই তাঁর প্রেমরসে ডুবিয়ে দিতে পারবে, সকল কাজের মধ্যে, সকল কথার ভিতর, সকল অবস্থার মধ্যে মনটিকে যতই সেই প্রিয়তম সংলগ্ন করে রাখতে পারবে ততই ঐরূপ অনুভবগুলি হতে থাকবে। সুন্দর তোমার ভাব। আজ তোমার বুকখানি মধুরভাবে পরিপূরিত

হয়ে গেছে। তোমার প্রাণবঁধু আজ ঐ হৃদয়মুরে বসে, বিন্দু বিন্দু মধু পান করছেন। আর তোমার ঐ হৃদ্‌মণ্ডলী মধুময় করে তুলছেন।

আজ আর কিছু লিখিতে পারিতেছি না বাবা। আজ এই পর্য্যন্তই থাক। ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(৬৬)

ওঁ

ঝাড়গ্রাম

২৪।৭।৪৯

পরমশুভাশীর্ব্বাদ বিশেষ,—

স্নেহের..., জ্ঞান বিজ্ঞানময় পরমকারুণিক শ্রীগুরু নারায়ণের নিত্যসান্নিধ্য উপলব্ধি কর। বহুদিন পরে তোমার একখানি কার্ডের পত্র পাইলাম। পত্রপাঠে তোমার মনের অবস্থা জানিলাম।

বাবা, জীবের বিভিন্ন ভাবধারা ভিন্ন বোধাত্মক চিন্তাধারাগুলিকে স্থূলে কার্য্যকরী করার উপযুক্ত ক্ষেত্রকেই সংসার বলে। এই সংসার-সমুদ্রে জীবমনগুলি অসংখ্য নদীর সমান। নদীবক্ষে যেমন অসংখ্য বুদ্বুদ্ উঠিতেছে, রহিতেছে এবং মিলাইয়া যাইতেছে, জীবমনেও সেইরূপ বিভিন্ন চিন্তাধারা বুদ্বুদের ন্যায় উঠাবসা করিতেছে। নদী যেমন সমুদ্রে মিলিত হইবার জন্য অসংখ্য বন, গিরি, উপত্যকা অতিক্রম করিয়া উঠিতেছে, পড়িতেছে এবং ছুটিতেছে, জীবনিচয়ও সেইরূপ বিভিন্ন অজ্ঞানতা, মোহ, সংস্কার প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া অবিরাম গতিতে সেই জ্ঞান-সমুদ্রে মিলিতে ছুটিয়াছে। সমুদ্রে মিলিত হইবার পর নদীর ছুটাছুটি যেমন শেষ হয়, জ্ঞান-সমুদ্রে মিলিত হইবার পর জীবের গতাগতিরও শেষ হয়।

এখন এ সবই তো ঠিক হইল, কিন্তু এ অবিরাম ছুটাছুটির শেষ কোথায়? কবে? এবং কেনই বা এই ছুটাছুটি—এই প্রশ্ন দিন-রাত চলিতেছে। ইহার উত্তর—জীবের এই মিলন—এই মহামিলন

এই অনন্তকালবক্ষে ক্ষুদ্র খণ্ডভাবকে মিশাইয়া দেওয়া। যাহারা চাহে না, তাহারা পথও পায় না। আর যাহারা চায়, যে চায়, তাহাদের বা তাহার জন্য পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। ইংরাজীতে একটি কথা আছে—তাহা তোমার জানা আছে নিশ্চয়ই—"Where there is a will, there is a way."

দেখ, কত মোহাচ্ছন্ন জীব আমরা, কত অজ্ঞান আমরা যে, যেগুলিকে লইয়া থাকিয়া, যে অবস্থাগুলির মধ্যে আমার নিজত্বকে ওতপ্রোতভাবে মিশাইয়া দিয়া, আমরা অহোরাত্র কত যন্ত্রণা পাইতেছি, কত লাঞ্ছনা, কত গঞ্জনা, দিবারাত্রি সহ্য করিতেছি, আবার সেইগুলিকেই আমার আমিত্ববোধে জোরে আঁকড়িয়া ধরিতেছি। ইহারা যত জোরে আমাকে দূরে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে, মোহগ্রস্ত জীব আমরা আরও তত জোরে উহাদের আঁকড়িয়া ধরিতে চেষ্টা করছি। আঘাতের পর আঘাতে, জর্জ্জরিত হৃদয়ে, সংসারের পেষণে পিষে ধূলিসাৎ হবার উপক্রম হয়ে একবার একটু নিঃশ্বাস ফেলবার জন্য কখনও কোন সময় একটা দীর্ঘশ্বাসের সহিত বলি—'ভগবান! মুক্ত কর এই মোহ হতে, ছিন্ন কর এই মোহের জাল।' মুহূর্ত্ত যাইতে না যাইতে আবার ভুলে যাই—আবার দুঃখসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং অবিরাম গতিতে উত্থান-পতনরূপ ঢেউয়ের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে সন্তরণ দিতে থাকি—ধন্য আমাদের মোহ! অতএব পথ জানলেও চলতে আমাদের ইচ্ছা হয় না; পথ সামনে দেখলেও, পাছে চলতে হয় বলে, আমরা মুখ ঘুরিয়ে নিই। কাজেই "তমসা মা জ্যোতির্গময়" প্রার্থনার মধ্যে কতটা আমাদের সত্যিকারের আগ্রহ

আছে তা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায়। অতএব পথ চেয়ে, পথ দেখে, যখন আমাদের চলতে ইচ্ছা হয় না অথচ—থাকলেও চলবে না, থাকার জায়গাও এ নয়, কারণ চলাই এখানের স্বভাব, গতিই এখানের ধর্ম্ম, যখন দেখা যাচ্ছে যে কর্ত্তৃত্ব-অভিমান, কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি আমাকে এপথ দিয়ে চালাতে পারছেনা বা পারবেনা, তখন একজনের উপরে ভারটা ছেড়ে দিয়ে, সত্যিকার বলতে হবে, প্রাণ খুলে বলতে হবে "হাত ধরে আমায় নিয়ে চল সখা, আমি যে চলিতে পারি না।" তিনি তোমাকে তখন একটি মাত্র কথা, একটি মাত্র নির্দ্দেশ—এই সংস্কার মোহাচ্ছন্ন জীবকে মাত্র একটা কথা বলেন, মাত্র একটা উপদেশ দেন— সেই টুকু নির্ব্বিচারে পালন করিতে পারিলেই অনায়াসে এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে পারা যায়। তিনি বলেন, ওরে ভ্রান্ত পথিক! ওরে মোহান্ধ জীব! ওরে কর্ত্তৃত্বাভিমানী! ওরে কৃপণ! তুই যদি তোর ঐ অভিমানের বোঝা, ঐ কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি, ঐ সংসার মোহ, কিছুতেই ছাড়তে না পারিস্ তবে তোকে হতাশ হতে হবে না, তুই একটা কথা শোন—একটা অনুরোধ রক্ষা কর— তাহলেই তুই এই নিদারুণ অবস্থার হাত থেকে রেহাই পাবি এবং এই সুদীর্ঘপথ হাসতে হাসতে চলে যাবি। তোর মোহের সব কিছু থাক, তুই আরও জোরে আঁকড়ে ধর ওগুলোকে, তোকে কিছুই ছাড়তে হবে না। কিছুই দিতে হবে না, শুধু এইটুকু করতে চেষ্টা করিস্ যে—

যৎকরোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎকুরুস্ব মদর্পণম্॥

হয়তো বলবে, এ অবস্থা কেমন করে আসে? এই অবস্থা আসে নিজের মন বুদ্ধি অহংকারকে সম্পূর্ণরূপে তাঁরই হাতে ছেড়ে দিতে পারলে। হয়তো বলবে, এ শক্ত কথা। কিন্তু এ শক্ত নয়—এ অতি সহজ! স্মরণ কর, শ্রীগীতায় শ্রীভগবানের অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ

"মন্মনাভব মদ্ভক্ত মদযাজী মাং নমস্কুরু।"

অতএব বাবা, সকল কাজের মধ্যে, সর্ব্বাবস্থায় মনটিকে যদি তাঁতে ফেলে রাখতে পার, অর্থাৎ "আমার আছেন একজন, তিনি আমার অতি আপন পরমাত্মীয়" এই ভাবটি মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অতি আপনার প্রতি পরম প্রীতি পরম অনুরাগের ভাব হৃদয়ে জাগ্রত হবে, এবং তখন ঐ যে অহংকার, যে সকল সময় তোমার ভিতরে মাথা উঁচু করে রয়েছে, তখন তোমার পরম প্রিয় দেবতা দরদী বন্ধুর কাছেই নমিত হয়ে "নমোনমঃ" করতে থাকবে। আজ আর থাক। শিবমস্তু। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(৬৭)

ওঁ

ঝাড়গ্রাম

৬।৮।৪৯

পরমস্নেহভাজনেষু—

বাবা……, করুণাময় শ্রীগুরু ভগবানের প্রাণভরা স্নেহাদর লও। মেদিনীপুর যেদিন যাই, সেইদিনই সকালবেলা তোমার দীর্ঘ সাতপৃষ্ঠাব্যাপী এক পত্র পাই। এবং তাহাতে তুমি উপস্থিত তোমার মনের ভাব কিরূপ তাহাই ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছ। তোমার মনে পড়ে বোধ হয়, হাজারীবাগ থাকাকালীন তুমি এই ধরণের একটি পত্র দিয়াছিলে এবং তাহার উত্তরও পাইয়াছিলে। তোমার কাছে যদি সে পত্রখানি থাকে, তাহা হইলে তাহা পড়িয়া দেখিলে এই পত্রের উত্তর কতকটা পাইবে। যাক, তোমার প্রশ্ন-গুলির মীমাংসা আমি যথাসাধ্য করিতে চেষ্টা করিতেছি।

দেখ, জীবের মন সাধারণতঃ বাহ্য বিষয় লইয়াই থাকিতে ভালবাসে এবং বাহ্য বিষয়বস্তু হইতে সে তার অনুকূল খাদ্য প্রচুর পরিমাণে পায়, কাজেই তাহা হইতে রস সংগ্রহ করিয়া মন নিজ শরীরের পুষ্টি সাধন করে। এখানে একটু লক্ষ্য করিতে হইবে, আমি—'মন খাদ্য সংগ্রহ করে', লিখিলাম, খাদ্য অর্থে চিন্তাধারা, আর রস মানে ভাবধারা আর মন নিজ শরীরের পুষ্টিসাধন করে অর্থে সূক্ষ্ম শরীর সংকল্পাত্মক শরীর বা সংকল্প। এখন এই যে মন তাহাকে মাঝে মাঝে অন্তর্বিষয়ক (আধ্যাত্মিক বিষয়ক) চিন্তায় নিযুক্ত

করা হয়, অজ্ঞতা হেতু তাহা হইতে সে তাহার রুচিমত আহার পায় না বা তাহা হইতে সে তাহার স্বভাব অনুযায়ী রসের আস্বাদন পায় না এবং এইজন্য অল্পতেই অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যদি সে ইহা হইতে অর্থাৎ অন্তঃবিষয়ক বস্তু হইতে রস না পায় তবে সে ইহা অর্থাৎ গুরুকরণ, সাধুসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ, সদ্‌ আলোচনা ইত্যাদি করে কেন? দেখ, মনের একটি প্রচ্ছন্নভাব আছে, যেটি হচ্ছে সে নিত্যনূতন প্রয়াসী। স্বভাবসুলভ চঞ্চলতা হেতু যে কোন একটি বিষয়বস্তুকে অধিকক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারে না। আবার কিন্তু প্রশ্ন হইবে—সবই তো বুঝলাম, কিন্তু এগুলি হয় কেন? —শোন—এই মন তিনটি গুণের মধ্যে অনবরত বিচরণ করে, কখন সত্ত্বগুণ, কখন রজঃগুণ, কখন তমঃগুণ। যখন তাহার ভিতর যে ভাবের প্রাবল্য অধিক হয় তখন সে সেই বিষয় হইতে রস গ্রহণ করিতে প্রয়াসী হয়। যেমন মনে কর: তাহার ভিতর যখন সাত্ত্বিকীভাবের উদয় হয় তখন সে এই সত্ত্বগুণাত্মক অবস্থার ভাবের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া পড়ে, রজঃতমাত্মক বিষয় তখন আর ভাল লাগে না। কিন্তু জন্মজন্মান্তর ধরে এই রজঃতমে বিচরণ করিতে করিতে সে ইহাদের সহিত এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে সাত্ত্বিকী চিন্তার মধ্যে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না কাজেই অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এখন কথা হইতেছে যে মনকে বেশী সময় যেরূপ সঙ্গ দিবে, তাহার চিন্তাধারা বা তাহার গতিপথ সে সেইরূপ স্থির করিবে। যেমন, অধিকক্ষণ যদি বাহ্যবিষয়ক সঙ্গ তাহাকে দাও তাহা হইলে সে ঐ সব বিষয়ের উপরেই অধিক প্রীতি-সম্পন্ন হইয়া পড়িবে এবং তৎ বিপরীতভাব গ্রহণ করিতে পারিবেনা।

আবার যদি তাহাকে অধিকক্ষণ অন্তর্বিষয়ক চিন্তায় নিমগ্ন রাখ তাহা হইলে আর সে বাহ্য বিষয়ে মন দিতে পারিবে না। এখন তুমি প্রশ্ন করিবে যে, আমরা সংসারী জীব, আমাদের ছেলেবেলা হইতে বা আমাদের পরম্পরা অনুযায়ী আমরা বাহ্যবিষয় লইয়া আছি এবং তাহা হইতেই ঐ কাদায় গুণটানা গোছের যতটুকু আনন্দ পাই, ততটুকু তৃপ্ত হইতে থাকি। এক্ষেত্রে আমাদের মনকে অন্তর্বিষয়ক চিন্তা দিবার উপায় কি ? দেখ, এই কারণেই করুণাময়, সর্ব্বজ্ঞ গুরু, দীক্ষা দেওয়াকালীন প্রথমে উপদেশ দেন অনুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিবে এবং সকল কাজে তাঁর চিন্তা যাতে প্রবল হয় সেই চেষ্টা করিবে। প্রশ্ন হইবে—চেষ্টা ত করি, বলিও তাই, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মন আবার অন্যদিকে যায়। তখন আর তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি না। এরূপ অবস্থায় উপায় কি ?" দেখ, মন অনুক্ষণ চায় একটা মোহিনীশক্তি, যাহার বলে সে একটা বিষয়ে মুগ্ধতা অবলম্বন করিতে পারে এবং তাহার ফলে সে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে লাফাইয়া চলে। এবং যেহেতু সে কোথাও থেকে তাহার অনুকূল বস্তু পায় না সেই হেতু যে কোন একটি বিষয়ে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না এবং তাহারই ফলে সে চঞ্চল এই আখ্যা পাইয়াছে। এই যে সাধু সঙ্গ বলে একটি জিনিষ আছে, (সাধুসঙ্গে আমি প্রকৃত গুরুকে লক্ষ্য করিতেছি), এই সঙ্গটির অন্তর্নিহিত এমনি একটি প্রচ্ছন্ন মাধুর্য্যপূর্ণ প্রভাব আছে, যাহার ফলে এইরূপ সাধু সঙ্গে মন সহজেই অনুরক্ত হইয়া পড়ে। তা হয় বটে, কিন্তু অধিকক্ষণ তো এখানেও স্থায়ী হয় না? কিছুক্ষণ পরে সে আবার অন্য বিষয় চিন্তা করে। এটা

হয় কেন জান? এটা ঐ মনের দীর্ঘদিন বাহ্য বিষয়ের সঙ্গের অভ্যাসের ফলে আসে। এখন আরও একটু খুলে বলি। ঐ যে চঞ্চলতা বা বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ বা অবসাদগ্রস্তভাব বা religion melancholy এইগুলিই হচ্ছে মনের ব্যাধি। মন যখন ব্যাধিগ্রস্ত হয় তখন তাহার ভিতর এই Symptoms প্রকাশ পায়। এই ব্যাধির একমাত্র ঔষধ সাধুসঙ্গ বা গুরুসঙ্গ। এখন যেখানে গুরুর স্থূলসঙ্গের সুবিধা-সুযোগ নাই সেখানে কি করা কর্ত্তব্য। তখন ঔষধ—সৎচিন্তা, সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ, শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা চিন্তন। এখন ঐ যে একটা উপমা দিয়াছ, ছেলের উপমা, উহা ঠিকই হইয়াছে। এই চিন্তাটি তৈলধারাবৎই চলিতে থাকে। ইহাকে গভীর ধ্যান বলে না। তন্ময়তা যদি সকল সময়ই থাকে তাহা হইলে মনের বাহ্যজগতের ক্রিয়াকর্ম্মাদি লোপ পাইয়া যায় এবং ক্রমে নৈষ্কর্ম্ম্য আনিয়া দেয়। ঐ যে তৈলধারাবৎ একটা অহর্নিশি যুক্তভাব, ইহা বহু জন্মের সুকৃতির ফলে সাধকের ভিতর আসিয়া থাকে। ইহা তমঃগুণগ্রস্ত মনের ক্রিয়া নয় পাগল, ইহা সন্ধিনীমনের সাত্ত্বিকী-ভাব বা ***গুরুকৃপা।*** শ্রীগুরুর বিশেষ কৃপার জন্যই সাধকের এই অবস্থা হইয়া থাকে। এই যে অবসাদ, ইহা সাত্ত্বিকী অবসাদ, ইহার মধ্যে তমঃর 'ত' ও নাই। তোমার গুরুর প্রতি অকৃত্রিম প্রেম তোমাকে এত শীঘ্রই এই অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে। আমি যত-দূর জানি, ইহা সাধন উন্নতিরই লক্ষণ, সাধন অবনতির লক্ষণ নয়। তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে যদি এইরূপ একটা চিন্তাসূত্র লাগিয়া থাকে তাহা হইলে ঐ যুক্তভাবের ফলে জীবের মনোশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সে গুরুচিন্তায় অধিকক্ষণ রমণ করিতে সক্ষম হয়।

২। ব্রহ্মচারীর যে লৌকিক অর্থ তুমি দিয়াছ অর্থাৎ ব্রহ্মে বিচরণ করা, ইহা ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মে বিচরণ করা কাহাকে কহে তাহাই জান না। ব্রহ্মে বিচরণ শব্দে ইহাই বুঝায় যে ব্যাপ্তিতত্ত্বে মনের নিমগ্ন অবস্থা। আরও সরলভাবে বলি—আমাদের মনের সাধারণ অবস্থা হচ্ছে সঙ্কোচ অবস্থা। আর সাধকের মনের সাধারণ অবস্থা হচ্ছে উদার অবস্থা, ব্যাপ্তি অবস্থা অর্থাৎ অভিমান-শূন্য অবস্থায় অর্থাৎ মনের স্বল্পতার হ্রাস, ভূমার অবস্থা। তাহলেই দেখ, সাধক চায় কি?—সুখ, দুঃখ নাশ, অভাবের পরিসমাপ্তি, আনন্দ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। ইহা কোথা হইতে আসে, কি প্রকারে সম্ভবে? শাস্ত্র যুক্তি—"নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং।"

৩। সমস্ত কিছুই যে impersonal সে বিষয় কোন ভুল নাই। কেন না personal যাহা, তাহা স্বল্প, তাহাতে সুখ থাকিতে পারে না। কাজেই ঐ যে তোমার মনে হয় বা অনুভব হয়, উহা ঠিকই কিন্তু এই ঐক্য বুদ্ধি, ইহা সব জায়গায় সম্ভব, মাত্র গুরুতে নয়। গুরুর সঙ্গে সকল সময়ই একটা দ্বৈত বুদ্ধি থাকিবে, যতক্ষণ না পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হয়। গুরুতে impersonal ভাব ক্ষতিকারক। ইহা সাধকের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে। দেখ, ঠিক এই অবস্থা লক্ষ্য ক'রে জগদ্‌গুরু আচার্য্য শঙ্কর নিজ গুরুকে প্রণাম করেছিলেন এই মন্ত্রে—

যস্য প্রসাদাৎ অহমেব বিষ্ণুঃ
ময্যেব সর্ব্বং পরিকল্পিতঞ্চ
ইত্থং বিজানীয়াং সদাত্মরূপম্
তস্যাঙ্ঘ্রি—দ্বয়ে—প্রণতোঽস্মি নিত্যং।

"অর্থাৎ যাঁহার প্রসাদে, যাঁহার কৃপায় আমি এই ব্যাপ্তিত্বে নিমগ্ন সেই পরমকারুণিক শ্রীগুরুচরণে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণত হই।" ইহা উহার সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ। কাজেই শ্রীগুরুশক্তি অনাদি অনন্ত বিজ্ঞানময় সত্তা হইলেও আমার কাছে কৃপা করিয়া প্রেমঘনমূর্ত্তিতে মূর্ত্তভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, এবং সেই সর্ব্বব্যাপী অনন্ত করুণালয় শ্রীগুরুচৈতন্য শক্তি বা অনাদি বিস্তৃত অহং সত্তা খসাজ্ঞ আমিকে [illegible]ট সত্তায় মিলাইয়া লইবার জন্য জ্ঞানরূপ অঞ্জনের দ্বারা [illegible]নতাকে ধ্বংস করিতেছেন। তাই সাধক সেই গুরুকে প্রণাম করেন এই মন্ত্রে –

"নিধয়ে সর্ব্বলোকানাম্
ভিষজে ভব রোগীনাম্
গুরবে সর্ব্ব লোকানাম্
দক্ষিণা মূর্ত্তয়ে নমঃ।"

তা হইলে বুঝ বাবা, গুরুকৃপায় অনুভূতিগুলি আরম্ভ হইলেও সাধক তাহার অভিমানান্ধ বুদ্ধিতে সেই বোধিসত্ত্বাকে অনুভব করিতে সক্ষম হয় না। কৃপা পাইলেও কর্ত্তৃত্বাভিমানযুক্ত মনবুদ্ধি ঐ অহংকে সেই কৃপাবারি গ্রহণ করিতে সুযোগ দেয় না, সেই কারণে সাধনার প্রথম অবস্থায় সর্ব্বাগ্রে প্রণতঃ হওয়া কর্ত্তব্য। জীবনে যদি একটা প্রণামও করতে পার, শুধু ঐ একটিমাত্র প্রণামেই জীবনের সাফল্য আনিয়া দেয়। এই কারণেই বৈষ্ণবাচার্য্য প্রথম কথাই বলেন— "তৃণাদপি সুনীচেন"।

আমাদের গ্রাম্য ভাষায় কতকগুলি প্রবাদ আছে—'বড় যদি

হতে চাও ছোট হও তবে।' 'অতি বড় বেড় না গো ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে।' তাই বলি যদি সত্য সত্যই গুরুবরণই করিয়া থাক তোমার রথের চালক যদি সেই একমাত্র অচ্যুতসারথিকেই করিয়া থাক, যদি তোমার মন-অশ্বের কড়িয়ালি সেই গোবিন্দের হাতেই দিয়া থাক তাহলে রথী তুমি, তোমার চিন্তা কি ? উপযুক্ত সারথি তোমাকে তোমার লক্ষ্যস্থানে অবশ্যই পৌঁছাইয়া দিবেন। পথ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ রথী তুমি, ভিতরে বসে যদি সারথিকে পথের নির্দ্দেশ দিতে থাক তাহা হইলে তোমার রথ বিপথেই গমন করিবে। যিনি তোমার রথের দায়িত্ব নিয়াছেন তিনিই ভাল জানেন কেমন করে তুমি তোমার লক্ষ্যস্থানে পৌঁছাইবে। তুমি যদি তোমাকে তাঁহার হাতে ছাড়িয়াই দিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার সম্বন্ধে তোমার চিন্তা করিবার অধিকার কোথায়, তাঁহার জিনিষ তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন করিবেন। শেষ কথা, এইটুকুই বলিতে চাই, তর্ক-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনা, গবেষণা ইত্যাদিতে আসল বস্তু অনেক দূরে পড়িয়া থাকে। নির্ব্বিচারে তাঁর হাতে নিজেকে ছেড়ে দাও, বিচারবুদ্ধি ছাড়, বুকভরা প্রেম দিয়ে তাঁকে আরও জড়িয়ে ধর, সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে সকল তর্কের অবসান ঘটবে মাত্র একটী জিনিষ দ্বারা—

দাও প্রেম, আরো প্রেম, আরো আরো আরও প্রেম
আরও প্রেমে মিলিবে দেখা। শিবমস্তু।

তোমার কথা মত……আজ পাঠালাম। তুমি যাহা হয় কর। তাহার কাছে সব শুনে যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করে দাও বাবা

লক্ষ্মীটি, আর ও নিয়ে ভাবতে পারি না। আমাকে এই ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত কর, দোহাই তোমার। ...এসে ঘ্যান ঘ্যান করছে, সেটাকেও পাঠালাম, যাহা হয় কোরো। আর কি লিখব। জন্মাষ্টমীতে আসতে চেষ্টা কোরো। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(৬৮)

ওঁ

ঝাড়গ্রাম

১।৯।৪৯

প্রাণাধিকেষু—

বাবা, জ্ঞান-বিজ্ঞানময় শ্রীগুরু ভগবানের কৃপায় তোমার চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হউক, ইহাই কামনা করি। সেই প্রেমঘন প্রেমময় দেবতার প্রেমরসে নিত্য অভিস্নাত হও। তাঁর প্রেমে আত্মহারা হও, নিজেকে বলি দাও, তোমাদের চিত্তের সর্ব্ব সংশয় বিদূরিত হোক। আনন্দময়ের সঙ্গে নিত্যানন্দে বিভোর হয়ে থাক, ইহাই তোমাদের জন্য সেই দয়াল ঠাকুরের কাছে তাঁর এই দীনাতিদীন ভিক্ষুকসন্তান ভিক্ষা চাইছে।

আমার পূর্ব্বপত্রের উত্তরে তোমার প্রাণে যে ভাবগুলির উদয় হইয়াছে তাহা নিরসনার্থ এই দ্বিতীয় পত্র দিলাম।

(১) আমার পূর্ব্বপত্রের ভাব গ্রহণ করিতে একটু ভুল করিয়াছ। (ক) প্রারব্ধ জীবের এ-জগতে আসার মূল কারণ। এই প্রারব্ধ জীবমাত্রকেই ভোগ করিতে হয়। শাস্ত্রে আছে, বিনা ভোগে এই প্রারব্ধ ক্ষয় হয় না। তবে এখানে একটি কথা আছে। প্রারব্ধ পুরাপুরি ভোগ করিতে হইলেও, সর্ব্বশক্তিমান শ্রীগুরুর কৃপায় এই প্রারব্ধের ভোগকাল হ্রাসবৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। এবং ইহার স্বপক্ষীয় প্রমাণ পুরাণাদি গ্রন্থে বহু দেখা যায়। যুক্তি,—পুরাণকে যদি আমাদের পুরাণ ইতিহাস বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে পুরাণকার

ঋষি প্রারব্ধ সম্বন্ধে বুঝাইতে যে সমস্ত উপমা বা দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাঁহাবা সকলেই আমাদেরই মত মানুষ ছিলেন। অবশ্য যুগ-ধর্ম্ম অনুপাতে প্রকৃতির নৈতিক আচার-ব্যবহারের পার্থক্য বহুল পরিমাণে দেখা যাইলেও, মূল কথাটি ছিল এক অর্থাৎ প্রারব্ধ ভোগ বা গুরুকৃপায় ইহাব হ্রাসবৃদ্ধি। তাহা হইলে বুঝা গেল যে গুরু যদি কৃপা করেন তাহা হইলেই এই প্রারব্ধ ভোগ অনিবার্য্য হইলেও, তাহার ভোগকালের হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব। ইহাই গেল ১নং। এই প্রশ্নটীব দ্বিতীয় কথা স্মবণ এবং মনন সম্বন্ধে। স্মরণ এবং মননের দ্বারাই তন্ময়তার অবস্থালাভ হয। তন্ময়তা শব্দের অর্থ ই হচ্ছে মনের একমুখীন নিরবচ্ছিন্ন গতিপ্রবাহ। এখন সংসাবী জীবের পক্ষে স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া বাসকালীন, নিরন্তব একমুখীন চিন্তাপ্রবাহ গভীরভাবে রাখা সম্ভব নহে। তাহা হইলেও একেবাবে যে তন্ময়তা আসিবে না এমন কোন কথা নাই। যখন সত্যিকাবের প্রিয়তম চিন্তায় মন নিমগ্ন হইবে তখন অন্যান্য বাহ্য বিষয় হইতে মন তাঁহাতেই ডুবিয়া যাইবে, ফলে মনের তন্ময় অবস্থা আসিবে এবং তন্ময়তার অবস্থার স্থায়ীত্বকাল অল্পক্ষণ হইলেও ইহাব মূল্য অনেক বেশী। কাজেই সাধকের সাধন-জীবনেব প্রথম অবস্থায় স্ত্রী-পুত্র লইয়া বাসকালীন স্মরণ মনন বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং বিশেষ উপকারী এবং স্মরণ মননাদি যত অধিকক্ষণ হইতে থাকিবে, ততই মন তন্ময়তার দিকে বা গভীর চিন্তার দিকে বা ধ্যানের পথে অগ্রসর হইবে। আশা করি, এইবাব তোমার প্রশ্নটি আমি অনেকটা পরিস্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি। (গ) আমার পরম আরাধ্য, আমার পরম

প্রিয় শ্রীগুরু মহারাজকে তোমার স্বপ্নে একবার দর্শন করিবার আগ্রহ জন্মিয়াছে। ইহা সাধু ইচ্ছা। দেখ বাবা, দর্শন দেওয়া বা না দেওয়া ইহা তাঁহার ইচ্ছা। আমি যতদূর জানি, এই নিতান্ত অযোগ্য সন্তানকে তিনি কৃপা করিয়া তাঁর অধিক স্নেহের পাত্র করিয়াছিলেন এবং তোমরা আমার প্রিয় সন্তান এবং তোমাদিগের সেবা করিবার ভার তিনি কৃপা করিয়া এ অযোগ্যের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। অবশ্য, এ-ক্ষেত্রে আমি যোগ্য কি অযোগ্য সে বিবেচনা আমার নাই, যিনি দিয়াছিলেন তাঁর আছে। তবে আমার নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান যতটুকু আছে তাহার দ্বারা আমি যতটুকু বুঝি তাহাতে নিজেকে সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়াই মনে হয়। তবুও একটা ভরসা রাখি—কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

"তোমারি পতাকা দাও যাহারে
তারে বহিবারে দাও শকতি।"

অতএব শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনাকাঙ্ক্ষারূপ তোমার আগ্রহপূর্ণ আবেদন আমি মালিকের কাছে পৌঁছাইয়া দিলাম, এখন তাঁর ইচ্ছা হইলে তিনি তোমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া দর্শন দিবেন। এ বিষয়ের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা রহিল। মঞ্জুর করা না করা তাঁর হাত বা ইচ্ছা।

২। ব্রহ্মচারী :—তুমি লিখিয়াছ, "ব্রহ্মে বিচরণ করার মানে বুঝিলাম।" তাহাই যদি বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে—"আমরা সংসারী জীব, ব্রহ্মচর্য্য একেবারেই রক্ষা করিনি" এরূপ কথা উঠিতে পারে না। এখন এই যে বীর্য্য—এই বীর্য্য শব্দে শাস্ত্র semenকে

লক্ষ্য করেন নি। এই বীর্য্য শব্দের অর্থ ধী-শক্তি বা ওজঃ (ওজ = শক্তি বা বল)। এখন এই যে ধী বা বুদ্ধি, এর শক্তি বৃদ্ধি হয় নির্ম্মলতায়। বুদ্ধি ময়লাযুক্ত হয় কখন জান ? — যখন অজ্ঞানযুক্ত থাকে অর্থাৎ অনিত্য বস্তুতে যখন নিত্যতা প্রতীয়মান হয়। ইহাই আমাদের মনকে বা বুদ্ধিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। কেন না, এই অনিত্য বস্তুতে, নিত্যতার প্রতীতিতে, মনের মোহভাব বা মুগ্ধভাব আসে, ফলে বুদ্ধি সংকোচ হয় এবং তারই ফলে তার শক্তির হ্রাস হয়। কেন না, বুদ্ধির অনিত্য বা স্বল্প বস্তু পর্য্যন্ত গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। ভূমার আস্বাদ এখানে পায় না ; ফলে এই যে শক্তি এই শক্তির হ্রাস হয়। ইহাকে শাস্ত্রীয় ভাষায় ব্রহ্মচর্য্যহীন বলে।

এখন তোমরা বীর্য্য শব্দে যে অর্থ বুঝ অর্থাৎ মাত্র semen তাহা হইলে ব্যাস বশিষ্ঠ সনকাদি ঋষির ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা শব্দের যুক্তি থাকে না। এই ব্রহ্মচারীর ব্যবহারিক অর্থ যাহা অর্থাৎ semen রক্ষা এটাও একটা কারণ বটে তবে এটা secondary ; কেন না যাঁহারা সযত্নে এই semen রক্ষা করেন তাঁদের মনের একটা বিশেষ শক্তি জন্মায় এবং ধারণাশক্তি বা স্মৃতিশক্তির প্রাবল্য থাকে। কাজেই ইহা সাধন জগতে অগ্রসর হইবার একটা সহায়ক। আরও এই বীর্য্যক্ষয়ের অবস্থার এমনই একটা মাদকতা আছে যে ইহাতে মানব-কুলকে সহজেই মোহগ্রস্থ করে ফেলে, ফলে মন তার সূক্ষ্মতা বা বিরাটত্বের অনুভব করিবার সামর্থ্যের বহুলাংশ হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

৩। তোমার তৃতীয় প্রশ্ন গুরুকৃপা।• (ক) তুমি ঠিকই লিখি-য়াছ, এই কৃপা যে প্রেমে মেলে সে প্রেম আমরা কোথায় পাব ;

এত বড় ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান কে আছে যে আমাকে এই প্রেম ভিক্ষা দেবে? স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেও এই প্রেম ভিক্ষা করেছিলেন। তিনিও এই প্রেমের ভিখারী ছিলেন। বাহিরের দিকে চেয়ে দেখ, সমগ্র জগৎ আজ এই এক বিন্দু ভালবাসার জন্য ভিক্ষা করছে। অন্তরের দিকে চেয়ে দেখ, অন্তর্য্যামী গুরুও এই প্রেমের ভিক্ষা করছেন। বাঃ কি সুন্দর। তাহা হইলে দেখ, এই প্রেম বা ভালবাসা কি বস্তু। ইহা কি সেই ভগবান বা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মময়? কেন না, শিষ্য চাহিতেছে গুরুকে ভালবাসিতে, গুরু চাহিতেছেন শিষ্যের একবিন্দু ভালবাসা। আরও একটু সরল করে বলি। দেখ, বৈষ্ণব কবির একটা গান শুনেছিলাম। "রাধে, তুমি আমার প্রেমের গুরু।" অর্থাৎ এখানে কবি কি মনে করছেন? এই যে রাধা ইনি কে? শাস্ত্রীয় ভাষায় ইঁহাকে হ্লাদিনী শক্তি বা আরাধনা শক্তি বলে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে এই আরাধনা শক্তির কাছ থেকে যিনি শক্তিমান তিনি প্রেম ভিক্ষা চাইছেন। তাহলে বুঝিলাম যে এই আরাধনা শক্তি হচ্ছে মূল প্রেম। অতএব এই আরাধনা শক্তি, এই চাহিদা, ইহা সর্ব্ব জীবের ভিতরে আছে এবং বাহিরেও আছে। এই যে আরাধনা শক্তি যাহাকে আমি আমার অন্তরের ভিতর অনুভব করছি, এবং বাহিরেও অনুভব করছি, এই আরাধনা শক্তিটি কি? শাস্ত্রে শুনিয়াছি যে একই চৈতন্য শক্তি আমার অন্তর হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। প্রমাণ :—

চিতি রূপেণ যা কৃৎস্নমেতৎ ব্যাপ্ত স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

তাহা হইলে সিদ্ধান্ত হইল কি,—আরাধনাশক্তি যখন আমার অন্তর থেকে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত এবং চৈতন্যশক্তিও যখন আমার অন্তর থেকে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত তখন এই আরাধনাশক্তিই হচ্ছে চৈতন্যশক্তি, কেন না—things which are equal to the same thing are equal to one another. আর দেখা গেছে সেই সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান এই আরাধনাশক্তি বা হ্লাদিনী শক্তির কাছে প্রেমভিক্ষা করিয়াছিলেন বা প্রেম চাহিয়াছিলেন। তাহা হইলে এই শক্তি প্রেমময় শক্তি। তাহা হইলে কি সিদ্ধান্ত হইল? —প্রেম, আরাধনাশক্তি বা চৈতন্যশক্তি বা ব্রহ্ম একই বস্তু। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই প্রেমকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

কিছুই চাবনা ওগো আপনার তরে
পেয়েছি যা শুধিব সে ঋণ।
পেয়েছি যে প্রেমসুধা হৃদয় ভিতরে
ঢালিয়া তা দিব নিশিদিন॥
সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে
প্রেম দিলে প্রেমে পুরে প্রাণ।
নিশিদিন আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাহি অবসান॥

তাহলেই বুঝ বাবা, ঐ প্রেমের স্থান কত উচ্চ। জেনো—"যিনি যত বড় প্রেমিক, তিনি তত বড় জ্ঞানী।"

(খ) তুমি ঠিকই লিখিয়াছ, একমাত্র গুরুকৃপাতেই এই অপূর্ব্ব জ্ঞান, এই সবভোলা প্রেমলাভ করিতে পারা যায়। তুমি বলবে,

এইরূপ গুরুকৃপা লাভ হয় কিসে ?—দেখ বাবা, বর্ষার বারিধারার ন্যায় কৃপাবারি অনন্তকাল ধরে মানব শিরে বর্ষিত হচ্ছে। এই বর্ষণে পাত্রাপাত্র বিবেচনা নাই। নিরবচ্ছিন্নভাবে সর্ব্বত্র সমভাবে সম-পরিমাণে বর্ষণ হচ্ছে। যিনি এই কৃপা গ্রহণ করতে পারেন,— শুধু গ্রহণ কবলে হবে না— গ্রহণ ক'রে এই কৃপার মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারেন তিনিই প্রকৃত ঐ প্রেমের অধিকারী হইতে পারেন। এখন এই কৃপা গ্রহণের যথার্থ অধিকারী কি হইলে হওয়া যায় ? অহং কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি বা অভিমান একেবারে নাশ হইলে তবে এই কৃপা অনুভব হয় এবং তবে সে এই কৃপার মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারে। ইহার একটি practical প্রমাণ সেদিন ঝাড়গ্রামে বসিয়া পেলাম। সেইটুকু এখানে তুলিয়া দিয়া আজ এই পত্র শেষ করলাম। সেদিন আমরা তোমার বারান্দায় বসে আছি আর খুব জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। যাকে বলে Rain in torrents, আমি দেখিলাম বৃষ্টিধারা সর্ব্বত্রই সমানভাবে পড়ছে, কোথাও কম বেশী নাই। কিন্তু মজা দেখ, উচ্চশির বৃক্ষরাজির শিরে সেই বারিধারা প'ড়ে এক মুহূর্ত্তও থাকছে না, গড়িয়ে প'ড়ে যাচ্ছে। রাস্তা মাঠ ঘাট সর্ব্বত্রই সেই বারিধারা সমানভাবে বর্ষণ হচ্ছে কিন্তু কোথাও দাঁড়াচ্ছে না, গড়িয়ে চলে যাচ্ছে। দাঁড়ায় কোথায় জান ? সর্ব্বনিম্ন খানা— তোমার বাগানের পাশে, সেইখানে জল ভরে উঠেছে। কিন্তু শুধু জল ভরে উঠে নাই, তরতর ধারে প্রবল স্রোতে অন্তর্নিহিত যত কিছু ময়লা আছে, সমস্ত বিধৌত করে নিয়ে চলেছে। এইরূপ হয় বাবা। যে হৃদয় অভিমানশূন্য হয়েছে ; যে নত হতে শিখেছে, সেইখানে সেই অনাদিবর্ষী কৃপাবারি

বর্ষিত হয়। শুধু বর্ষিত হয় না, সেইখানে স্থগিত হয়। শুধু স্থগিত হয় না, সেই কৃপাবারির স্রোতে হৃদয়ের মলিন সংস্কারাদিকে বিধৌত করে। আর সেই অজ্ঞান সংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকার হৃদয়পুরে—প্রেম মণির উজ্জ্বল আভায় আলোকিত হইয়া ফুটিয়া উঠে। তাই বলি, কর্তৃত্ব অভিমান ছেড়ে ফেল। অহংকারকে নমিত কর, শ্রীগুরুর কাছে সর্ব্বতোভাবে কৃতজ্ঞ হতে চেষ্টা কর। অকৃতজ্ঞতারূপ মহাপাপকে দূরে সরিয়ে ফেল এবং কাতর প্রাণে প্রার্থনা কর—

আমার মাথা নত করে দাও হে
তোমার চরণ ধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ঘুচাও চোখের জলে।'

শিবমস্তু। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(৬৯)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
৪।১১।৪৯

প্রাণাধিকেষু—

বাবা···, প্রেমময় ঠাকুরের বুকভরা স্নেহাদর অনুভব কর। পত্র পাঠে পরম পরিতোষ লাভ করিলাম।

তোমার ভাবধারা এবং তদনুযায়ী চিন্তাধারাগুলি অতি সুন্দর, অতি সত্য এবং সাধনোচিত। তুমি গুরুস্বরূপ ধরিবার চেষ্টা ঠিক ভাবেই করিতেছ। সত্যই বাবা, সেই চির পুরাতন সেই পুরাণ পুরুষ সাধকের চক্ষে নিত্য নূতন ভাবে, নূতন ছাঁদে, নূতনরূপে প্রতিভাত হন। সেই চির পুরাতন 'একম্' অব্যয়ম্' অদ্বিতীয় সত্ত্বার এই যে নব নব ভাবে নিত্য আত্মপ্রকাশ ইহারই নাম জগৎলীলা।

"কত যে ভালবেসে, বহুবেশে দিল ধরা রে।
সে যে মোর বুক ভরা ধন, আমার আপন
আপন হারা রে॥"

চমৎকার ভাব, বড় সুন্দর অবস্থা, ভারি সুন্দর। যে সাধক, যে ভক্ত, যে সন্তান শ্রীগুরুতে নিজের ঐ বড় প্রিয় আমিটাকে মিলিয়ে মিশিয়ে এক হ'য়ে যেতে চায়, তারই কাছে সেই অনন্ত কৃপাময় শ্রীগুরুভগবান্ এইরূপ নিত্য নিত্য নূতন নূতন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া, বিভিন্নভাবে লীলা করিয়া তার অন্তরের জন্মজন্মান্তরের

বুভুক্ষা মিটাইয়া দেন। তাহার জীবন ধন্য করেন, তাহাকে কৃতকৃত্য করেন। কর বাবা, এইভাবে তোমার সেই প্রিয়তম অন্তর দেবতাকে অনুভব করিতে চেষ্টা কর। নিত্য নূতনভাবে ছাঁদে, নূতন রসে তাঁকে ভোগ করিতে চেষ্টা কর। অনুভব করিতে চেষ্টা কর যিনি তোমার অন্তরে প্রাণরূপে অবস্থান করিতেছেন, তিনি বাহিরে, বিশ্বরূপে, অনন্তরূপে প্রতিভাত হইয়া রহিয়াছেন—"যঃ হৃদিমণ্ডলে, সঃ ইহমণ্ডলে।" সত্যই, ঠাকুর পছন্দ করেন না, ঠাকুর চান না আমরা ঠাকুরের চিন্তাছাড়া অন্য কারও চিন্তা করি। ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলা ছাড়া আর কাহারও সঙ্গে কথা বলি। তাই না সাধক গেয়েছিলেন—

> "যদি কোন দিন তোমারই আসনে
> আর কাহারেও বসাই যতনে
> ফিরিয়া যেও না প্রভু।"

নিজের ঐ ক্ষুদ্র বুদ্ধিটিকে অনন্তবিস্তৃত বোধসত্তায় মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে চেষ্টা কর। অহমিকার ক্ষুদ্র গণ্ডীটিকে ভেঙ্গে ফেল বাবা। কর্তৃত্বাভিমান ছেড়ে দাও। তাঁকে প্রিয়তম বলে বুকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা কর। প্রিয়ত্ববুদ্ধি যেখানে ঘন হয়, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সেখানে কমে যায়। তাই বলি, তাঁকে প্রিয় বলে তোমার একান্ত আপন দরদী ব'লে বুঝতে চেষ্টা কর। আপনভোলা ভাবে সেই অরূপের রূপে মিলিয়ে যেতে চেষ্টা কর। ভুলে যাও নিজেকে, জাগিয়ে তোল তাঁকে। বিলিয়ে দাও নিজেকে তাঁর মধ্যে, দেখবে

তোমার তুমি'র জায়গায় 'আমি' হ'য়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। শিবমস্তু।

এইবার তোমাব প্রশ্নগুলির উত্তর দেই।

১। তুমি প্রসাদগ্রহণের যে-ভাবধারা লিখিয়াছ, উহা ঠিকই হইয়াছে। এই কারণে সাধকের নিয়ম তাহার পরিমাণ মাফিক আহার্য্য একেবারে লইয়া লইবে এবং একেলা অন্যের অসাক্ষাতে ঐরূপ অনুভূতিব দ্বারা আহার্য্য গ্রহণ কবিবে। এবং তখন কোন বাক্যালাপ করিবে না। মাত্র তুমি যেমন লিখিয়াছ তেমনভাবে আহার গ্রহণ কবিবে। যখন শ্রীগুরুর স্থূল শরীরের সম্মুখে আহার করিবে তখন ঐরূপ কোন অনুভূতির চেষ্টা করিবে না; মাত্র অন্যান্য সকলের মত আহার্য্য গ্রহণ করিবে। আশা করি, তুমি আমাব বক্তব্য বুঝিয়াছ। কি বুঝিলে পত্রের উত্তরে আমাকে লিখিবে।

২। তোমার পূজাদর্শন ঠিক ঠিক ভাবে হইয়াছিল। তুমি পূজাতে আমার কোন বিঘ্ন উপস্থিত কর নাই. আমি তোমার উপর দিয়া অপরকে শিক্ষা দিতেছিলাম মাত্র। ইহা তোমার বুঝা উচিত নয়।

৩। বাবা, মন্ত্রের প্রয়োজন নিজের বহুত্বের চিন্তাধারা হইতে মনকে সরাইয়া লইয়া, মন্ত্রাত্মক দেবতার পদে বিলীন করিয়া দেওয়া। এক কথায়, মনকে বহু বিষয়ে ছুটাছুটি হইতে ত্রাণ করা। যে সাধক ঐ. বহুর মাঝে তাহার একেকে, আপনকে, প্রিয়কে অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছে বা অনুভব করিতে চেষ্টা করিতেছে,

তাহার পক্ষে মন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা খুবই কম। এক কথায়, আমাদের বহুমুখীন চিন্তাধারাগুলিকে একমুখীন করিবার জন্য মন্ত্রের প্রয়োজন। যাহার চিন্তাধারা একমুখীন হইয়া গিয়াছে, যে ঐ একচিন্তাতে বিভোর হইয়া থাকিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার আর মন্ত্র উচ্চারণের প্রযোজন নাই। সেই সময় লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝিবে তোমার আর মন্ত্রের প্রয়োজন নাই, মন্ত্র নিজ হইতেই ভিতরে উচ্চারিত হইতেছে। অতএব তোমার কিছুই যায় নাই, পরন্তু ঐ সকল যাওয়াব মধ্যে পবম পাওয়া হইতেছে। এই রূপ প্রাপ্তি বহুজন্মের সুকৃতির ফল। গুরুকৃপা লাভ হইলে এইরূপ প্রাপ্তিযোগ ঘটে। তোমার গুরুর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, অকপট প্রেম নির্ব্বিচারে আত্মসমর্পণ, সর্ব্ব ভোলাভাব, এই প্রাপ্তিযোগ ঘটাইয়াছে। আজ তোমার জীবনে একমাত্র মন্ত্র হওয়া উচিত—

"ধন্যোঽহং কৃতকৃতোঽহং সফলং জীবনং মম।"

উপরোক্ত মন্ত্রটী তোমার গুরু প্রণাম হওয়া উচিত। উপরোক্ত মন্ত্র, জপের মন্ত্র নয়, গুরু প্রণাম মন্ত্র। প্রাত্যহিক সন্ধ্যাকার্য্য সমাপন করিয়া ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গুরু প্রণাম করিবে।

অত্রস্থ মঙ্গল। তোমাদের নিত্যকুশল কামনা করি। ইতি

বিশ্বজিৎ

(৭০)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
১৭।১১।৪৯

পরম স্নেহভাজনেষু—

বাবা ··, প্রেমঘন বিগ্রহ প্রেমিক ঠাকুরের স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ তোমার শিরে নিত্য বর্ষিত হইতে থাকুক আর সেই প্রেমোজ্জ্বল কনককিরণে তোমার চলার পথ উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক, ইহাই কামনা করি। সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ শ্রীগুরুমূর্ত্তি তোমার জীবনের লক্ষ্য ও ধ্যেয় বস্তু হোক।

পত্রপাঠে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম। তুমি যে কথাগুলি লিখিয়াছ তাহা প্রত্যেকটী সত্য এবং ঐ অকৃত্রিম প্রেমের ভিতর দিয়াই ভগবৎ সান্নিধ্যলাভ করা সম্ভব ইহাই এ আশ্রমের creed বা Ideal ঐ এক ভালবাসার দ্বারাই ভগবানকে লাভ করার, চিত্তের শুদ্ধতা সম্পাদন করার একমাত্র সহজ পন্থা। ভগবান এমন একটা কোন বস্তু-নন, যাঁহাকে লাভ করিতে গেলে কোনরূপ কসরতের প্রয়োজন হয়। মন্ত্রজপের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ নয়, মনকে একমুখীন করিবার প্রচেষ্টা মাত্র। তোমাকে যে মন্ত্র দেওয়া হইয়াছে তাহাই যে সকলকে দেওয়া হইবে বা হইয়াছে এমন কোন কথা নাই। যে ক্ষেত্র যে বীজের উপযুক্ত, সেই ক্ষেত্রে সেইরূপ বীজই বপন করা হইয়া থাকে। এ আশ্রম কোন সম্প্রদায় নহে,

কোনরূপ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি এ আশ্রমের সন্তানগণের নাই, ইহা ভালবাসার ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে। ভালবাসার দ্বারাই এ আশ্রম পরিচালিত হয়। ভালবাসা অভিমুখীন ইহার গতি এবং ভালবাসাতেই ইহার লয়। গুরুতে ভগবৎবুদ্ধি আরোপ করিয়া অর্থাৎ করুণাময় শ্রীভগবান কৃপা করিয়া আমার সম্মুখে শ্রীগুরুরূপ ধরিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, এই জ্ঞান লইয়া গুরুসেবা করাই প্রকৃত সেবা। তাই বলি বাবা, গুরুকে যত বেশী ভালবাসিতে পারিবে,—তিনি যে তোমার পরমাত্মীয়, স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী মাতা, প্রেমময় ঠাকুর, নয়নানন্দকর পুত্র, দরদী বন্ধু, তোমার প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন; ওগো তিনি যে তোমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, বিরহের বেদন, আনন্দের উচ্ছ্বাস, ইহা যত বেশী বুঝিতে পারিবে, ততই প্রাণমন, বুদ্ধি, আনন্দরসে, প্রেমরসে ভরপুর হইয়া উঠিবে। দাও বাবা, নিজেকে তাঁর কাছে ছেড়ে দাও, প্রিয়ত্ববুদ্ধিতে তাঁকে আরও নিজের কাছে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে নিয়ে আসতে চেষ্টা কর। কি আর বলব, এইটুকুই আজ বলে শেষ করি—

"দাও প্রেম, আরও প্রেম, আরও, আরও, আরও প্রেম
আরও প্রেমে মিলিবে দেখা।" শিবমস্তু।

তোমার শরীর কেমন আছে? তোমার বাড়ীর সংবাদ কি? যদি সম্ভব হয়, একবার এদিকে এস। কয়েকটা দিন গুরুসঙ্গ করা ভাল। এ শরীর একরূপ। তোমাদের কুশলাদি সংবাদ দিও। আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্বজিৎ।

(৭১)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
১৯।১১।৪৯

পরম স্নেহভাজনেষু—

বাবা..., করুণাময় শ্রীগুরু ভগবানের কৃপা তোমার একমাত্র পাথেয় হউক, ইহাই আশীর্ব্বাদ করি।

দেখ বাবা, শিষ্য হচ্ছে শ্রীগুরুর Realisation of Supreme truth. শ্রীগুরু যে কি বস্তু তা বোঝা যায় তাঁর শিষ্যকে দিয়া। কারণ, শ্রীগুরু আপন সমস্ত শক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত করেন। জীব বহুকাল ধরে স্থূল বিষয়ের সঙ্গ করে, মাত্র তার আবরণটুকুতেই মুগ্ধ আছে। এর ভিতর যে আরও কিছু সুন্দর বস্তু আছে, তা সে ভুলেই গেছে। আর এই নামরূপের স্বভাবই হচ্ছে বিভ্রান্তিময়। সে জীবকে তার প্রকৃত স্বরূপ থেকে বঞ্চিত করে রাখে। কিন্তু এই নামরূপ হচ্ছে ভঙ্গুর, পরিবর্ত্তনশীল। যা পরিবর্ত্তনশীল তা কোনদিনই শান্তি দিতে পারে না। কিন্তু জীব শাশ্বত সনাতন, ভূমা, আনন্দের ভিখারী, তার বুভুক্ষা এই ক্ষণস্থায়ী নামরূপে পরিতৃপ্ত হতে পারে না। সেই জন্য সে অনবরত বিষয় হতে বিষয়ান্তরে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। আরও একটা কথা যে, যে-স্তরের চিন্তায় অভ্যস্ত তদধিক কোন বিষয় যদি তাহার সম্মুখে আসে, সে তাহাকে নিজের standard অনুযায়ীই বিচার করে।

নিজ বুদ্ধির অতিরিক্ত সে কিছু ভাবিতেই পারে না। ফলে, যাহা সত্য, যাহা মহান, তাহাও তার কাছে ছোটই হয়ে পড়ে। কিন্তু সত্য যা তা স্বপ্রকাশ। সে তার গুণে মিথ্যাকে পরাজিত করবেই। তবে সেটা হতে একটা সময়ের প্রয়োজন হয়। যেমন জলে ময়লা থাকেই। তাতে নির্ম্মলী দিলে কিয়ৎক্ষণ পরে তাহা পরিস্কার হয়। সাধন-জগতেও সেইরূপ জানবে। সত্য বিষয়ের চিন্তা করতে করতে মিথ্যার নাশ হয়ে সত্যের উজ্জ্বল বিমল আলোক প্রস্ফুটিত হয়ে পড়ে। তুমি বলবে, তারা ত আপনার বিষয়ে নিন্দাই করেছিল তবে সত্য কেমন ক'রে ফুটবে? আরে পাগল, তারা নিন্দা করলেও অন্য চিন্তা বাদ দিয়া এই সত্যের অপর দিক দিয়াই ত আলোচনা করছে, বস্তুশক্তি যাবে কোথায়? পারদ নিয়ে তুমি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে নাড়াচাড়া করলে সময়ে পারদের ক্রিয়া শরীরে প্রকাশিত হবেই। তবে সময়ের কমবেশী লাগতে পারে ক্ষেত্র হিসাবে, কিন্তু তার ক্রিয়া প্রকাশিত হবেই।

আজ বিভূতি প্রভৃতির সেই অবস্থা হয়েছে। তারা তোমাতে গুরুশক্তির পূর্ণ বিকাশ দেখছে। তোমাকে কত প্রকার বিপরীত বাক্য বলেছে, কতরূপ বিপরীত আচরণ করেছে, কিন্তু যখনই তোমাকে দেখেছে এবং তারপরেও যখন এ বিষয়ে আলোচনা করেছে, তখন তোমার ভিতর তারা গুরুশক্তিই দেখেছে এবং সেই গুরুশক্তির সংস্পর্শে এসেছে। ফলে, আজ তারা নিজের অজ্ঞাতেই মিথ্যার আবরণ ছিন্ন করে সত্যের আনন্দে পরিপূর্ণ হচ্ছে। এমনই হয় বাবা, তোমরা আমার আদরের দুলাল। তোমার

এখনও ঐ দেশে প্রয়োজন আছে। সেইজন্যই ঠাকুর তোমায় রেখেছেন। বাবা, জীবসকল কত দুঃখ কষ্ট পাচ্ছে। তাদের কত যন্ত্রণা। সত্যের আলোক তাদের দিয়ে, অজ্ঞান অন্ধকার নাশ করে, তাদের আনন্দ দাও বাবা। ঐটাই হচ্ছে ঠাকুরের প্রকৃত সেবা। তোমার ঠাকুর ত মাত্র একস্থানে বদ্ধ নন। তুমিও কি সাধারণের মত তোমার ঠাকুরকে ঠাকুরঘরে বদ্ধ রাখবে? ওরে সে যে ভূমা, সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। তাকে অত ছোট করে দেখিস না। এত বড় মিথ্যার আশ্রয় নিস না। দেখ, মহাভারতে ভীষ্মদেব ভগবানের স্তুতি প্রসঙ্গে প্রথমেই ক্ষমা চেয়েছিলেন, সেই ভূমা, শাশ্বত, সনাতন পুরুষকে নামরূপের গণ্ডীর মধ্যে ভাবনা করার জন্য, কিন্তু তিনি ভগবানকে এই সীমার মধ্যে দেখেও সব সময় এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যে তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান। আজ তোদেরও সেরূপ হতে হবে। তোরা সত্যসেবী। দে জ্ঞানের আলোক ছড়িয়ে দে বিশ্বের মাঝে, আপ্লুত করে দে সকলকে, সেই ভূমা আনন্দে, আজ সমস্ত জগৎ আনন্দময় হোক তার পরশ পেয়ে। কল্যাণ হোক বাবা। শিবমস্তু। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(৭২)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
২০।১১।৪৯

পরম স্নেহভাজনেষু—

বাবা…, স্নেহাশীর্ব্বাদ লও। তোমার দু'খানি পত্রই পাইয়াছি এবং Phone-এ কথাবার্ত্তাও বলিয়াছি। এক গাড়ির ঝঞ্ঝাটে জ্বালাতন হইয়া এটা-ওটা-সেটা নিয়া গাড়ির পিছনে লাগিয়াছিলাম বলিয়া তোমার চিঠির উত্তর দিতে দেরী হইল। যাক, গাড়ির কথা পরে লিখিব, আগে তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিই।

তোমার পূর্ব্ব চিঠির প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি জীবের—বিশেষ করে বাঙ্গালীর স্বাভাবিক খাদ্য, কাজেই উহা লইয়া Drink-এর সঙ্গে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ধূমপান সম্বন্ধে কথা হইতেছে যে ইহা অর্থাৎ ধূমপান অত্যন্ত খারাপ। প্রথমতঃ ইহা শারীরিক ক্ষতিকর, দ্বিতীয়তঃ অযথা অর্থ নষ্ট, তৃতীয়তঃ ইহার উপকারিতা বিশেষ কিছু নাই। মানুষ সাধারণতঃ বিলাসিতার জন্য এই সমস্ত নেশার মোহে অধীর হইয়া কিম্বা মোহগ্রস্ত হইয়া অযথা কতকগুলি অর্থ নষ্ট করে এবং ইহা ছাড়া ধূমপান বা মদ্যপান, ইহাদের এমনি একটি মোহিনীশক্তি আছে যে ইহারা কখন অল্প বা পরিমাণমত থাকে না, ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইতে থাকে। পরে বাড়িতে বাড়িতে এমন একটা

স্থানে আসিয়া পড়ে যখন তার Control-এর বাহিরে চলিয়া যায়, কিন্তু মাছ, মাংস ও ডিমের পক্ষে এ-যুক্তি খাটে না। যতই বাড়িয়া উঠুক ইহারা পরিপাকের বাহিরে উঠিতে পারে না। আর যদি উঠে তাহা হইলে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, এই মাছ মাংসও খাওয়া উচিত নয়। ইহাতে শরীর সুস্থতার পরিবর্ত্তে অসুস্থতা বৃদ্ধি করে। মাছ, মাংস না খাইলে শরীর পুষ্ট হইবে না, খাইলে শরীর পুষ্ট হইবে, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ কথা। মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি না খাইলে যে loss হয় তাহা দুধ, ঘি, ছানা খাইলে পরিপূরণ হওয়া স্বাভাবিক। ধূমপান বা মদ্যপান যতই Medicinal dose-এ হউক না কেন, ইহা ক্রমে বাড়িয়া যায়, তুমি হয়তো ২।১টি example দেখাইতে পার যাহারা ঐ doseতেই আছে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি কম। ২।১ জনের example লইয়া কোন argument stand করে না। Majority দেখা গিয়াছে যে ঐ Medicinal dose-এ আরম্ভ করিয়া সে মাতালে পরিণত হইয়াছে। কাজেই আমার অনুরোধ, আমাদের কেহ সাহেবিয়ানা করিতে গিয়া সাহেবদের নকল করিয়া একটুখানি drink করিলে ক্ষতি নাই ইত্যাদি বোধে যেন প্রতিষ্ঠিত না হয়। ইহা অত্যন্ত অন্যায় এবং জীবনলাভের পথে ইহা একান্ত ক্ষতিকারক। তোমরা যদি আমায় এতটুকুও ভালবাস, তাহা হইলে এ-বুদ্ধি পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। পরিশেষে ইহাই বলিতে চাই, তোমরা ঠাকুরের প্রিয় সন্তান, তোমাদের ভিতরে যদি এই জাতীয় বুদ্ধি থাকে তাহা হইলে সাধারণ লোকের তোমাদের দেখিয়া কি ধারণা হইবে?

আরও বলি যে তোমরা যাহাই কিছু খাও তাহা তোমাদের প্রিয়তম দেবতাকেই উৎসর্গ করিয়া গ্রহণ কর। তুমি কি তোমার প্রিয়তমকে ঐ জিনিষ উৎসর্গ করিতে পারিবে? না কোন বর্ণাশ্রমীয় হিন্দুজাতি ঐ জিনিষ দেবতাকে উৎসর্গ করিতে পারে? ইহা সংস্কার নয় বাবা, আমি তোমাকে যে-যুক্তি দিলাম ইহা শাস্ত্র-সিদ্ধ যুক্তি এবং আমার অন্তরের কথা। নিজ জীবনকে যদি পবিত্র রাখিতে চাও, ঠাকুরে যদি প্রীতিভাবাপন্ন হইতে চাও, তাহা হইলে এ ধারণা পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। তুমি যে বাবা দেবতার পায়ে উৎসর্গিত নির্ম্মল পুষ্প সদৃশ ঐ পুষ্প যদি কোন কীট প্রবেশ করে তাহা হইলে আমার এ বেদনা রাখিবার স্থান নাই। তবে কোন partyতে গিয়ে যদি কেহ offer করে, তাহা হইলে rudely তাহাকে return না করিয়া politely refuge করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং আমার বিশ্বাস, এখন হইতে তুমি তাহা নিশ্চয়ই করিবে। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তোমাকে এ সম্বন্ধে আমি আর বিশেষ কিছু লিখিতে চাই না। আশা করি, ইহা হইতেই তুমি আমার মনোগতভাব বুঝিতে পারিবে।

উপনিষৎ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছ, চিঠিতে উহার আলোচনা সম্ভব নয়। উপনিষৎ এমন একটী পুস্তক, যাহা এক আধটা কথায় মীমাংসা হওয়া স্বাভাবিক নয়। কাজেই ঐ সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে স্থূল সাক্ষাতের প্রয়োজন।

গীতাপাঠ সম্বন্ধে:—গীতাপাঠকালীন তোমার মোহ আসিবে কেন? গীতা ভগবৎবাণী। গীতাকে কেহ পাঠ করিতে পারে না।

গীতার কথা কেহ কহে না, গীতা নিজেই গীত হন, শ্রীভগবান নিজে গীতিগাথা গান করেন। গীতার পাঠক কেহ নাই। গীতা নিজেই নিজের পাঠক। যে ভাগ্যবানের কণ্ঠ আশ্রিত হইয়া গীতা ধ্বনিত হন, সেই গুরুভক্ত সত্যই ধন্য। শ্রীগুরুর অসীম কৃপা না থাকিলে, গীতা কখন তার কণ্ঠনিঃসৃত হইতে পারে না। গীতা শুধু গ্রন্থ নয়, ইহা সজীব মূর্ত্তি, ভগবৎ বিগ্রহ। ইহা জ্ঞানগ্রন্থ, সর্ব্বতত্ত্ব, সর্ব্ব উপনিষদের সার মর্ম্ম। ইহার মোহ, মোহ নয়—অনুরাগ। শ্রীভগবানের অনুরাগ না আসিলে শ্রীভগবৎবাণী তাহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইতে পারে না। আমরা অজ্ঞানতা-বশতঃ মনে করি আমরা গীতা পাঠ করিতেছি—আমার পাঠ অপরে শুনিতেছে। শ্রীভগবৎবাণীর মূল শ্রোতার কর্ত্তব্য :—(সাধারণ কথায় যাহাকে পাঠক বলে, তাহাকেই আমি মূল শ্রোতা আখ্যা দিতেছি)—যে ভাগ্যবান পুরুষকে শ্রীভগবান কৃপা করিয়া ব্যাসাসনে (যে আসনে বসিয়া গীতা পাঠ করিতে হয়) বসিবার অধিকার দিয়াছেন, তাঁহার মনে সতত এইভাব জাগ্রত রাখিয়া আসনে বসা উচিত যে, শ্রীভগবৎবাণী কৃপা করিয়া এই কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া, এই কণ্ঠকে পবিত্র করিয়া ধ্বনিত হইতেছেন। এই সারগর্ভ জ্ঞান উপদেশাবলীর শ্রোতা ইহাদের সঙ্গে আমিও একজন। আমি বক্তা নই, আমি শ্রোতা মাত্র। এই ভাব অন্তরে জাগ্রত রাখিয়া, আসনে বসিয়া ভগবৎবাণীর সেবা করিতে পারিলে এবং ঐ সারগর্ভ উপদেশাবলী হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে মোহের পরিবর্ত্তে শ্রীগুরু ভগবানের প্রতি অনুরাগে হৃদয় ভরিয়া

যাইবে কৃতজ্ঞতায়; অভিমানাত্মক বুদ্ধি তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িবে। অতএব বাবা, জন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলে যে গুরুকৃপা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছ, কতকগুলি দুষ্কৃতির ফলস্বরূপ যে অজ্ঞানতা জীব বুদ্ধি আচ্ছন্ন করিয়া রাখে তাহার বশবর্ত্তী হইয়া নিজেকে ইহা হইতে বঞ্চিত করিও না, ইহাই আমার অনুরোধ। শ্রীগীতা—শ্রীভগবৎবাণী নির্জ্জীব জীবনের সঞ্জীবনী মহৌষধি। গীতার মধুর গীতি শ্রবণে প্রাণ আনন্দে নিদ্রিত হয়। গীতার বেদান্ত রসাস্বাদে চিত্তবালক হেলিয়া দুলিয়া সুন্দর খেলা করে। বাসনা-ব্যাকুল জীব গীতা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সমাধি সায়ংকালে স্নিগ্ধা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নিজ শক্তি উমা সন্দর্শন করিতে করিতে মহেশের মত আনন্দে নৃত্য করুক। আর দৃশ্য প্রপঞ্চরূপ গরল পান করিয়া আত্মবোধে দৃশ্য জ্ঞান মার্জ্জনপূর্ব্বক দেবাদিদেবের মত মৃত্যুঞ্জয় পদপ্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা।

পত্রোত্তরে তোমাদের কুশল দিও। অত্রস্থ মঙ্গল। আনন্দে থাক। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(৭৩)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
২৪।১১।৪৯

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিশেষ—

শ্রীমান···, করুণাময় শ্রীগুরু ভগবানের স্নেহ ও করুণাধারা তোমার শিরে নিয়ত বর্ষিত হউক।

পত্রপাঠে পরম প্রীতিলাভ করিলাম। পত্রে যে-কথাগুলি লিখিয়াছ উহা ভাবের দিক থেকে ও ভাষার দিক থেকে খুবই সুন্দর। গুরুর প্রতি ঐরূপ ভাব শিষ্য যদি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে, তাহা হইলে তাহার অধ্যাত্মজীবনে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। শ্রীগুরুকে যে সত্যই শ্রীভগবানের মূর্ত্তবিকাশ বলিয়া অনুভব করিতে পারে, যে-জীব গুরুকে পরমাত্মীয় দরদী বন্ধু বলিয়া অনুভব করিতে পারে, সে সত্যই সাধক পদবাচ্য। গুরুকে যে তার একমাত্র আশ্রয় বলিয়া সত্যসত্যই অনুভব করিতে পারে, এই ধারণায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সে-সাধক সত্যই গুরুকৃপার অধিকারী হয়। শ্রীগুরুতে প্রকৃত প্রেমভাবাপন্ন হইতে পারিলে, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে জীবের ত্রিতাপজ্বালা অচিরে নাশ হয়। প্রকৃত সুখী হইতে গেলে গুরুসঙ্গ ও গুরুসেবা একান্ত প্রয়োজন। কলহিত জীবের পক্ষে, কৃচ্ছ্রসাধন সম্ভবপর

নয় বলিয়া করুণাময়ী শাস্ত্র কৃপা করিয়া শ্রীগুরুমূর্ত্তি ধরিয়া জীবের সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং নানাবিধ জ্ঞানোপদেশের দ্বারা জীবের তমসাচ্ছন্ন মোহজাল ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে উজ্জ্বল জ্ঞানালোকের ভিতর দিয়া আকর্ষণ করিয়া নিত্যানন্দধামে লইয়া যান। সংস্কারাচ্ছন্ন মোহান্ধ জীব প্রথম প্রথম কর্ত্তৃত্বাভিমানের ফলে গুরুকৃপা বা গুরুশক্তি অনুভব করিতে পারে না। এই মোহ তাঁর কৃপায় যে পরিমাণে অপনোদন হইতে থাকিবে সেই পরিমাণে ধীরে ধীরে সংস্কারগুলি ক্ষয় হইতে থাকিবে। অতএব বাবা, গুরুতে আত্মসমর্পণ করিতে চেষ্টা কব, বিলিয়ে দাও নিজেকে গুরুশক্তিতে, নিমজ্জিত হও গুরুকৃপারসে। শিবমস্তু।

তোমাদের নিত্যকুশল কামনা করি। অত্রস্থ মঙ্গল জানিবে। আনন্দে থাকো। ইতি—

বিশ্বজিৎ

(৭৪)

ওঁ

শ্রীগুরু আশ্রম
হাজারিবাগ
৮।১২।৪৯

পরম শুভাশীর্ব্বাদবিশেষ—

মায়ী! করুণা বরুণালয় প্রেমঘনবিগ্রহ শ্রীগুরু নারায়ণের স্নেহ ও করুণাশীর্ব্বাদ তোমার শিরে নিত্য বর্ষিত হউক।

তোমার বেদনাভরা দীর্ঘ পত্রখানি পাঠে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল। হর্ষের কারণ, শত বেদনার মধ্যে অনন্ত হতাশার ভিতর দিয়াও ঠাকুরজীর প্রতি তোমার কৃতজ্ঞতা এবং তাঁর প্রতি তোমার হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রীতিপূর্ণ বিশ্বাসের ভাব দেখিয়া, বিষাদের কারণ, তোমাদের মনে মাঝে মাঝে এইরূপ হতাশার অবস্থা জানিয়া।

মা, তোমাদের এ-হতাশা আসিবে কেন? যে হৃদয় তাঁহাতে অর্পিত হইয়া গিয়াছে, অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু শ্রীগুরু ভগবান যে হৃদয়-রথে অচ্যুতসারথিরূপে বসিয়া ঐ মন-অশ্বের কড়িয়ালি নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, সে জীবের আর কি চিন্তা! তাহার রথ তিনি নিজে চালনা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। পথ যেমনই হোক না কেন, সারথি যদি উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে রথীর ভাবনা কিছুই থাকা উচিত নয়। চিন্তা কি মা? উপযুক্ত সারথির হাতে

যখন রথ চালনার ভার দিয়াছ, তখন পথ যত বন্ধুর হোক না কেন, রথ চলিবেই এবং লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাবেই। হতাশা কখন আসে— যখন মনবুদ্ধি তাঁর কাছ থেকে সরে নিজ কর্তৃত্ববুদ্ধিতে সমালিঙ্গত হয়। ইহাই তো বড় মুস্কিলের কথা। কর্তৃত্ববুদ্ধিগ্রস্ত জীব আমরা, ঐ কর্ত্তৃত্ববুদ্ধির মোহে এমনিভাবে অন্ধ হইয়া পড়ি যে মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায় আমাদের প্রকৃত অবস্থা অনুভব হইলেও আবার মমতাহেতু সেই মোহগর্ত্তে পতিত হইয়া যাই। (তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপতিতা)। কাজেই মা, তুমি চিঠিতে যে-ভাবটি দিয়াছ ঐ ভাবটি যদি সকল সময়েই হৃদয়ে জাগ্রত রাখিতে পার, তাহা হইলে এই যে কর্তৃত্ববুদ্ধির উপর যে একটি মোহ ইহা আর তোমার বুদ্ধিকে অধিকার করিতে পারিবে না।

অতএব মা, আমার কি হইল না হইল, আমি কতদূর অগ্রসর হইলাম বা না হইলাম, সাধনায় আমার উন্নতি হইল কি না হইল ইত্যাদি বিষয় চিন্তা না করিয়া, এই ভাবরসে নিজ হৃদয়কে সিঞ্চিত না করিয়া, করুণা বরুণালয় অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু প্রেমময় ঠাকুর যখন এ-হৃদয়ের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যখন ইহার কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আর আমার চিন্তা করিবার কিছুই নাই, তিনি তাঁহার ইচ্ছামত ইহাকে গড়িয়া লইবেনই—এই ভাবটি সদা হৃদয়ে জাগ্রত রাখা উচিত। কেন না, দয়াল তিনি, করুণার আধার তিনি, নিতান্ত অকৃতি ও অযোগ্য জেনেও যখন শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়াছেন তখন যেমন

করিয়া হউক তিনি ইহাকে তাঁর মত গড়িয়া লইবেনই। আমাদের হৃদয়স্থ সব কিছু বৃত্তিগুলিকে "নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বর" মন্ত্রে উৎসর্গিত করে দিয়ে তাঁর সকল দুঃখহরা মুখখানির দিকে চেয়ে বসে থাকা আর সকল সময়ে মনকে এইভাবে ডুবিয়ে রাখতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, সকল সময়ে এইরূপ চিন্তা করা কর্ত্তব্য—

"কবে সরল হ'য়ে বাজবে হৃদে
শুধু তুমি আছ এই কথাটি।"

খালি গাও—

শুধু আছেন যে তিনি
এইমাত্র জানি
অন্য কোন জ্ঞান নাই,
আমি ডুবিব অতলে
প্রেমসিন্ধু জলে
যা থাকে কপালে ভাই।

মাগো, আনন্দময়ের সন্তান তোরা, তোরা কেন নিরানন্দ পাবি? আনন্দলাভ যে তোদের জন্মগত অধিকার। তবে কেন হতাশায় তোদের বুকগুলি ভরে যায়? ওরে তোদের ঠাকুর যে আর কিছু চায় না, সে কেবল বলে—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

ভয় নাই, চিন্তা নাই, হতাশার কোন কারণ নাই। দেখ মা, পিছন দিকে চেয়ে দেখ—ঐ দেখ, তোমার হৃদয়-রথের অচ্যুত-সারথির মূর্ত্তি দেখ। দেখ, তিনি তোমার হৃদয়-রথের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে এক হস্তে মন-অশ্বের কড়িয়ালি ধরে, অন্য হস্তে বরাভয় ধারণ ক'রে, একটি অঙ্গুলি হেলিয়ে তোমাকে নির্দ্দেশ দিতেছেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু"

খালি নম নম হও। ঐ কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিকে নমিত কর মা, সমর্পণ কর নিজেকে, প্রণত হও, নমিত হও, বল—

প্রভু দক্ষিণা লও আমারে
দিবার আমার কিছু নাই ওগো—
শুধু আমি আছি আমার ভাণ্ডারে।

শিবমস্তু।

তোমাদের নিত্যকুশল কামনা করি, এ শরীর একরূপ। অত্রস্থ মঙ্গল। ইতি—

বিশ্বজিৎ